শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)-এর সাহেবজাদা

মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক

কারাগার থেকে বলছি
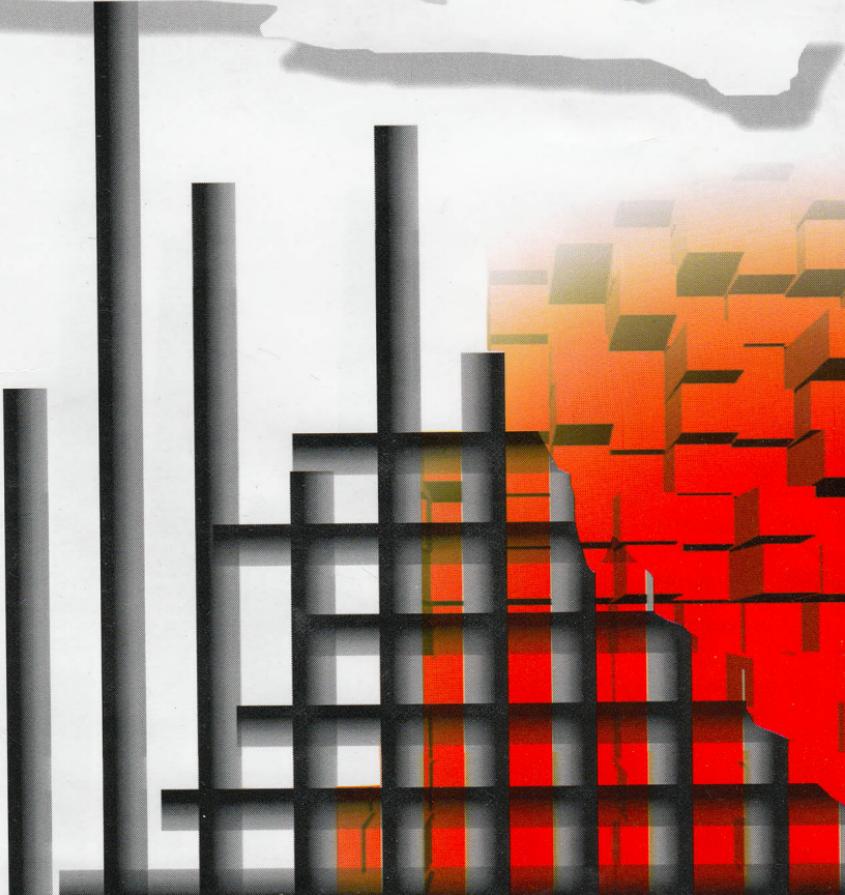
কারাগার থেকে বলছি

মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক

মুহাদ্দিস জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া

সম্পাদক মাসিক রাহমানী পয়গাম

বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১/এ পুরানা পল্টন লাইন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

মোবাইলঃ ০১৭১১-১৩৯৪০২, ০১৯১৩-০৫৩৩৭৪, ০১৯১২-৭১৫৭৯৮

কারাগার থেকে বলছি

মুহাম্মাদ মামুনুল হক

❒ প্রকাশকঃ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ❒ প্রকাশকালঃ প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৩ ❒ কম্পিউটার কম্পোজঃ আশ্-শামস কম্পিউটার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১১-১৩৯৪০২, ০১৯১৩-০৫৩৩৭৪

মূল্য : একশ ষাট টাকা মাত্র

প্রাণপ্রিয় মুরশিদ, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, রাহবারে কামেল
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (দা. বা.)-এর

দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক আমার একান্ত প্রিয়জন। হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে ইলমে দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি দ্বীনের বহুমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অন্যায়-অসত্য ও না-হকের বিরুদ্ধে সময়ের সাহসী ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বর্তমান সময়ে তরজুমানে আহলে হক হিসাবে তিনি ওলামায়ে কেরামের আস্থাভাজন ও একান্ত স্নেহধন্য। বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার অপরাধে তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। তার কারারুদ্ধ থাকার পূর্ণ সময়টায় আমি অত্যন্ত অস্থির ও পেরেশান ছিলাম। আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি করে জালিমের জুলুম থেকে তার হেফাজত ও মুক্তির জন্য দুআ করেছি। অবশেষে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তিনি মুক্তি লাভ করায় অন্তরে সীমাহীন আনন্দ অনুভব করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি।

কারাগারে থেকেও তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করে কারা জীবনের স্মৃতিচারণমূলক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সত্যের পথে সংগ্রামীদের জন্য এটি একটি উত্তম পাথেয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এর কবুলিয়াতের জন্য দুআ করি এবং ইলমী, আমলী, ইসলাহী ও রাজনৈতিক ময়দানে মাওলানার তারাক্কীর জন্য ফরিয়াদ জানাই ও তার দীর্ঘ, সুস্থ ও নিরাপদ হায়াত কামনা করি। আল্লাহ তুমি কবুল কর। আমীন।

(শাইখুল হাদীস মাওলানা) আশরাফ আলী
সিনিয়র সহ-সভাপতি
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান,
অভিভাবক পরিষদ– বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া ও জামিয়াতুল আযীয-এর
প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেবের

কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওলানা মুহাম্মদ মানুনুল হক আমার ছোট ভাই। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) ও তার পরিবারবর্গকে যে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করেছেন, মাওলানা মামুনের কারাবরণকে আমি সেই কবুলিয়াতের আলামত হিসাবে গ্রহণ করতে চাই। আল্লাহর পথে কুরবানী করতে পারা তাঁর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।

আব্বাজান (রহ.) তার জীবনে সমকালীন প্রতিটি সরকারের আমলেই দ্বীনের জন্য কারাবরণ করেছেন। আমাকেও আল্লাহ পাক অতি অল্প বয়সে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর আন্দোলনে কারা বরণের জন্য কবুল করেছিলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবানী করতে পারাও বড় খোশ নসীবের ব্যাপার। তবে তার জন্য ইখলাস থাকা জরুরি। ইখলাস না থাকলে অনেক বড় অবদানও ধুলোয় মিশে যেতে বাধ্য।

আমি শাইখুল হাদীস পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের কাছে দুআ চাই– আল্লাহ যেন মাওলানা মামুনুল হকের কারাবরণকে এবং তার কারা জীবনের স্মৃতিচারণমূলক এই গ্রন্থকে দ্বীনের খেদমতরূপে কবুল করেন এবং তাকে ও আমাদের সকলকে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর মত আমরণ দ্বীনের পথে ও দ্বীনের খেদমতে অটল থাকার তাওফীক দান করেন। সুস্থতা ও আফিয়তের সাথে রাখেন। আমীন।

(মাওলানা) মাহফুজুল হক
যুগ্ম-মহাসচিব,
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

উৎসর্গ

নবীপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখায় আত্মদানকারী
বীর শহীদদের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে।
যাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে
৫ ও ৬ মে'র পিচঢালা ঢাকার রাজপথ।
সে রক্ত বয়ে যাক
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, জ্বালুক
কোটি প্রাণে ত্যাগের মশাল আর চেতনার আলো,
সেই প্রত্যাশায়... ...।

– মামুনুল হক

লেখকের জবানবন্দী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মানিত আশরাফুল মাখলুকাত রূপে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি মানবতাকে মুক্তি দিয়েছেন জাহিলিয়াতের জিন্দানখানা থেকে।

অতঃপর, আমি অধমের উপর রাব্বে কারীমের বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি তার মহান দ্বীন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। সেই সাথে ইসলাম, কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদা রক্ষায় সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ নবী প্রেমিক ইসলামের সৈনিক দলের সাথে রাজপথে নেমে আসার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে পরিচালিত আন্দোলন ১৩ দফার নামে হলেও এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের গৌরব রক্ষা করা এবং শাহবাগী আন্দোলনের ছত্রছায়ায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা নাস্তিক্যবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করা। আলহামদু লিল্লাহ! হেফাজতে ইসলামের নামে গড়ে ওঠা গণজোয়ার বাংলাদেশে আলেম সমাজের নেতৃত্বে একটি সফল আন্দোলনের মাইলফলক রূপে স্মরিত হবে অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাসে। আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি যে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে অন্যতম সফল এই আন্দোলনে কিছু ভূমিকা রাখার তাওফীক

আল্লাহ তাআলা আমাকেও দান করেছেন। নবীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ খালেছ এই ঈমানী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার অপরাধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধম এই উম্মতকে ৮৩ দিনের জন্য জালিমের জিন্দানখানায় বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। কারাগারের অভ্যন্তরে কাটানো বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই দিনগুলোর কারগুজারী লিপিবদ্ধ করেছি আমি কারাগারে থাকতেই। কারাজীবনের সেই কারগুজারীর জবানবন্দী নিয়েই বক্ষমান এই গ্রন্থ।

ঘটনার কারগুজারীর বিবরণ লিখতে স্বাভাবিক ও সরল চিন্তার উপর থাকার চেষ্টা করেছি। কৌশলী পন্থায় না গিয়ে খালি চোখে যা দেখেছি তাই বলেছি। ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রাসঙ্গিক অনেক মন্তব্য, বক্তব্য ও অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এগুলো নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত পক্ষের।

আমি আমার বক্ষমান এই রচনায় ঘটনার বিবরণ বা মন্তব্যরূপে যাঁ কিছু লিখেছি এর মাধ্যমে মূলত চার দেয়াল ঘেরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশটির নানা অন্যায়, অবিচার ও অমানবিকতার ভয়াল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য, নব্য জাহিলিয়াতের অপশাসনে ক্ষত-বিক্ষত ইনসানিয়াতকে মুক্ত করতে যদি কারো চেতনা জাগ্রত হয়!

মুক্তির সময়কার নাটকীয়তা ও মুক্তি পরবর্তী সামান্য কিছু কারগুজারী বাদে সম্পূর্ণ বইটাই কারাগারের অভ্যন্তরে লিপিবদ্ধ, বিধায় বন্দীত্বের নির্যাতিত মানসিকতার কিছু প্রতিফলন আমার অনিচ্ছাতেও ঘটে থাকতে পারে; তবে পক্ষপাতহীন স্বকীয় অবস্থান থেকে সবকিছু বিচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

কারাজীবনের ধারাবাহিক বিবরণের বাইরে দুটি চিঠি রয়েছে এতে। প্রথম চিঠিটি আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)কে সম্বোধন করে লেখা। এতে কারাবন্দী একজন পুত্রের কিছু আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তার জীবনের আদর্শ স্বীয় মরহুম পিতাকে উদ্দেশ্য করে। পিতার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন ঘটনার বিশ্লেষণও বিবৃত হয়েছে এই পত্রটিতে।

দ্বিতীয় চিঠিটি হল ইসলামী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ রত ছাত্র-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কারাভ্যন্তর থেকে প্রেরিত একজন দায়িত্বশীলের চিঠি। ছাত্র মজলিসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল এটি। দুটি চিঠিই বইয়ের শেষাংশে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হয়েছে।

কারাগারের দেয়াল ঘেরা এই জীবনের কিছু কথা তুলে ধরলাম। সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয় নিয়ে পথচলা প্রজন্ম যদি এ থেকে সামান্যও অনুপ্রেরণা পায় সেটাই হবে আমার পরম পাওয়া।

পরিশেষে মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে বিনীত ফরিয়াদ, লৌকিকতা ও আত্মপ্রচারের কিছু বিষয় ঘটে থাকলে অনুগ্রহপূর্বক যেন মাগফিরাত দান করেন। আমার অন্তর ও চারপাশে যত কালো আছে সব যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। ঐশী আলোকবর্তিকায় আলোকিত হই আমি, আমার চারপাশ, আমাদের দেশ- সমাজ আর জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী... । আমীন। ছুম্মা আমীন।

মুহাম্মদ মামুনুল হক
ঢাকা।
১৫. ০৯. ১৩

কারাগার থেকে বলছি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

আজ ২৮ শে জুন শুক্রবার। আমার কারাজীবনের আটচল্লিশতম দিন অতিক্রম হচ্ছে। যারা কোন দিন কারাভোগ করেননি, কারাগারের জীবন সম্পর্কে তাদের অনেকের ভীতি থাকে মাত্রাতিরিক্ত। আবার অনেকে কারাজীবন সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করেন। নানা রকম প্রান্তিক ধারণা মানুষের আছে এই কারাগার তথা জেলখানা সম্পর্কে। সে যাই হোক, কারাজীবন যে মুক্ত জীবন থেকে ব্যতিক্রম, এ ব্যাপারে সবার ধারণাই অভিন্ন।

কারাগারের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবন। নানাজনের নানা অনুভূতি থাকে এ জীবনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে। যারা লেখক, কবি-সাহিত্যিক বা ভাবুক তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে বড় বড় গ্রন্থও রচনা করেন। জেল জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হবে না।

ভাগ্যচক্রে আমি যখন কারাগারে আসলাম। সুহৃদদের মধ্যে সাক্ষাত করতে আসা কেউ কেউ আমাকেও বলল, ভিতরে লেখালেখি করার সুযোগ পেলে যেন আমিও আমার কারাগারের দিনগুলো নিয়ে দু' চার কলম লিখি। ভাগ্নে এহসান তো এক রকম পীড়াপীড়ি করল কিন্তু এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ বেশি হয় না। কারণ আমাদের কারাজীবনে শিক্ষণীয় বা প্রেরণার তেমন কোন উপাদান পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। যুগে যুগে জালিমের জিন্দানখানায় সত্যপন্থী মজলুম মানুষেরা যে রকম জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও সত্যের পথে অটল থেকেছেন, জালিমের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছেন তার দীর্ঘ দীর্ঘ দাস্তান ইতিহাসের পাতায় রক্তের আকরে লিপিবদ্ধ আছে। আর বর্তমান সময়কার কারাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কারাগারের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জী নিয়ে সময়ের সেরা লেখকদের বড় বড় গ্রন্থ রচিত রয়েছে। তাই আমি এ বিষয়ে লিখলে নতুন কিছু পাঠকরা পাবেন বলে মনে হয় না। এরপরও আমার একান্ত মহব্বতের কিছু মানুষ আছেন যারা হয়ত বিশেষভাবে আমার কারাজীবনের বিবরণ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলো জানতে আগ্রহী হবেন। একান্ত আপনজনদের কেউ কেউ এমন আকুতিও প্রকাশ করেছেন। তাদের কথা বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত কিছু কথা লেখার মনস্থ করলাম। খুঁটিনাটি অনেক ঘটনাইতো প্রতিনিয়ত ঘটছে।

সবকিছু না লিখে এমন কিছু বিষয় লেখার চেষ্টা করব, যার মাধ্যমে আমাদের সমাজেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারাগার ও কারাগারের জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ হয়। যারা সমাজকে নিয়ে ভাবেন, সমাজের কল্যাণ চান, সমাজের অকল্যাণকর বিষয়গুলো পরিবর্তনে সচেষ্ট হন সেই সমাজকর্মীরা যেন ভাবনার কিছু খোরাক পান। যারা ঘুনে ধরা এই সমাজটাকে ভেঙ্গে সত্য-সুন্দর-মানবতার সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। সমাজ বদলের সেই সাহসী সৈনিকদের চিন্তার কিছু উপাদান যোগাতে চাই।

শাপলা ট্রাজেডি ও হেফাজতের উপর সরকারী খড়গ

৫ মের গভীর রাতে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে হেফাজতে ইসলামকে শাপলা চত্বর থেকে হটিয়ে দেয় সরকারী পেটোয়া বাহিনী। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি'র নারকীয় হামলার সময় শাপলা চত্বরের কাছাকাছি এক জায়গায় একটু আশ্রয় পেয়েছিলাম। আনুমানিক রাত পৌনে তিনটা থেকে তিনটার পর পর্যন্ত চলে হত্যাযজ্ঞ। অল্প সময়ের অপারেশনেই আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বীরপুরুষরা! হেফাজতে ইসলামের ক্লান্ত-শ্রান্ত নিরস্ত্র লাখো জনতার বিরুদ্ধে কোন ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই একতরফা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। শাপলা চত্বরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর ইতস্তত এদিক-সেদিক আশ্রয় নেয়া হেফাজত কর্মীদেরকেও এলাকা ছাড়া করার পদক্ষেপ নেয় তারা। কাউকে কিছু পিটুনি দিয়ে, কাউকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে কাউকে কানে ধরিয়ে, আবার অনেককে এমনিতেই নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়। সেই সুবাদে ফজরের আযানের পর পর রাত সাড়ে চারটার দিকে বন্ধুবর মুফতী আবদুর রাজ্জাকসহ নটরডেম রাস্তা পার হয়ে সেনা কল্যাণ ভবনের পাশ দিয়ে কমলাপুরের গলিপথ ধরে রেল স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে যেতে এমন কিছু ভাই দেখলাম যারা হামলায় আহত হয়ে হাটতে পারছেন না। কারো পায়ে, কারো কোমরে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে কিংবা দুইজন পাঁজাকোলা করে তাদেরকে নিতে হচ্ছিল। কেউ তারা পরস্পর পরিচিত নয়। কিন্তু সবাই ঈমানী আন্দোলনের সহকর্মী, তাই মিলেমিশে আমরা সকলে পরস্পর সহযোগিতায় আহতদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে পথে রিকসা বা অটোরিক্সা পেলে তাতে উঠিয়ে দিয়ে আহতদেরকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে করতে আমরা পীরজঙ্গী

মাজার মসজিদে ফজরের নামায পড়ার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলাম। ফজরের নামায পড়ে আবার পায়ে হেটে শাহজাহানপুরের দিকে এগুতে লাগলাম। শাহজাহানপুর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে রোগীর ভিড় চোখে পড়ল। সেখানে কিছুক্ষণ সহযোগিতা করে ও সংবাদ নিয়ে আবার রাজারবাগের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে একটা রিকসা পেলাম। বাংলা মটরের পরে আর যাবে না। বাংলা মটর নেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এই সুদীর্ঘ পথে হাজার হাজার হেফাজত কর্মীদের পায়ে হেটে বা কোন যানবাহনে করে ফেরার দৃশ্য চোখে পড়ছিল। বাংলা মটরে আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম কোন যানবাহনের, এমন সময় র‍্যাবের কয়েকটি গাড়ি মতিঝিলের অপারেশন শেষে উত্তরার দিকে ফিরছিল। আমাদেরকে রাস্তায় দাড়ানো দেখে র‍্যাবের গাড়ি থামলো এবং একজন অফিসার নেমে অকথ্য ভাষায় হেফাজত কর্মীদেরকে গালাগাল করে ঐ স্থানে দাড়িয়ে না থেকে সামনে হটার নির্দেশ জারি করল। বুকের উপর হায়াত নাম লেখা ঐ অফিসারের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল তিনি রাষ্ট্রের নন কোন বিশেষ দলের একজন দায়িত্বশীল।

যাই হোক তার তাড়া খেয়ে আমরা আবার হাটা শুরু করলাম। এভাবে মতিঝিল থেকে ঢাকার সব দিকেই হাজার হাজার হেফাজত কর্মী ৬ মের সকাল বেলা পায়ে হেটে কিংবা পরিবহনে করে গন্তব্যে ফিরছিল। চোখে-মুখে তাদের রাতের অন্ধকারে ঘটে যাওয়া সেই বিভিষিকাময় হত্যাকাণ্ডের আতঙ্ক বিরাজ করছিল। আর এভাবে ফেরার পথে আরো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে থাকে ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে। আওয়ামীলীগের ক্যাডার বাহিনী টুপি-দাড়িওয়ালা আলেম-ওলামা ও ছাত্রদের উপর ভয়ঙ্কর-মারাত্মক আক্রমণ চালায়। এমন ঘটনাও ঘটেছে ঢাকার কোথাও কোথাও যে, চলন্ত যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে থামিয়ে টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষদেরকে নামিয়ে বেদম মারপিট করেছে। বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে স্থানীয় ক্যাডাররা আগত বাস-টেম্পো-সিএনজি অটোরিক্সাগুলো তল্লাশি করে হেফাজতের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের উপর আক্রমণ চালায়। আমি আলহামদুলিল্লাহ নিরাপদেই মাদরাসায় পৌছলাম। মাদরাসার দফতরে আমাদের নাযিমে তালিমাত মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেবসহ শিক্ষকগণ মাদরাসার ছাত্রদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। দেখলাম ইতিমধ্যেই অনেকে আহত অবস্থায় মাদরাসায় এসে পৌছেছে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা চলছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, বেশি ও মারাত্মক পর্যায়ের আহত যাদের হাসপাতালে ভর্তি করে ভালো চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন, সেটা করা যাচ্ছে না। কাবণ হাসপাতালগুলোতে পুলিশি ও আওয়ামী অভিযান চলছে। এই আতঙ্কে

টুপি-দাড়িওয়ালা আহতদেরকে হাসপাতালগুলো চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আহ! মানবিকতার কতটা বিপর্যয় ঘটেছিল!

শুনেছি বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আহত রোগী ও রোগীর সাথের আপনজনদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মারাত্মক আহত যাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার শঙ্কা ছিল তারা ঝুঁকি নিয়েই বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এই ভর্তি হওয়া রোগীদের উপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রকম চাপ প্রয়োগ অব্যাহত থেকেছে। ঢাকা মেডিকেলসহ কোন কোন হাসপাতালে রোগীরা নিদারুণ অবহেলা, কটুক্তি এমনকি হুমকি ধমকির সম্মুখীন হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী কিছু মিডিয়া কর্মীর বাড়াবাড়ি ছিল এক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর চিকিৎসা সেবার পরিবর্তে মির্ডিয়া কর্মীদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। আর সাংবাদিক নামীয় কিছু পাষণ্ড এদের উপর উপর্যপরি চাপ প্রয়োগ করছিল। কোত্থেকে এসেছে? কোন মাদরাসার কোন হুযুর তাদেরকে হেফাজতের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে বলেছে? এ জাতীয় প্রশ্নবাণে আহতদেরকে জর্জরিত করেছে।

যাই হোক, মাদরাসার ভিতরেই ইসলামপ্রিয় কিছু ডাক্তার এসে আহতদের চিকিৎসা দিয়েছে। সেই সাথে মাদরাসায় বিভিন্ন শ্রেণীতে অনুপস্থিত ছাত্রদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাদের খোঁজ-খবর জানার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগে খাবার সংগ্রহ করে আহতদের জন্য নিয়ে এসেছে। এ সকল কার্যক্রম চলছে মাদরাসার দফতরে। আমি কিছুক্ষণ সেখানে বসলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে অবস্থা ও কুশল জানার জন্য উদগ্রীব আপনজনদের ক্রমাগত ফোন আসছিল। সংক্ষিপ্ত কথায় তাদেরকে আমার ব্যাপারে আশ্বস্ত করছিলাম। এছাড়া অন্যান্য সংবাদও অবগত করছিলাম। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ আমাকে আমার গ্রেফতার আশঙ্কার কথা জানিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য সতর্ক করতে লাগলেন। সকাল দশটার দিকে আমি রাহমানিয়া মাদরাসা দফতর থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী বন্ধুবর মাওলানা হুমায়ুন কবিরের বাসায় চলে গেলাম। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই থাকলাম। ইতিমধ্যে বাসা থেকে কাপড়-চোপড় আনিয়ে নিলাম শরীফকে দিয়ে। এভাবেই শুরু হলো এক রকম ফেরারী জীবন। সন্ধ্যায় মাওলানা হুমায়ুনের বাসা থেকে স্থানান্তর হয়ে চলে গেলাম কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের বোনের বাসায়। সেখানে তিন দিন থাকার পর গেলাম শ্বশুর বাড়ি। শুধু বাসা আর মাদরাসা বাদ দিয়ে মোটামুটি পরিচিত অন্যান্য জায়গায় বিচরণ করে কাটতে থাকল আমার সময়। মাঝখানে এক ফাঁকে স্বল্প সময়ের জন্য একবার মাদরাসায়ও গেলাম। ফেরারীর

এই সময়টায় হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। তাই রাহমানী পয়গামের জন্য শাপলা চত্বরের ট্রাজেডি নিয়ে একটি লেখা তৈরি করলাম। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে জাতীয় পত্রিকায়ও ছাপানোর তাকীদ আসলো কোনো কোনো পরিচিতজনের কাছ থেকে। সেমতে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায়ও লেখাটি পাঠানো হলো। তারিখের নয়া দিগন্তে লেখাটি ছাপায়। নিম্নে প্রদত্ত হলো।

শাপলা ট্রাজেডি :
চেতনায় প্রজ্জ্বলিত নতুন বালাকোট

৫ মে বাংলাদেশের ইতিহাসে আরো একটি কালো অধ্যায় রচিত হলো। তাওহীদী জনতার স্বতস্ফূর্ত ঈমানী জাগরণের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের কাপুরুষোচিত বর্বর গণহত্যা ও দমন-পীড়নের নজির হয়ে থাকবে এ দিনটি। হেফাজতে ইসলামের ডাকা এ দিনের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচিতে রাজধানীর ছয়টি প্রবেশপথে লক্ষ লক্ষ তাওহীদী জনতা শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। অবরোধ শেষে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশে যোগদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ছয় স্থানের সমবেত জনতা যাত্রা শুরু করে। আল্লাহর যিকির ও তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত সাদা-শুভ্র ঈমানী কাফেলার এ যাত্রা যেন শান্ত কিন্তু অনিঃশেষ জনস্রোত। ছয় দিক থেকে বহতা নদীর মতো এগিয়ে আসা পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ এই জনস্রোত শাপলা চত্বরের মোহনায় মিলিত হওয়ার পূর্বেই এর একটি শাখা আক্রান্ত হয় দুর্বৃত্তদের আক্রমণে। আওয়ামী দুর্বৃত্তদের এই আক্রমণই উন্মাতাল করে তোলে শান্ত বয়ে চলা জনতার স্রোতকে। এভাবেই সূচনা উত্তেজনার। তার পরের ইতিহাস নারকীয় তাণ্ডবের। নজিরবিহীন বর্বরতা। বুলেটের আঘাতে তাওহীদী প্রাণ কেড়ে নেয়ার আর স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড নারকীয় হত্যাকাণ্ডের। পেশী শক্তি আর বুলেটের জোরে ক্ষমতাসীন দাম্ভিকের দল পৈশাচিক বিজয়োল্লাস করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো এই দাম্ভিকতা ও পৈশাচিকতাই পতনের কফিনে শেষ পেরাক ঠুকে দেয়।

৫ মে দুপুর থেকে ৬ মে ভোর পর্যন্ত চলা শাপলাচত্বর ট্রাজেডি ঈমানদার মানুষের হৃদয়ে স্মরিত হবে স্বাধীন বাংলার নতুন বালাকোট হিসেবে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা ঈমানদার মানুষের শহিদী রক্তে ঢাকার রাজপথ যেভাবে রঞ্জিত হয়েছে, বালাকোট প্রাঙ্গণে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহ.) ও তার সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের সাথেই তার তুলনা চলে। ১৮৩১ এর ৬ মে বালাকোটের প্রান্তরে উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের বীর শহীদানদের শাহাদাতে বাহ্যত মনে হয়েছিল ঈমানদারদের পরাজয় আর ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু

ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। সে দিনের বীর শহীদদের আত্মদান যেমন যুগ যুগ ধরে মহান স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রেখেছে লাখো মানুষের হৃদয়পটে আর দ্রোহের আগুন জ্বেলেছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, তেমনি ২০১৩ এর ৬ মেও যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষের মনে এক দিকে যেমন জ্বালবে ঈমানী চেতনার প্রোজ্জ্বল মশাল তেমনি ইতিহাসের ঘৃণিত খুনি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আজকের ক্ষমতাসীন মহল।

তবে মর্মান্তিক, লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডের কার্যকারণ ও দায়-দায়িত্বের প্রশ্নে কয়েকটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। এই ঘটনার সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট, যারা কোনো না কোনোভাবে এর দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য তারা হচ্ছে সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, হেফাজত নেতৃবৃন্দ ও বিরোধী দল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট এই পক্ষগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব পর্যালোচনা করলে পূর্ণ ঘটনার একটি প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে বলে আমরা মনে করি।

সরকারী দলের ভূমিকা

সরকারী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা পর্যালোচনায় প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয় সেটি হলো, সরকার বিরোধী যে কোনো কর্মসূচি পালন কালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন এক সংস্কৃতি চালু করেছে আর তাহলো বিরোধী পক্ষকে ঠেঙ্গানোর জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সাথে রাজপথে দলীয় ক্যাডার বাহিনীর উপস্থিতি। স্বভাবই ময়দানে একই সময়ে পরস্পর বিরোধী দুটি পক্ষ মারমুখী অবস্থানে থাকলে উত্তেজনা ও সংঘাত অনেক বেশি হয়। মাঠ দখল ও নৈরাজ্য প্রতিরোধের নামে এমনই এক উস্কানিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। হেফাজতে ইসলামের অবরোধ কর্মসূচির আগের দিন আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের ক্যাডার বাহিনীকে অবরোধকারী হেফাজত কর্মীদেরকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব ক্যাডাররা অবরোধের বিভিন্ন পয়েন্টে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কদমতলী-বাবু বাজার পয়েন্ট থেকে অবরোধকারীরা শাপলা চত্বরের সমাবেশে আসার পথে আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে দুপক্ষের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতের জন্য পরস্পর এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দায়ী করছে। যদিও মিডিয়াতে শুধু সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের গুলি চালানোর ও লাঠিসোটা দিয়ে হেফাজতকর্মীদের উপর চড়াও হওয়ার ছবি এসেছে। বিপরীতে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে কথিত হামলার

কোনো ছবি সরকারপন্থী মিডিয়াতেও দেখা যায়নি। তবুও এই বিতর্কে না গিয়েই মোটা দাগের দুটি প্রশ্নের কি কোনো জবাব সরকারী দল দিতে পারবে?

একটি হলো– যদি কোনো নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় সেজন্য কি পুলিশ-র‍্যাব, বিজিবি যথেষ্ট ছিল না? দলীয় ক্যাডার বাহিনীর কী প্রয়োজন ছিল? স্বাভাবিক কথা, এখানে লাখো জনতার ঈমানী আবেগের ব্যাপার। সেখানে খোদ সরকারই কেন উস্কানি দিয়ে সংঘাতের পথ খুলল?

দ্বিতীয়টি হলো, সরকারের ঘোর সমর্থক মিডিয়াগুলোতেও ছাত্র ও যুবলীগের ক্যাডারদের ফ্রী স্টাইলে আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে এ্যাকশনের বহু সচিত্র সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। বিপরীতে হেফাজতের নিজস্ব কর্মী তো দূরের কথা হেফাজতের নামে যারা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় অংশ নিয়েছে তাদের ব্যাপারেও এই ধরনের কোনো সংবাদ তারা প্রকাশ করতে পারেনি। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দলীয় ক্যাডার বাহিনীর এই সন্ত্রাসী এ্যাকশন ও হেফাজতের নিরীহ কর্মীদেরকে বিচ্ছিন্ন পেয়ে তাদের উপর বর্বরোচিত হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সংঘাতের সূচনা। সংঘাত শুরু হওয়ার পর বিক্ষিপ্ত লোকজন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

হেফাজতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ অরাজনৈতিক ঈমানী এই আন্দোলনকে বাধা দিয়ে সরকার কী পেল? লাখো জনতার এই জাতীয় আবেগপ্রবণ কর্মসূচিতে যেখানে ধৈর্য ও সহনশীলতাই প্রধান কাম্য সেখানে দায়িত্বশীল সরকারই ঘটালো সবচেয়ে বড় ব্যাঘাত।

আরো একটি সংশয় হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকান-পাটসহ ভবন ও গাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা আসলে কারা ঘটিয়েছে? হেফাজতের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা না আসলে এটা সরকার দলীয় স্যাবোটাজ? আওয়ামী মিডিয়াগুলো ফলাও করে পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপের ছবি ছাপিয়েছে কিন্তু হেফাজতের কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করছে বা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে এমন কোনো সচিত্র সংবাদ নেই। এতেও কি এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় না যে, এটা সরকারের পরিকল্পিত স্যাবোটাজ? হ্যা আমাদের দৃষ্টিতে যেটা এসেছে যে কাঁদানে গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য হেফাজতের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিক্ষিপ্ত কিছু মানুষ রাস্তার পাশ থেকে কাঠের চৌকি, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাস্তার মধ্যখানে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধ্বংসযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ যদি হেফাজত কর্মীরাই করবে তবে তো তাদের একচেটিয়া দখলে থাকা ইত্তেফাকের মোড় থেকে ফকিরাপুল পর্যন্ত এই এলাকাতেই করতো?

এর পরের কথা হলো, সংঘাত-সহিংসতা হয়েছে হেফাজতে ইসলামের মূল কর্মসূচিস্থলের বেশ দূরে এবং সেটাও চলেছে সন্ধ্যা নাগাদ। সন্ধ্যার পর সব দিকের সংঘাত বন্ধ হয়ে যায়। গোটা এলাকা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। হেফাজতে ইসলামের শান্তিপ্রিয় সুশৃঙ্খল কর্মসূচি চলতে থাকে দৈনিক বাংলা-নটরডেম-ইত্তেফাক এই এলাকায়। হেফাজত নিয়ন্ত্রিত এই এলাকায় লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় ঈমানদার মানুষের যিকিরের কাফেলায় সন্ধ্যা রাতে একবার অভিযান চালানো হয়। তখন দৈনিক বাংলা সড়ক থেকেও হেফাজতের কর্মীরা অনেক পিছু হটে দুই পাশের নটরডেম ও ইত্তেফাকের দিকের সড়কে শুয়ে-বসে সময় কাটাতে থাকে। এই অবস্থায়ই রাস্তার সকল আলো নিভিয়ে দিয়ে ভুতুড়ে এক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাত পৌনে তিনটায় তিন দিক থেকে সাড়াশি অভিযানে জঘন্যতম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাও ছিল বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। কেন তাদের আশ্রয়ে থেকে সরকারী দলের ক্যাডাররা প্রতিপক্ষের উপর গুলি বর্ষণ করবে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, তারা এমন একটা সময় ঘুমন্ত, বিশ্রামরত ও তাহাজ্জুদের নামাযরত ঈমানদার মানুষের ওপর ক্র্যাকডাউন চালালো যখন সমাবেশস্থল ছাড়া বাকি সব তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালনরত হেফাজতে ইসলাম এমন কী অপরাধ করল যার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর এমন বর্বরোচিত হামলা করতে হবে?

হেফাজত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

হেফাজতে ইসলাম কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে গেল? কী উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে? কোনো কোনো মহল এমন প্রশ্নও উত্থাপন করছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে যা তথ্য-উপাত্ত আছে এবং সামগ্রিক অবস্থার পর্যবেক্ষণে যা বেরিয়ে আসে তাহলো প্রথমত ইসলামের পক্ষে বড় অর্জনের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে ইসলামের পক্ষে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে নিকট অতীতে এর নজির নেই। তাই ধারণা ছিল প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করার বিরুদ্ধে কঠোর আইন পাশের দাবিটি অন্তত আদায় করা সম্ভব হবে। শাহবাগীদের অবস্থানে বসিয়ে সরকার যেমন নিজেদের এজেণ্ডায় আইন সংশোধন করেছে। তেমনি অবস্থানের মাধ্যমে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে

চাপে ফেলা যাবে। কারণ সরকারী প্রশ্রয়ে শাহবাগে টানা অবস্থান এবং শোডাউন হয়েছে। সরকার অবস্থান কর্মসূচিকে সমীহ করেছে শাহবাগের ক্ষেত্রে। কাজেই অবস্থানের ব্যাপারে সরকারের নৈতিকভাবে দুর্বল থাকার কথা। সেই সাথে মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির পক্ষ থেকে এমন কর্মসূচির চাপ ছিল। সব সময় ইসলামপন্থীরা আন্দোলন করে কিন্তু কোনো দাবি দাওয়া আদায় হয় না। এবারের জাগরণ নজিরবিহীন হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশাটাও ছিল বেশি। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপর সরকার নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাবে এমন কল্পনাও ছিল না। এতো বিশাল জনসভার শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর এহেন ঘৃণ্য হামলার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

হেফাজতের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল ও আছে মর্মে যে প্রচারণা কোনো কোনো মহল চালায় সে ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো, হেফাজতের বয়োজৈষ্ঠ নেতৃবৃন্দ ও সামগ্রিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক চিন্তার উর্ধ্বেই ছিলো।

অবশ্য হেফাজত নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা ছিল, কোনো কোনো মহল হেফাজতের কর্মসূচিতে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সরকার দলীয় ক্যাডাররা মাঠে নেমে পরিস্থিতি আরো বেশি ঘোলাটে করেছে।

বিরোধী দলের ভূমিকা

হেফাজতে ইসলাম বিষয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র ভূমিকা হেফাজতের জন্য বড়ই বিব্রতকর। একদিকে তারা হেফাজতের কোনো একটি দাবির ব্যাপারেও ইতিবাচক দৃষ্টি দেখায় না কিন্তু গায়ে মেখে আবার হেফাজতের আন্দোলনের ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে চায়। হেফাজতের আন্দোলনে গড়ে ওঠা সেন্টিমেণ্টকে এমনি এমনিই নিজেদের পকেটে ভরতে সস্তা ঘোষনাও দেয়। হেফাজতের পক্ষে মাঠে নামার বিরোধী দলীয় ঘোষণায় বিএনপির কোনো জনশক্তি তো নামেইনি, উপরন্তু হেফাজত সরকারের আরো বেশি টার্গেটে পরিণত হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও ঈমানী ইমেজ নষ্ট করতেই বরং বেশি ভূমিকা রেখেছে বিএনপির এই সকল কার্যক্রম।

সম্ভাব্য ফলাফল

হেফাজত নেতৃবৃন্দের কিছু অসচেতনতা, বিরোধী দলের সুবিধাবাদী ভূমিকা প্রতীয়মান হলেও ঐতিহাসিকভাবে ৫-৬ মে'র নতুন বালাকোটের রক্তাক্ত প্রান্তরের মূল খলনায়কের কালিমা আওয়ামী লীগের কপালেই লেপটে থাকবে।

বিরোধী প্রচার মাধ্যমগুলোকে বন্ধ করে হত্যাযজ্ঞের প্রকৃত চিত্র তারা আড়াল করতে পেরেছে মনে করে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেও ঘটনা এখানেই থেমে থাকবে বলে মনে হয় না। নিজেদের পোষা মিডিয়ার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরীফ আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনাকে তারা গোয়েবলসীয় প্রচারণা চালিয়ে মনে করছে দেশের সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ এখন থেকে হেফাজতে ইসলাম এবং আলেম সমাজকে কুরআনের শত্রু মনে করবে আর রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুর মতো কমিউনিস্টদেরকে কুরআনের পক্ষের শক্তি বলে বিশ্বাস করতে থাকবে। ইতিপূর্বেও ২০০১ সালে তারা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)কে পুলিশের হত্যাকারী হিসেবে মিডিয়াতে অনেক প্রচার করে মনে করেছিল মানুষ বুঝি সত্যিই শাইখুল হাদীস (রহ.) ও আলেম সমাজকে হত্যাকারী আর আওয়ামী লীগকে শান্তিকামী বিশ্বাস করেছে।

সেবার যেমন পরিণাম আওয়ামী লীগের জন্য শুভ হয়নি। এখনও হেফাজতে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে এ সকল অপপ্রচার চালিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমন করতে পারবে মনে করলে মস্ত বড় ভুল করবে। বরং সরকারের পোষা মিডিয়ার অতিরঞ্জিত প্রচারণাকে ধর্মপ্রাণ মানুষ সরকারের অপকর্ম বলেই ধরে নিচ্ছে। মানুষের মনের আস্থা ও ভালোবাসা শুধু প্রচারণা দিয়েই হয় না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দ্বীন ইসলামের সত্যিকার ধারকদের ভাব-মর্যাদা মানুষের হৃদয়ে এই পরিমাণ দান করেন যে, তার মোকাবেলা কোনো প্রচারণা দিয়েই সম্ভব নয়। আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী সত্তরোর্ধ একজন বৃদ্ধ হাদীসের শিক্ষক। হাজার হাজার আলেমের সম্মানিত এই উস্তাদের প্রতি সরকারের অসম্মানজনক আচরণ কোনোভাবেই ভালো পরিণাম বয়ে আনতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস দিন যত গড়াবে আঁধার কেটে ততো আলো ফুটতে থাকবে। আর সেই সাথে ক্রমান্বয়ে ৬ মে'র গভীর রাতের ভুতুড়ে অন্ধকারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কপালে লেপ্টে যাওয়া তাওহীদী জনতাকে হত্যার তিলক চিহ্নও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকবে...।

ঢাকা থেকে খুলনার পথে

ওদিকে খুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসের বাইশ তারিখ অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সহিংসতার ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমি খুলনায় দুটি মাহফিলে চলমান ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। শানে রেসালাত (সা.) বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নবীপ্রেমিক মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়। এই অপরাধে পরের দিন যখন আমি ঢাকায় অবস্থানরত, খুলনায় সংগঠিত ঘটনায় দায়েরকৃত উভয় মামলায় খুলনার শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সাথে আমাকেও আসামী করা হয়। দায়েরকৃত ওই দুটি মামলায় গ্রেফতার এড়াতে আমরা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেই। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষে ১২ মে রবিবারের মধ্যে নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতার কথা জানতে পারি আমাদের আইনজীবির কাছ থেকে। চলমান এই পরিস্থিতিতে খুলনায় যাওয়া কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল। ওদিকে আবার আইন-আদালতের ব্যাপার। কী থেকে কী হয়! তাই কিছুটা দোদুল্যমানতা ও সংশয় কাজ করছিল। ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কী করব। এহেন পরিস্থিতিতে একা সিদ্ধান্ত নেয়াটা সমীচীন মনে হলো না। তাই একান্ত জরুরি ভিত্তিতে পরামর্শ করতে লাগলাম যাবো কি যাবো না। আইন-আদালতের বিষয়ে আমাদের মধ্যে মাহফুজ ভাই ও মাহমুদ ভাই তুলনামূলক ভালো বুঝেন। মাহফুজ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ হলো না। ফোনেই জানতে চাইলাম তার মতামত। তিনি স্পষ্ট কোন মত দিতে পারলেন না। আইনী ব্যাপার খতিয়ে দেখার কথা বললেন।

আরো দু-একজনের সাথে কথা বললাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের পারিবারিক অভিভাবক মাহমুদ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতে কথা বললাম ফারুক ভাইয়ের নর্থ সাউথ ট্রাভেলসের অফিসে। মাহমুদ ভাই এডভোকেট আরিফ ভাইকে ফোন দিলে তিনি জানালেন, নিম্ন আদালতে হাজির না হলে আদালত অবমাননার জটিল মামলা হয়ে যেতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত হলো খুলনা যাওয়ার। সেমতে ঈগল পরিববহনের রাত ১০টার এসি গাড়িতে টিকেট কাটলাম। সারা রাতের সফর শেষে সকাল ৭টা নাগাদ আমাদের গাড়ি খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র রয়েলের মোড়ে পৌছল। অন্যান্য যাত্রীদের সাথে আমিও নামলাম। পূর্ব থেকেই আমাকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন আমাদের বাংলাদেশ খেলাফত

যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক ও খুলনা জেলা সভাপতি হাফেজ শহিদুল ইসলাম। বাস থেকে নেমে রিক্সা বা অটো রিক্সার খোঁজ করলাম। পেলাম না। ইতিমধ্যে বাসের সকল যাত্রীই নেমে পড়েছে। বাসটি যখন যাত্রা করবে সোনাডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডের দিকে, সুপার ভাইজার দেখলেন আমরা তখনও বাহনের অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদেরকে ডেকে বাসে উঠিয়ে নিলেন এই বলে যে, চলুন আপনাদের গন্তব্যের কাছে নেমে পড়তে পারবেন। আমি আর শহীদ ভাই আবার সেই ঈগল পরিবহনের বাসে উঠে বসলাম। সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে পৌছার একটু আগেই হোটেল আলি বাবা। এর কাছেই শহীদ ভাইয়ের বাসা। আমরা হোটেল আলি বাবার সামনে নেমে পড়লাম। কয়েক কদম হাটলেই তালীমুল মিল্লাত মাদরাসার গেটের লাগোয়া শহীদ ভাইয়ের বাসা। আমরা দু'জন কোন দিকে না তাকিয়েই সেদিকে পা বাড়ালাম।

পুলিশের হাতে আটক

বাস থেকে নেমে কয়েক কদম আগাতেই পেছন থেকে কেউ আমাদেরকে ডাক দিলো। আমরা সাড়া দিলে আমাদেরকে অদূরে মোটর সাইকেল নিয়ে দাড়ানো দু'জন সাদা পোশাকের মানুষের দিকে ইশারা করা হলো। আমরা গেলাম। বুঝলাম, সাদা পোশাকের পুলিশ তারা। জিজ্ঞাসা করলো কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। আমি ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছি বললাম। শহীদ ভাইকে বন্ধু বলে পরিচয় দিলাম। দিনটি ছিল জামাত-শিবিরের হরতালের। ভোর থেকেই তাই সন্দেহভাজন বা নবাগতদের উপর নজরদারি চলছিল। আমাকে ঈগল পরিবহনের হিনো আর. এম টু বিলাসবহুল এসি বাস থেকে নামতে দেখেই হয়তো তাদের কাছে নেতা টাইপের বলে মনে হয়েছে। আমার দিকে তীর্যক মন্তব্য ছুড়ে দিলো তাদের একজন, 'সাংগঠনিক কাজ করতে এসেছেন?' তাছাড়া খুলনায় বড় বড় মাহফিলগুলোতে জোরালো বক্তব্য রাখার সুবাদে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে আমার চেহারা-সুরত পরিচিত থাকাই স্বাভাবিক। তাই হতে পারে আমাকে চিনতে পেরেছে তারা। পুলিশের ভ্রাম্যমান গাড়িকে মোবাইল ফোনে খবর দিয়ে আমাদের দু'জনকে তাতে তুলে দিলো। ঘড়ির কাটায় তখনো সকাল সাতটা বাজেনি। থানায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের দু'জনকে। আমাদের মোবাইল ফোন আমাদের হাতেই ছিল। আমরা পরিচিতজনদেরকে সংবাদ অবগত করে দিলাম।

ওসি সাহেব তখনো থানায় আসেননি। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। সংবাদ পেয়ে খুলনার অনেক ভাই থানায় আসতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই

আমাদের দু'জনকে থানার গারদে নিয়ে রাখা হলো। সংবাদ পেয়ে শহীদ ভাইয়ের মাদরাসা থেকে কেউ এসে আমাদের জন্য নাশতা দিয়ে গেল ও আমাদের ব্যাগ ও মোবাইল ফোন নিয়ে গেলো। নয়টার দিকে ওসি সাহেব আসলেন।

সোনাডাঙ্গা থানার ওসি কামরুজ্জামান। আওয়ামী আমলের পাঁচ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে যে কয়জন ব্যক্তি মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছে, সে তাদেরই একজন। খুলনা শহর থেকে আওয়ামীলীগ বিরোধী যে কোন ব্যক্তি বা কর্মকাণ্ডকে নির্মূল করতে জমদূতের মতো ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসনে দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে ওসি কামরুজ্জামানের ভূমিকা খুলনা জুড়েই বহুল আলোচিত বিষয়। বিরোধী মতকে ঠেঙ্গানোর জন্য আওয়ামী লীগের খুলনার হাতিয়ার হলো এই কামরুজ্জামান। তবে আমাকে তার তোপের মুখে খুব একটা বেশি পড়তে হয়নি। আমাকে ওসি নিজ রুমে ডেকে পাঠিয়ে দাড় করিয়ে কথা বলা শুরু করে এবং আমিই বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতির পরিচয়টি এখানে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ শানে রেসালাত (সা.) ইস্যুতে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সারাদেশ অগ্নিগর্ভ, খুলনাকে তখনো অনেকটা নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ময়লা পোতায় আমাদের সংগঠনের ভাইদের উদ্যোগে 'শাইখুল হাদীস পাঠাগার'-এর ব্যানারে একুশে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে আমাকে প্রধান অতিথি রাখা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী রাজনীতি ও শানে রেসালাত (সা.) বিষয়বস্তুর উপর জোরালো আলোচনা হলে মানুষের মধ্যে বেশ জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং সর্বপ্রথম এই মাহফিল থেকেই আমি পর দিনের বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করি। আল্লাহর রহমতে পরদিন শুক্রবার বাদ জুমা খুলনার ইমাম পরিষদের ব্যানারে গণ-বিস্ফোরণ ঘটে। বিক্ষোভ মিছিলে এক পর্যায়ে গণ্ডগোল হয়। এতে খুলনা সদর ও সোনাডাঙ্গা থানায় দুটি মামলা হলে উভয়টিতে আমাকে এজহার নামীয় আসামী করা হয়। শাইখুল হাদীস পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাহফিলের প্রচারপত্রে আমার পরিচয়ে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি লেখা হয়েছিল। আর এ কারণেই খুলনার প্রশাসন যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মামুনুল হককে খুঁজছিল। ওসি সাহেব আমার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'আপনি তো অনেক উস্কানীমূলক কথা বলেন।' কিন্তু ওসি সাহেবের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল এই যে, দায়েরকৃত উভয় মামলায় আমি হাইকোর্টের জামিনে ছিলাম। তাই আমাকে সেই মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না।

এক পর্যায়ে ওসি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করা শুরু করলেন এবং আমাকে চেয়ারে বসতে বললেন। ইত্যবসরে খুলনার শীর্ষস্থানীয় এবং প্রায় সকল মতের আলেম-ওলামাগণ থানায় এসে হাজির হলেন। সরকার সমর্থক বেশ কয়েকজন আলেমও আসলেন। সকলেই আমাকে থানা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওসি কামরুজ্জামান বেশ চতুর মানুষ। তিনি তলে তলে যোগাযোগ করে ঢাকার মতিঝিল থানায় শাপলা চত্বরের ঘটনায় যে মামলা হয়েছে সেই মামলার খবর সংগ্রহ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ওনার নামে ঢাকার মতিঝিল থানায় মামলা আছে। কাজেই আমার কিছু করার নেই। অথচ মতিঝিল থানার মামলায় আমার নামে কোন ওয়ারেন্ট না থাকায় আমাকে গ্রেফতার করতে পারে না। তাই বিশেষ ক্ষমতা আইনের চুয়ান্ন ধারায় আমাকে আটক দেখিয়ে কোর্টে চালান করে দিলেন। কোর্টের চালান পত্রে বিনা প্রয়োজনেই কিছু নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ লিখলেন। আমাকে আটক করা হয়েছে সোনাডাঙ্গা থানার কাছ থেকেই ভোঁর সাতটার দিকে অথচ চালানপত্রে লিখেছে পৌনে দশটায় হরতালের পিকেটিং রত অবস্থায় রয়েল হোটেলের মোড় থেকে আটক করেছে পুলিশ।

> *এটাই আমাদের দেশের প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থার বাস্তব চিত্র। মিথ্যা ছাড়া কোন কাজ হয় না। প্রতিটি পদে পদে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় বা নিতে হয়। সত্য লিখলে মামলা হয় না, মামলা না হলে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন হয় না। তাই মিথ্যা লিখলেন।*

মিথ্যা ফরোয়ার্ডিং দিয়ে আমাকে কোর্টে চালান করে দিলেন। কোর্টে জামিনের আবেদন করা হলে তা নাকচ করে ম্যাজিস্ট্রেট জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন।

খুলনা কারাগারে

বিকালের দিকে প্রিজন ভ্যানে করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জেলখানায় আনা হলো। কোর্ট থেকে জেল গেটের দূরত্ব সামান্যই। পাঁচ-সাত মিনিট লাগলো। গেটের আনুষ্ঠানিকতা সেরে জেলখানায় ঢুকতে সাড়ে পাঁচটার মতো বেজে গেলো। জেলের ভিতরে ঢুকিয়ে গণনা ও চেকিংয়ের জন্য সারি সারি দাড় করানো হয়। আমরা সেখানে দাড়ানো থাকতেই ভিতরের কেউ কেউ আমাকে চিনতে পারলেন। অল্প সময়েই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল জেলখানায়। ২২ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় আটক আমাদের বেশ কিছু ভাই তখনো জেলে ছিলো। তাছাড়া জামাত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরাট একটা দলতো আছেই। আমি ভিতরে ঢুকতেই বেশ শানদার একটা অভ্যর্থনা হয়ে গেলো। আমরা যারা আজকের নবাগত বন্দী তাদেরকে আমদানীতে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে জামাত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি জনাব মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ জামাতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং খুলনা জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম কিবরিয়া সাহেব আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। এতো মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা আর আন্তরিকতাপূর্ণ অভিবাদনে কারাগারটাকে বেশ আপন বলেই মনে হলো।

রূপসা– ৯ নামে একতলা একটা ভবন আমদানী নামে পরিচিত। নবাগত বন্দীদেরকে এখানে রাখা হয়। একদিন থাকার পর সুবিধাজনক জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। কিছু বন্দী আবার স্থায়ীভাবেই আমদানীতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা মুফতী ইবরাহীম খলীল। তিনি এখানকার ইমাম। বেশ মিশুক মানুষ। দাওয়াতী মেযাজের। অল্প সময়ের মধ্যেই তার সাথে সখ্যতা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আসরের নামাযও সেরে নিলাম। থাকা-খাওয়ার সুবিধাজনক ব্যবস্থা মুফতী ইবরাহীমের মাধ্যমে খুব সহজেই হয়ে গেলো।

খুলনা কারাগারের হালচিত্র

জীর্ণ-শীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দুটি চারতলা ভবন রূপসা ও ৩০ সেল, দুটি একতলা ভবন আমদানী ও হাসপাতাল, ফাঁসির আসামীদের জন্য আলাদা ফাঁসির সেল, আর কিছু টিনসেড ঘর এবং মহিলাদের জন্য আলাদা একটা বাউন্ডারী এই নিয়ে খুলনা জেলা কারাগার। ক্যান্টিন আর চৌকা (রান্না ঘর) আছে। এছাড়া সামান্য

একটু খোলা জায়গাও আছে যেখানে একটা ভলিবল খেলার কোর্ট বানানো। প্রতিদিন বেশ ঘটা করে বিকাল বেলায় এখানে বন্দীরা ভলিবল খেলে। মাঝে মাঝে আবার এখানেই ক্রিকেটও খেলে। জুমার দিনে এই জায়গাটাতেই শামিয়ানা টানিয়ে জুমার নামায আদায় করা হয়। তাছাড়া একটা ফাঁসির মঞ্চ বানানো আছে। যেখানে বহু আলোচিত এরশাদ শিকদারের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছিলো। আরেকটি জায়গা আছে, যাকে বলা হয় কেইস টেবিল। এখানে বসেই জেলার ও জেল সুপার বন্দীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। তাছাড়া এই কেইস টেবিল থেকেই জেল প্রশাসনের যাবতীয় নির্দেশনা বন্দীদের উপর কার্যকর করা হয়। এখানে একটি মাইক লাগানো আছে, প্রত্যেকটি এলাকায় আছে তার হর্ণ। এভাবে পূর্ণ জেলে এখান থেকে ঘোষণা দেয়া হতে থাকে এবং সে মোতাবেক চলতে থাকে কাজ।

খুলনা কারাগারের কিছু ভালো দিক

খুলনা কারাগারের ভালো দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো কেইস টেবিলে বন্দীদের বসার ব্যবস্থা। সভ্য যুগের জেলব্যবস্থায় এখনো যে সকল অসভ্য ও বর্বর রীতি প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো কেইস টেবিলে বন্দীদের ফাইল দেওয়ার ব্যবস্থা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারসহ অন্যান্য কারাগারে নিয়ম হলো, নবাগত বন্দীদেরকে ভোরবেলা ডেকে নিয়ে কেইস টেবিলের সামনে বসানো হবে। এটাকে বলা হয় জেলার ফাইল। জেলার সাহেব আসবেন। তার আসার নির্দিষ্ট কোন সময় থাকবে না। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশি সময় কোন কোন দিন অপেক্ষা করতে হয়। আর এই সময়টা বসতে হবে মাটিতে দুই পায়ের উপর ভর করে। চারজন কিংবা পাঁচজন করে মানুষকে ভিক্ষুকের মতো সারিবদ্ধ করে বসিয়ে রাখা হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জেলার সাহেব আসলে সুবেদার সাহেব বলবেন, 'বন্দীগণ সাবধান!' তখন সকলে উঠে দাড়িয়ে জেলার সাহেবকে সালাম দিতে হবে এবং আবার পূর্বের মতো দুই পায়ে ভর করে মাটির উপর ভিক্ষুকের মতো বা বাথরুম করার মতো বসতে হবে। আর জেলার সাহেব চেয়ারের উপর বসে বাবুগিরি করবেন। খুলনা কারাগারে ব্যবস্থাটা ব্যতিক্রম। এখানে ইটের গাথুনি দিয়ে তার উপর টাইলস বিছিয়ে বসার টুল বানানো আছে। সেই টুলের উপর কিছুটা আরামদায়ক ও সম্মানজনকভাবে বন্দীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুলনা জেলার আলোচিত ও পরিচিত ব্যক্তিত্ব কয়েদী আসামী, এরশাদ শিকদারের কেইস পার্টনার লিয়াকত লশকর উদ্যোগ নিয়ে কোন এক জেল সুপারকে দিয়ে এই ভালো কাজটি করিয়েছেন।

খুলনা জেলের ভালো আরেকটি দিক হলো, পুরা জেল উন্মুক্ত। যে কোন বন্দী সারা দিন যে কোন জায়গায় বিচরণ করতে পারে।

আরেকটি ভালো দিক হলো, অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভালো তরকারী রান্না করে বন্দীদের মাঝে বিক্রি করে। বন্দীগণ নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে ও সাধ্যের আলোকে তা খরিদ করে খাওয়ার সুযোগ পায়। পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা ও গোসলের সুবিধাও এই কারাগারের ভালো দিকগুলোর অন্যতম।

খুলনা কারাগারের কিছু মন্দ দিক

দেশের অন্যান্য কারাগারের মতো খুলনায়ও ধারণ ক্ষমতার চাইতে দুই-তিন গুণ বেশি বন্দী। যেখানে সর্বোচ্চ ছয় সাত শত বন্দী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে বন্দী রাখা হয়েছে দুই সহস্রাধিক। অন্যান্য কারাগারের মতো প্রতিটি ওয়ার্ডে আছে টেলিভিশন। সেই সাথে আছে ভিসিআর চালানোর ব্যবস্থা। বিরতিহীনভাবে অশ্লীল যতসব দেশি-বিদেশী সিনেমা তো চলতেই থাকে। সেই সাথে রাতের বেলা আবার কখনো কখনো ব্লু-ফ্লিমও চালানো হয়। আমলের পরিবেশ তো দূরে থাক, টেলিভিশনের শব্দে বিশ্রাম করাও কঠিন। আবদ্ধ বন্দীদের মধ্যে অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির এই ধুমধাম আয়োজনের পর কি রকম পাপ-পঙ্কিলতার সয়লাব হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বড় রকম সমস্যা হলো খুলনা কারাগারের জীর্ণকায় ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন। বিশেষত প্রায় এক হাজার মানুষের আবাস স্থল চারতলা বিশিষ্ট রূপসা ভবনটির অবস্থা খুবই বিপদজনক। সেখানে আপাতত বাড়তি কিছু ইটের গাথুনি দিয়ে ঠেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতেও ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে কোনভাবেই বলা যায় না।

অধিকাংশ টয়লেটগুলোর বেহাল দশা। বন্দীরা যেন বাথরুমে গিয়ে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় এইজন্য কোন কারাগারেই পূর্ণ বদ্ধ টয়লেট নেই। কিন্তু টয়লেটগুলোর দরজা অন্তত চার সাড়ে চার ফুট উঁচু থাকে তাতেও কোন রকম চলে। কিন্তু খুলনা কারাগারের অধিকাংশ টয়লেটের দরজাই তিন ফুট বা তার চেয়েও কম। ভদ্র মানুষের জন্য এটা খুবই বিব্রতকর।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো মালামাল পৌছানোর ব্যবস্থা। জেল কর্তৃপক্ষ দুটি ক্যান্টিন পরিচালনা করে। একটি বাইরে আরেকটি ভিতরে। বাইরে থেকে খাবার-দাবার বা ব্যবহার্য কোন সামগ্রী কেউ পাঠাতে চাইলে কারাগারের নির্দিষ্ট ক্যান্টিন থেকেই কিনে দিতে হবে। নিজেদের স্বাধীন মতো কেনা কোন সামগ্রী

ভিতরে ঢুকতে দিবে না। আর ভিতর থেকে কিনতে হলেও তাদের ক্যান্টিন। এইভাবে বন্দী ও তাদের আপনজনদেরকে যিম্মি করে কারা কর্তৃপক্ষ দেদারসে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবসা। এমনকি যে সকল শুকনো খাবার ও ফল-ফলাদি বহন করা জেল কোড অনুযায়ী বৈধ সে সকল খাবার ও ফল বন্দীরা কোর্ট থেকে আসার সময়ও সাথে করে নিয়ে ঢুকতে পারে না। কারণ এতে কর্তৃপক্ষের ক্যান্টিন বাণিজ্যে সমস্যা হতে পারে।

খুলনা কারাগারের অব্যবস্থাপনার মধ্যে আরেকটি হলো, অপ্রয়োজনে কিছু মানুষকে সকাল বেলার জেলার ফাইলে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা। যাদের নামে নতুন মামলা আসে তাদের কাষ্টডিতে সেই মামলা তুলে দিয়ে কোর্টের তারিখটা জানিয়ে দিলেই হয় এজন্য তাদেরকে ফাইলে ডাকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বন্দীদের এতটুকু সুবিধার কথা বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না।

খুলনা কারাগারে আমার দিনকাল

খুলনা কারাগারে তিন দফায় আমার মোট বাইশ দিন থাকা হয়েছে। প্রথম দফায় ১২ মে রবিবার দিন বিকাল থেকে ২৭ মে সোমবার বিকাল পর্যন্ত থেকেছি। পুরাতন ও নতুন পরিচিতজনদের মাঝে কারাজীবনের প্রাথমিক এই দিনগুলো বাহ্যিকভাবে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে গেছে। প্রতিদিনই প্রচুর সাক্ষাতপ্রার্থী এসে সাক্ষাত করেছে। সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিয়ে খুলনার শহীদ ভাইসহ অন্যান্য সাথীরা সকল প্রয়োজন পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে খুলনার সাঈদ ভাই, ওলিউল্লাহ ভাই, আবদুল্লাহ ভাই, ফালাহুদ্দীন ভাই ও শামছুল হক ভাইসহ ছাত্র মজলিসের ভাইদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামও অনেকে এসে সাক্ষাত করেছেন। চেষ্টার কথা জানিয়েছেন। সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন।

খুলনায় শক্তিশালী একটি টিম আমার মুক্তির জন্য চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সেই হিসাবে প্রথম দিকে এমন একটি স্বপ্নও বুকে লুকিয়ে ছিল যে, সপ্তাহ খানেক সময়ের মধ্যেই হয়তো আমি বের হয়ে আসতে পারব। কিন্তু ১৭ মে শুক্রবার সকাল বেলা যখন কেইস টেবিল থেকে ঘোষণা আসল 'মামুনুল হক পিতা আজিজুল হক' তখনই দপ করে সেই আশার আলো নিভে গেলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, ঢাকা থেকে আমার মামলা চলে এসেছে। সুতরাং খুলনার চুয়ান্ন ধারা থেকে মুক্তি মিললেও সহসা বের হওয়া সম্ভব হবে না। ১৭ মে শুক্রবারের প্রথম প্রহরের এই স্বপ্নভঙ্গের মুহূর্তটিই ছিল আমার খুলনায় অতিবাহিত

দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও কঠিন সময়। একটি স্বপ্ন মানুষ লালন করে বহু দিন। স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। দীর্ঘ সাধনায় জ্বালিয়ে রাখা আলোর প্রদীপ যেমন হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার এক দমকায় নিভে যায়। তেমনি দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নও অনেক সময় মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যায় স্বপ্নভঙ্গের ঘোর আঁধারে। শুক্রবারের আগ পর্যন্ত কিছুটা ফুরফুরে মনেই সময় কাটছিল। তাই খাতা-কলম সংগ্রহ করে কিছু লেখালেখি করছিলাম। 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ ও প্রক্রিয়া' শিরোনামে একটা লেখার বেশ কিছু অংশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার দিন সকাল থেকে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরপরও আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে জুমার নামাযে ইমামতি করার জন্য সবাই আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে আমিও সেদিকে ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম। জুমার আগে বয়ানের ব্যাপার ছিল।

বিএনপি খুলনা মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম বেশ শান্ত, ভদ্র ও সজ্জন একজন মানুষ। তিনি, গোলাম পরোয়ার সাহেবসহ নেতৃবৃন্দ সামনের কাতারে বসা। মিম্বারে বসে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আলোচনা করলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সর্বাবস্থায়ই আমরা আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছি, সে নেয়ামতের অনুভব অন্তরে রাখা এবং তার শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি আর সন্তুষ্ট থাকা আমাদের কর্তব্য। জুমার এই আলোচনায় অন্যদের যাই হোক আমার মনে কিছুটা এতমিনান আস্‌ল।

১৮ মে শনিবার। ঢাকা থেকে আম্মাসহ পরিবারের বড়সড় একটি দল সাক্ষাত করতে আসল। আম্মা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন ঠিকই কিন্তু নিজের মনের মধ্যে বয়ে চলা ঝড় লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। সন্তানের জন্য মায়ের মমতা কেমন নতুন করে আরেকবার অনুভব করলাম। সেই তুলনায় যিমামের আম্মুকে বেশ অনেকটা শান্ত মনে হলো। আমার গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়ার পর তার বাধভাঙ্গা কান্না ও ভেঙ্গে পড়ার খবর অন্যের মাধ্যমে শুনেছি। কিন্তু আমার কষ্ট যেন না বাড়ে তাই বেশ সফলতার সাথেই আমার সাক্ষাতে নিজেকে সে সংবরণ করতে সক্ষম হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই মনে ধৈর্য দিয়ে দিয়েছেন।

খুলনা কারাগারে শুভানুধ্যায়ী, পরিচিত ও মহব্বতের মানুষদের মাঝে সময় ভালোই কাটতে লাগল। ঢাকার পরিস্থিতি বেশ গরম। তাই পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় আসা এড়ানোর কৌশল নেয়ার চিন্তা করা হলো। আইনজীবীর সাথে কথা বলে তাকে সেভাবে ব্যবস্থা নিতে বলা হলো। ঢাকায়

যখন মামলার তারিখ পড়বে তখন যেন খুলনার মামলার তারিখ ফেলে ঢাকায় আসা ঠেকানো যায়। দুটি কারণে মূলত এই কৌশল গ্রহণের চিন্তা করা হয়েছে। প্রথমত ও প্রধানত রিমান্ডের নির্যাতন এড়ানো এবং সেই সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কষ্টকর দূরাবস্থা থেকে বাঁচা। কিন্তু এ কৌশলের কারণে মামলার জামিনের কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছিল। তবুও সার্বিক বিবেচনায় কিছু দিনের জন্য অন্তত এ কৌশলই শ্রেয় বিবেচিত হয়।

ইতিমধ্যে আমি বুঝে ফেলেছি আমাকে বেশ কিছুদিন জেল খাটতে হবে। খুব স্বল্প সময়ে আমার মুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাই জেলখানার এই সময়কে সামনে রেখে দুটি পরিকল্পনার কথা মাথায় আসল। একটি হলো এই সময়টাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়। দ্বিতীয় হলো আবদ্ধ ও সীমিত পরিসরে শুয়ে বসে যেহেতু সময় কাটানো লাগবে তাই শারীরিক ফিটনেসের সমস্যার আশঙ্কা বোধ হলো। ইতিপূর্বে জীবনে শুধু একবার দশ দিনের ইতিকাফে আবদ্ধ সময় পার করার অভিজ্ঞতা আমার ছিলো। আমি যে বছর দাওরা ফারেগ হই সেই বছর রমযানের শেষ দশকে আব্বাজান (রহ.) আমাকে তেজগাঁও নুরানী মাদরাসা সংলগ্ন রেল স্টেশন মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা করেছিলেন। মরহুম হযরত হাবিবুল্লাহ মেছবাহ (রহ.)-এর সোহবতে নুরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী মরহুম হাজী আবদুল মালেক (রহ.)-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তখন ইতিকাফ করেছিলাম। সেই দশ দিনের আবদ্ধ সময়ে শারীরিক কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো। পায়েশ জাতীয় কোন গরম খাবারের প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো এটা হয়েছিলো। কারাগারেও আমার এমন হওয়ার আশঙ্কা বোধ করলাম।

তাছাড়া অবসর সময়ের সুযোগ। সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম শরীর চর্চা করব। শরীর চর্চার জন্য উপযুক্ত পোশাকের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে সাক্ষাতের জন্য ভাগিনাদের একটা দল– এহসান, মাসনুন, সফিউল্লাহ ও আখতার জেল গেটে অফিস সাক্ষাত করল। বরাবরের মতো শহীদ ভাই তো সাথে আছেনই। শহীদ ভাইকে বললাম, ওদেরকে সাথে নিয়ে কেড্স, ট্রাউজার আর গেঞ্জি কিনে দিতে। আমার ধারণা ছিলো, অল্প কিছুদিন চলে মতো দেখে কিনবে। কিন্তু মাশাআল্লাহ আমাদের সফিউল্লাহ মিয়ার চয়েজ আবার অনেক হাই! সে তার পছন্দ মতো পুরোদস্তুর জিম করার উপযুক্ত বেশ দামী কেড্স, ট্রাউজার ও মডার্ণ একখানা গেঞ্জি কিনে দিলো। গেঞ্জিটা আর পরার সাহস হলো না। কেড্স আর ট্রাউজারের উপর পাঞ্জাবী পরে ব্যায়ম করার চিন্তা করলাম। ইতিমধ্যে এরশাদ সিকদারের মামলার রাজসাক্ষী নুরে আলমের সাথে ভালো একটা সখ্যতা হয়ে গিয়েছিলো।

নুরে আলম ভালো দ্বীনদার। আহলে হাদীসদের মতানুসারে দ্বীনদারীর উপর চলে। বেশ শক্ত-পোক্ত গড়নের মানুষ। পড়ন্ত বয়সেও তার শারীরিক সক্ষমতা ঈর্ষণীয়। দুই-চার দশজন সাধারণ মানুষ তার সামনে এখনও কোন ব্যাপার না। সে প্রতিদিন সকাল বেলা ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করে। আমিও মূলত তার সাথে যুক্ত হয়ে ব্যায়াম করার জন্যই ঘটা করে এত আয়োজন করলাম। কিন্তু বিধি বাম! বেশ কিছুদিন খুলনা জেলে থাকার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সব রকম আওয়াজনও করলাম। এর মধ্যেই ২৭ মে কোর্টে হাজিরা দিয়ে কারাগারে ফিরতেই জেল অফিস থেকে আমাকে জানানো হলো আজই বিকালে আমার ঢাকা চালান। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো ব্যাপার! কারা কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকে আমাকে কিছুই অবগত করেনি। তলে তলে সব ঠিক করে চূড়ান্ত মুহূর্তে জানিয়েছে। খুলনা কারাগারে পনের দিন থাকার পর কেমন যেন একটা সখ্যতা হয়ে গিয়েছে।

গোলাম কিবরিয়া সাহেব, মুফতী ইবরাহীমসহ বেশ কয়েকজন আপন মানুষ ছিলো যাদের সাথে সম্পর্কের সময় খুব দীর্ঘ নয় কিন্তু তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা হৃদয়ে গভীর দাগ কেটে ফেলেছে। নাজমুলসহ ছোট ছোট দুই-তিনজন তালিবুল ইলম আর কয়েকজন বিডিআর ভাই। সেই সাথে একজন রাজু। যারা সব সময় আমার সব রকম খেদমত করেছে।

রাজু তিন বছর যাবৎ জেলখানায়। অপরিণত বয়সে মাকে না জানিয়েই বিয়ে করেছিলো। বাংলা লিংকের নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান হিসাবে চাকরি করত। তরুণ বয়সে টাকার মচমচানী আর কিছুটা খামখেয়ালীপনা তাকে বৃত্তচ্যুত করে দিয়েছিলো। শ্বশুর বাড়ির সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে নারী নির্যাতন মামলায় আটক হয়ে আজ তার সীমাহীন দূরাবস্থা। খোঁজ-খবর নেয়ার মতো একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া আর তেমন কেউ নেই। জামিনে মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলে অনেক আইনজীবি অজস্র টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বৃদ্ধা মায়ের সরলতাকে পুঁজি করে অনেকে ধান্ধাবাজী করেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। জেলজীবনে রাজুর মধ্যে বেশ পরিবর্তন এসেছে। মাথায় টুপি আর মুখে দাড়িসহ দ্বীনদারীর অন্যান্য অনুষঙ্গ মেনে চলার চেষ্টা করে। আর জেলখানায় আগত আলেম-ওলামাদের অসাধারণ খেদমত করে। গোলাম কিবরিয়া সাহেব কারাগারে আসার পর থেকে ওনার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

জেলখানায় খোঁজ নিলে রাজু আর তার বৃদ্ধা মায়ের মতো
এমন নিদারুণ করুণ বঞ্চনার শিকার হাজারো মানুষের সন্ধান

পাওয়া যাবে। প্রচলিত মানব রচিত জাহেলী বিচারব্যবস্থার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে মানবতার ফরিয়াদ যেখানে সমাজের বিবেক পর্যন্ত পৌছার কোনো ব্যবস্থা নেই। বিচারের বাণী এখানে চার দেয়ালের মাঝেই নিভৃতে কেঁদে মরে। সরকারীভাবে বড় বড় পোষ্টার আছে। জমকালো নিয়ন সাইনের বিলবোর্ড আর সাইনবোর্ড আছে। 'গরীব-দুঃখীর মামলার ব্যয় বাংলাদেশ সরকার দেয়' –এই জাতীয় বাহারী শ্লোগানগুলোকে প্রকৃত অসহায়দের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্মম কৌতুক আর তামাশা ছাড়া ভিন্ন কিছু চিন্তা করার সুযোগ নেই।

পুনশ্চ! রাজুর মুক্তির জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি। কিছু কাজ অগ্রসর হয়েছে। বাকিটাও ইনশাআল্লাহ শিঘ্রই হয়ে যাবে।

আমার চালানের কথা শুনে সবার মন খারাপ। আমারও মন খারাপ। এই মুহূর্তে অন্যসব চিন্তাকে ছাপিয়ে বিদায়ের একটা কষ্টকর অনুভূতি মনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করছিল। মায়াময় এই পৃথিবীতে বিদায় আসলেই একটি করুণ অনুভূতির নাম। ক্ষুদ্র পনের দিনের এই জেল জীবনের বিদায়ও তা থেকে বাদ পড়ল না। মুফতী ইবরাহীম আর রাজু পরিচিত ও মহব্বতের সকলকে গোলাম কিবরিয়া সাহেবের ওয়ার্ডে জমায়েত হওয়ার জন্য সংবাদ দিলো। বেলা তিনটার দিকে দশ-বারোজনের ছোট্ট কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ একটি বিদায়ী মজমা হলো। সেখানে বিদায়ী কিছু কথা আর জেল জীবনের দুঃখ লাঘবে কিছু সান্ত্বনার বাণী আলোচনা করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওদিকে শহীদ ভাইয়েরা একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে রাখলো। ২৭ মে সোমবার বিকাল ৫টার পর তিনজন পুলিশের স্কোয়াডসহ খুলনা জেলকে বিদায় জানিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

চালানের ইতিবৃত্ত

বিচিত্র ও আজগুবী নানা পরিভাষার জগত হলো এই জেল জগত। জেল জগতে এক জেল থেকে আরেক জেলে স্থানান্তর ও কোর্ট থেকে জেল হাজতে প্রেরণকে চালান বলে। এছাড়া থানা থেকে কোর্টে প্রেরণকে কোর্ট চালান বলে। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জেল জীবনে খুলনা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কাশিমপুর, কাশিমপুর থেকে খুলনা আবার খুলনা থেকে কাশিমপুর সব মিলিয়ে সর্বমোট ৮ বার চালান হয়েছি। ঢাকা থেকে কাশিমপুরের চালান একটা নিয়মিত সহজ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। বর্তমানে সাধারণত জামাত-শিবির ও হেফাজতসহ ইসলামী মহলের বন্দী ও অন্যান্য সাধারণ বন্দীদেরকে কাশিমপুরে চালান করা হয়। সাধারণত সপ্তাহে দুইবার শুক্র ও শনিবার ঢাকা থেকে কাশিমপুরের চালান হয়। ঢাকা কারাগার যেমন কেন্দ্রীয় কারাগার কাশিমপুর কারাগারও কেন্দ্রীয় কারাগার। তাই ব্যাপার অনেকটাই এমন যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অতিরিক্ত আসামীদেরকে কাশিমপুরে চালান করা হয়। কাশিমপুর কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যান এসে আসামীদেরকে নিয়ে যায়। ঢাকা থেকে কাশিমপুরের চালান তো প্রিজন ভ্যানে হয়। কিন্তু দূর-দূরান্তের জেলগুলোতে চালান হয় ভিন্নভাবে।

খুলনা থেকে যখন আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চালান করা হলো, তার প্রক্রিয়া অনেকটা এমন ছিলো যে, ২৮ মে আমার ঢাকার কোর্টে হাজিরা। সুতরাং অন্তত আগের দিন আমাকে ঢাকা পাঠাতে হবে। সেই হিসাবে ২৭ মে আমাকে পাঠানোর কথা। কিন্তু ২৭ মে আমার খুলনার কোর্ট তারিখ। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আমার ঢাকা চালান বাতিল হওয়ারই কথা। যেটা আমাদের প্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু রহস্যজনকভাবে অদৃশ্যের কোন ইশারায় ২৭ তারিখের দুপুর নাগাদ খুলনার কোর্ট শেষে বিকালেই ঢাকার উদ্দেশ্যে চালান করার ব্যবস্থা করল খুলনা জেল। সারা রাত ভ্রমণ শেষে সকাল বেলা কোর্টে গিয়ে সারাদিন কোর্ট করা একটি অমানবিক ব্যাপার।

চালান থাকলে একদিন আগেই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুলিশ লাইনে স্কোয়াড চেয়ে পত্র পাঠানো হয়। সেই আলোকে সাধারণত একজন বন্দীর জন্য তিন-চারজনের একটি স্কোয়াড দল বরাদ্দ দেয় পুলিশ লাইন। আমার জন্য চারজনের পুলিশের স্কোয়াড আসল।

পুলিশ ও বন্দী জনপ্রতি ৫২০ টাকা রাহ খরচ ও ১৬ টাকা খাবার খরচ পুলিশের হাতে দেয়া হয়। ৫২০ টাকায় পুলিশকে খুলনা থেকে ঢাকা আপ-ডাউন করতে হবে। চেয়ার কোচের ভাড়া যেখানে ৫৫০ টাকা করে। আপ-ডাউনে জনপ্রতি শুধু ভাড়াই লাগবে ১১০০ টাকা। আর ১৬ টাকায় একবেলা খাবারের কী হয়! কিন্তু যুক্তি ও বাস্তবতা এক দিকে আর আমাদের দেশের সরকারী আইন চলে আরেক দিকে।

ডান্ডাবেড়ি লাগানো থাকায় সাধারণ পরিবহনে সফর করা কঠিন। তাই নিজস্ব খরচে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হলো। যার সম্পূর্ণ খরচ আমরাই বহন করলাম। খুলনা থেকে মাওয়া ঘাট হয়ে ঢাকা আসার পথে গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া মোড়ে বেশ কিছু হোটেল গড়ে উঠেছে। এ পথে খাওয়া-দাওয়ার জন্য এ জায়গাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত। খুব বেশি জৌলুস না থাকলেও খাবার ও রান্নার মান ভালোই। তাই খুলনা থেকে যাত্রা করেই পরিকল্পনা করেছিলাম যে রাতের খাবার ভাটিয়াপাড়ায় খাব। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলাম এবং খাবারের খরচও দিলাম আমি। জেলগেট থেকে দেয়া ভাড়া ও খাবারের টাকা বেঁচে গেলো– এটাই পুলিশের লাভ। সেই সাথে বিদায়ের সময় কিছু বখশিশও দিলাম সৌজন্যতার খাতিরে। পুলিশ নিয়ে মাইক্রোবাসে আসাতে রাস্তায় অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয়নি। রাতের বেলার মাওয়া ফেরিঘাটের বিখ্যাত ও অস্বস্তিকর যানজট থেকেও নিস্তার পেয়ে গেলাম পুলিশের কল্যাণে। তাই রাত দুইটা নাগাদ পৌছে গেলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

এভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আসার মধ্যে একদিকে যেমন পথের অতিরিক্ত বিড়ম্বনা থেকে বাঁচা যায় সেই সাথে পুলিশের কাছ থেকে কিছু সুযোগও পাওয়া যায়। সেই সুযোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু যোগাযোগের কাজ সারলাম সারা পথে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পর্কে একটা ভীতি আগে থেকেই কাজ করছিল মনে। সেই সাথে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে যাওয়ার একটা আত্মবিশ্বাসও আল্লাহর রহমতে মনের মধ্যে ছিলো।

এরপরও আরো দুইবার মামলার হাজিরা দেয়ার জন্য খুলনা যাতায়াত করতে হয়েছে। দু'বারই কাশিমপুর থেকে চালানে গিয়েছি। একবার ফিরেছি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। আর একবার ফিরেছি সোজা কাশিমপুর। শেষবার যখন ১১ জুলাইয়ের হাজিরা দিতে খুলনা গেলাম। তখন যাওয়া আসার পথে আল্লাহর রহমতে ডান্ডাবেড়ির বিড়ম্বনা ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ হয়ে গেছে। তাই

ব্যয়বহুল নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যাওয়ার সময় মুক্তাগাছার সুহৃদ বন্ধু জনাব মাসুদ সাহেব তার নিজস্ব মাইক্রোবাস দিয়ে দিলেন। আর ফেরার সময় খুলনা থেকে নাইট কোচে ফিরলাম। রমযানের ২ তারিখ দিবাগত রাতের সফর ছিলো এটি। পথেই মানিকগঞ্জে সেহরী খেতে হয়েছে। এভাবে ঢাকা/কাশিমপুর–খুলনা মোট পাঁচবার চালান হয়েছে। দুইবার খুলনা থেকে ঢাকা, দুইবার কাশিমপুর থেকে খুলনা আর একবার খুলনা থেকে কাশিমপুর। আর তিনবার চালান হয়েছে ঢাকা থেকে কাশিমপুরে। দুইবার খুলনা থেকে ঢাকা আসার পর আর একবার রিমান্ড থেকে ফেরার পর।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

২৭ মে দিবাগত রাত ২টা নাগাদ আমাদেরকে বহনকারী মাইক্রোবাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে এসে থামলো। বহু দিনের চেনা-জানা জায়গা এই ফটক। অসংখ্যবার যাতায়াত করেছি এই ফটকের সামনের রাস্তা দিয়ে। কখনোবা দাড়িয়ে দাড়িয়ে 'রাখিবো নিরাপদ দেখাবো আলোর পথ' বড় বড় অক্ষরে লেখা বাংলাদেশ জেলের অন্তসারশূন্য স্লোগানটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) তিনবার কারারুদ্ধ হয়েছেন। দুইবারের মুক্তির সময়েই আমি জেল গেটে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। ১৯৯৩ সনে আমরা শত শত ছাত্র বুখারী শরীফ হাতে নিয়ে জড়ো হয়েছিলাম এই ফটকের সম্মুখে। অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিকই সেদিন আমাদের কাঙ্ক্ষিত শাইখুল হাদীস আমাদের মাঝে ফিরে এসেছিলেন। বিজয় হয়েছিলো ছাত্র-জনতার বুখারী শরীফ হাতে জেলগেটে অবস্থান কর্মসূচির। আর একবার ২০০১ সালে। আওয়ামী দুঃশাসনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে 'আল্লাহু আকবার, দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন লাখো তাওহীদী জনতার প্রাণপ্রিয় রাহবার শাইখুল হাদীস। আর আমরা মুহুর্মুহু স্লোগানে কাঁপিয়ে তুলেছিলাম ঢাকার আকাশ। ক্ষণিকের তরে স্মৃতির মোহনায় ভিড় জমালো অতীত জীবনের এমন বহু টুকরো টুকরো ইতিহাস।

জন্মস্থান লালবাগেরই অন্তর্ভুক্ত এই কারাগারের চারপাশ দিয়ে অসংখ্যবার বিচরণ করেছি। কোন দিন ভিতরের দৃশ্য দেখা হয়নি। কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পর্কে জনশ্রুত ভয় আর বিখ্যাত এই স্থাপনাটি চোখে দেখার কৌতুহল যুগপৎ দুটি অনুভূতি নিয়ে ধীর কদমে পা রাখলাম ফটকের ভিতরে। একজন কারারক্ষী দেহ তল্লাশী করল। পাঞ্জাবীর পকেটে সযত্নে রক্ষিত খুলনা কারাগারে থাকতে লেখা দুপৃষ্ঠার কারা জীবনের অনুভূতি আর প্রিয় এক বন্ধুর দেয়া তিনটি চিরকুট চিঠি নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো। বন্ধুর লেখা সেই ছোট্ট ছোট্ট চিঠিগুলো ছিলো আমার কাছে মূল্যবান রত্নতুল্য। ব্যাগের ভিতর তল্লাশী করে জেলকোড অনুযায়ী বানানো ৭০০ গ্রাম তুলার ছোট্ট একটি বালিশ। যেটা খুলনার জেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে শহীদ ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন সেটা পেলো। পাঁজি কারা রক্ষী সেই বালিশটাও ছুড়ে ফেলে দিলো। এভাবে আরো কিছু অফিসিয়াল কাজ শেষ করে ঢুকলাম মূল কারাগারের ভিতরে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হালচিত্র

ঘিঞ্জি পুরাতন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র জুড়ে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ আমলের কারাগার এটি। কিন্তু সরু ও চিপাচিপা গলিপথের সংযোগে গড়া পুরাতন ঢাকার পরিচিত দৃশ্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম কারাগারের অভ্যন্তরের দৃশ্য। বেশ খোলামেলা পরিবেশ। যথেষ্ট দূরত্বে দূরত্বে নির্মিত ভবনগুলোর মাঝখানে উন্মুক্ত পরিসর। ব্রিটিশ স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে দাড়িয়ে আছে বড় বড় ভবন। ফাঁকে ফাঁকে কালের সাক্ষী হয়ে আছে সুপ্রাচীন বৃক্ষরাজী। আমাদের চারপাশে নিয়মিত দেখা পুরাতন ঢাকার মধ্যখানে কারাগারের এই খোলামেলা ও সুবিশাল পরিসর বাইরে থেকে কোনদিন কল্পনা করিনি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই হাতের ডান দিকে পথের পাশে সাম্প্রতিক সময়ে বানানো ছোট্ট কিন্তু দৃষ্টিনন্দন কৃত্রিম ঝর্ণা তৈরি করা। মাঝখানে ঐতিহাসিক তাজমহলের একটি ছোট্ট প্রতিকৃতি ঝর্ণার মূল শোভা হয়ে আছে। ডানে বামে উভয় দিকেই বেশ পুরনো আমলের টিনশেড ঘর। টিনশেডগুলোর সামনে বেশ চওড়া খালি স্পেস। সেখানে বড় বড় গাছ। কংক্রিটের এই শহরে প্রাকৃতিক একটা আবহ তৈরি করে রেখেছে গাছগুলো। টিনশেডগুলোর আগেই প্রধান ফটক সংলগ্ন হাতের বামে ছিলো এরশাদ সেল। রাষ্ট্রপতি এরশাদ কারাগারে থাকাকালীন ডিভিশন আসামীর জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। এরশাদ সাহেব এখানেই ছিলেন। তাই সেটা এরশাদ সেল নামে পরিচিতি পায়। ২০০১ সালে হযরত শাইখুল হাধীস (রহ.) ডিভিশন পাওয়ার পর এই সেলেই ছিলেন। অতি সাম্প্রতিক এই সেল ভবন ভেঙ্গে সেখানে বড় পরিসরের সাক্ষাত রুম তৈরি করা হয়েছে।

প্রধান ফটক থেকে সোজা পথে হাটতে হাতের বামে ফাঁসির সেল পড়বে। যেখানে এখন সাঈদী সাহেব আছেন। এরপর বেশ কিছু টিনশেড; যেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। এটাকে বলা হয় এম. ডি (ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট)। সেলাই, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক ও হস্তশিল্পসহ নানা রকম প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আগ্রহী কয়েদীদেরকে। হাতের সোজা পথে ভিন্ন বাউন্ডারীর এলাকা আছে। মেন্টাল এলাকা নামে পরিচিত এই বাউন্ডারীর মধ্যেই আছে নাইনটি সেল, কয়েদীদের দালানসহ আরো কিছু আবাসিক ব্যবস্থা। সেই সাথে আছে প্রশস্ত পরিসরের একটি মসজিদ। এই মসজিদে জোহর-আসরের নামায জামাতের সাথে আদায় হয়। জুমার নামাযও হয়। শেষবার আমি যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গেলাম ৫ জুলাই শুক্রবার দিন এখানে আমি জুমার নামাযের ইমামতি করেছি। মেন্টাল এরিয়ার লাগোয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আছে বিদেশী

বন্দীদের ওয়ার্ড। যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থায় বিদেশী বন্দীদেরকে রাখা হয়। মেন্টাল এরিয়ার উত্তর দিকে আছে কতগুলো সেল নিয়ে একটি ভিন্ন বাউন্ডারী। এই বাউন্ডারীর মধ্যেই আছে বঙ্গবন্ধু কারা যাদুঘর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে বন্দী থেকেছেন সেই জায়গাটাকে এখন যাদুঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে। এই বাউন্ডারীর উত্তর দিকে হাসপাতাল এলাকা। হাসপাতাল বরাবর পূর্ব দিকে বিশাল ভবন 'মেঘনা'। মেঘনার পূর্ব-উত্তর কোণে ভিন্ন আরেকটি এরিয়া। যেখানে আছে পদ্মা ও মনিহার নামক দুটি বড় বড় ভবন। মনিহারের দক্ষিণেই হলো সুরমা ভবন। সুরমা ভবনে কিশোর বন্দীরা থাকে। সুরমা ভবনের পাশেই আছে চৌকা। যেখানে কেন্দ্রীয় রান্নার কাজ হয়। প্রধান ফটক থেকে হাতের ডানে উত্তর দিকে ভিন্ন বাউন্ডারীর এলাকা যেখানে মহিলা বন্দীদের ব্যবস্থা। তার পাশেই চাইল্ড কেয়ার। আর কারাগারের মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় স্থাপনা হিসাবে আছে অতি বিশালাকায় সুপ্রাচীন টিনশেড যমুনা। প্রতিটি দালান বা টিনশেড ভবনেই ভিন্ন ভিন্ন পার্টিশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আলাদা আলাদা ওয়ার্ড। ব্যতিক্রম হলো সেল। ছোট ছোট কামরা থাকে সেলগুলো।

> *ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত এই কারাগার সেই প্রাচীন আমলে বেশ উন্নত ব্যবস্থা ছিলো এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আবাসনের অপরিহার্য আধুনিক অনুষঙ্গ ও প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটিজ সংযুক্ত না হওয়ায় এখানে বর্তমানে বর্ণনাতীত দূরাবস্থা বিদ্যমান। তার উপর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বন্দী ও কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে রাখার কারণে এই স্থাপনাকে মানবিকতার বিপর্যয়গার নামকরণ করাটাই হবে অধিকতর উপযুক্ত।*

পদে পদে অন্যায় ও দুর্বিষহ জীবনব্যবস্থা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ লিখে ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। সামান্য ধারণা দেয়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই এই ধারণা দেয়া।

কারাগারে আগতরা দুই প্রকার। কয়েদী ও হাজতী। আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্তরা হলো কয়েদী। আর যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মামলা বিচারাধীন আছে, এখনো তারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি তারা হলো হাজতী। বন্দীদের মধ্যে কয়েদীর তুলনায় হাজতীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি। মূলত যারা

দোষী সাব্যস্ত নয়, বরং নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার অনুপাতই অনেক বেশি হওয়ায় আপাত দৃষ্টিতে হাজতীদেরকে নির্দোষ বলেই ধরে নেয়া যায়। এই নির্দোষ হাজতীরা প্রধানত অন্যায়ের শিকার হয়।

যমুনা– ২নং ওয়ার্ডটি আমদানী নামে পরিচিত। নতুন আগত বন্দীদেরকে প্রথমে এখানে রাখা হয়। এই ওয়ার্ডের মাঝখানে আবার একটি দেয়াল দিয়ে একে দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। নতুন আগত বন্দীদেরকে প্রথম দিন রাত্রি যাপনের জন্য দক্ষিণ পাশের অংশে জড়ো করে নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করা হয়। এখানে অবস্থানের নানা দিক-নির্দেশনা শোনানো হয়। অতঃপর আঠারো বিশ ফুট প্রশস্ত রুমটির মধ্যে তিনটি সারিতে তাদেরকে শোয়ানো হয়। পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে চার-পাঁচজনের একটি চক্র। এই চক্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অশ্রাব্য ও অশালীন মুখের ভাষা আর নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার। অশ্রাব্য গালিগালাজ আর দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে বন্দীদের মধ্যে সূচনাতেই ত্রাসের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এরপর শুরু হয় বাস্তব নির্যাতন। ওয়ার্ডের অপর পাশে খালি জায়গা থাকলেও নতুনদেরকে নির্ধারিত অংশেই থাকতে বাধ্য করা হয়। মানুষের তুলনায় স্থান খুবই অপ্রতুল। বন্দীরা চিৎ হয়ে শোয়ার মতো জায়গা পায় না। একজনের বুকের সাথে আরেকজনের পিঠ চেপটে থাকে। মধ্যখানে সামান্য তিল ধারণের জায়গা থাকে না। এটাকে জেলখানার পরিভাষায় বলে 'ইলিশ ফাইল'। ইলিশ ফাইলের চেয়েও আরো সঙ্কুচিত ব্যবস্থার নাম 'কেচকি ফাইল'। একজনের মাথার দিকে অপরজনের পা– এই পদ্ধতিতে একজনের গায়ের সাথে আরেকজনকে লেপটে দিয়ে মানুষকে শোয়ানো হয়। এরপর করা হয় ভয়ঙ্কর এক অমানবিক কাজ। ইলিশ কিংবা কেচকি ফাইলে শোয়ানো মানুষগুলোকে দুই প্রান্ত থেকে দুই পাষণ্ড দুই পা জড়ো করে চাপতে থাকে। প্রচণ্ড চাপের তোড়ে কখনো কখনো কোন কোন দুর্বল মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়। আবার অনেকের শরীর দুই পাশের চাপে উপরে উঠে যায়। তখন মধ্যখানে পা ঢুকিয়ে দিয়ে আবার সজোরে চাপ দিয়ে একটু ফাঁক করে ঐ ফাঁকের মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ধারণা হতে পারে এই বর্বর, অমানবিক আচরণ করা হয় স্থান সঙ্কুলানের অভাবে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যেই ওয়ার্ডে নবাগত বন্দীগণ এমন অমানবিক পাষণ্ডতার শিকার, সেই ওয়ার্ডেই তিন হাত চার হাত প্রশস্ত বেড বিছিয়ে রাজার হালে দিব্যি আরাম করছে কিছু মানুষ। তাহলে প্রশ্ন হলো, মানুষকে এই অমানুষিক কষ্ট দেয়ার রহস্য কী? এই রহস্যটাই বেরিয়ে আসবে ঐ পাষণ্ড চক্রের নির্দেশনামূলক (?) বক্তব্য শুনলে। সেই বক্তব্যে বন্দীদের সম্মুখে

টাকার বিনিময়ে নানা সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির লোভনীয় প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। কোন প্রস্তাবে থাকবে আড়াই হাজার, তিন হাজার টাকা সাপ্তাহিক প্রদানের মাধ্যমে একটু ভালো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। কোন প্রস্তাবে থাকবে মাসিক দশ হাজার টাকার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। পনের হাজার টাকা মাসিক খরচ করে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ হয়েও রোগীর জন্য বরাদ্দ হাসপাতালের একটি সিট মাসের পর মাস দখল করে রাখতে পারবেন। একই সময়ে একজন অসহায় মারাত্মক অসুস্থ মানুষ সিটের অভাবে পড়ে থাকবে হাসপাতালের বারান্দার ফ্লোরে।

থাকা, খাওয়া ও পানির ব্যবস্থার মান ভেদে টাকার অঙ্ক কম-বেশি হয়। 'বাসর রাতেই বিড়াল মারার' কৌশল অবলম্বন করে ধান্ধাবাজ ঐ পাষণ্ড চক্র নবাগতদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে প্রয়াস চালায়। তাদের এই কৌশল বেশ ফলপ্রসূও হয়। নতুন বন্দীরা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের খপ্পরে পড়ে যায় এবং তাদের সাথে টাকা-পয়সার চুক্তি করতে বাধ্য হয়। আর যারা চুক্তি করবে না তাদেরকে এমনই কষ্টকর ও স্থান সঙ্কুলানের অভাব হয় এমন কোন ওয়ার্ডে সিট বণ্টন করে দিবে। এই হলো ইলিশ আর কেচকি ফাইলের মাজেযা!

কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধান্ধাবাজীর মাধ্যমে টু-পাইস কামানোর লক্ষ্যে এমন কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করার একটি দুষ্ট প্রক্রিয়া জেঁকে বসে আছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাধারণত সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার বন্দী থাকে। এর মধ্যে আমার ধারণা– পাঁচ সহস্রাধিকই হলো হাজতী বন্দী। সাধারণভাবে এই পাঁচ সহস্রাধিক বন্দীর পান করা, গোসল করা ও প্রয়োজন সারার জন্য পানির ব্যবস্থা বলতে যা আছে তাহলো, সাকুল্যে ৭/৮টি হাউজ ও প্রতি হাউজের একটি করে পানির লাইন। ৬ ফুট প্রশস্ত ও ৮ ফুট দীর্ঘ আর ৩ ফুট গভীরতার এই হাউজগুলো রাতের বেলা পানি দিয়ে ভরে থাকে। ভোর বেলা সকাল ছয়টার ফাইলের পর বন্দীদের ওয়ার্ডের লকআপগুলো খুলে দেওয়ার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সবগুলো হাউজের পানি শেষ হয়ে যায়। পানির জন্য এক নির্মম হাস্যকর যুদ্ধ তখন দৃষ্টিগোচর হয়। হাজতীরা যার যার শরীরের শক্তি ও কৌশলের অনুপাতে পানি ব্যবহার বা সংগ্রহ করতে পারে। এই পানিরই কিছু অংশ কয়েদীদের মধ্যে কায়েমী শক্তিধর একটি চক্র বালতিতে মজুদ করে রাখে। হাউজের পানি শেষ হওয়ার পর একমাত্র ভরসা থাকল লাইনের পানি। পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ সাত-আটটি পাইপ থেকে পানি কীভাবে সংগ্রহ করে? সেই লাইনের পানি দুইভাবে বণ্টন হয়। কিছু সিন্ডিকেটের দুষ্ট বন্দী বড় বড় ড্রাম ও

বালতিতে পানি ভরে। আর একই সময়ে অন্যরা দীর্ঘ লাইন দিয়ে পানির বোতল বা ক্যানে করে সামান্য সামান্য পানি সংগ্রহ করে। সেই বোতল-ক্যানের লাইনেও সেই শক্তিশালী কয়েদীরা দশ-পনেরটা ক্যান দিয়ে লাইন বুকড করে রাখে। এভাবে হাজতীদের জন্য বরাদ্দ পানির আশি-পঁচাশি ভাগ পানিই কয়েদীদের সিন্ডিকেট দখল করে নেয়। অতঃপর এক প্যাকেট বেনসন কিংবা দুই প্যাকেট গোল্ডলিফ সিগারেটের বিনিময়ে এক এক বালতি পানি কিনে নিয়ে প্রয়োজন সারতে হয়।

দেড়শ-দুশ মানুষের একটি ওয়ার্ডে একটি মাত্র বাথরুম। কোন কোন বাথরুমে পানির লাইন নেই। আছে ড্রাম। যেগুলোতে পানির লাইন আছে। সেই লাইনে পানি থাকবে হাতেগোনা আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা সময়। ঐ সময়টাতেই ড্রামে পানি ভর্তি করে রাখতে হয়। এভাবে সারা জেলখানায় সব সময়ের জন্য কারবালার পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়। এই পরিবেশের জন্য একদিকে যেমন অপর্যাপ্ততা একটি কারণ। তার চেয়েও বড় কারণ হলো সূক্ষ্ম কারসাজি। কারণ যত সঙ্কট তৈরি হবে তত চাহিদা বাড়বে। চাহিদা যত বাড়বে ধান্ধাবাজী তত বেশি করা যাবে।

কয়েদী বন্দী যারা থাকে তাদের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা থাকায় বিভিন্ন কাজ দেয়া হয়। এমনই একটি কাজ হলো মেট পাহারা, এক একটি ওয়ার্ডে একজন করে প্রধান ইনচার্জ থাকে। তাকে বলা হয় মেট। তার আরো সহকারী থাকে। এভাবে কয়েদীদের মধ্যে নানা রকম কাজ বণ্টন করা হয়। আর এদের সকলের প্রধান সমন্বয়ক থাকে একজন। তাকে বলা হয় চিফ রাইটার। মূলত এই চিফ রাইটারের নেতৃত্বেই একটি চেইন সিন্ডিকেট তৈরি হয়। আর এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমেই চলে বন্দীদের উপর অন্যায় বাণিজ্য। চিফ রাইটারই নতুন আগত বন্দীদেরকে আমদানি থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বা অন্য জায়গায় সিট বরাদ্দ দেয়। আর ওয়ার্ডের যে মেট আছে সে ওয়ার্ডের কোন জায়গায় থাকবে তা নির্ধারণ করে দেয়। এ কাজগুলো প্রশাসনের দায়িত্ব। জেলার নিজেই এগুলো করার কথা। কিন্তু ঢাকা কারাগারে এগুলো করে এই রাইটার।

> *ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বর্তমান চিফ রাইটার হত্যা মামলার একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কাছে তার বাড়ি। সরকার দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকায় সরকারের উপর পর্যায়ে তার হাত রয়েছে। ব্যাপক জনশ্রুতি আছে– প্রতি মাসে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা তার ইনকাম।*

মাসিক হারে বড় অঙ্কের সালামী দিয়ে প্রশাসন থেকে সে এই 'চিফ রাইটার' পদ দখলে নিয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলে প্রশাসনের অন্যান্য লাভজনক ও লোভনীয় পদের মতো এই চিফ রাইটারের পদেও পরিবর্তন আসে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দুর্নীতি ও অন্যায়ের অবস্থা এতই ভয়াবহ যে, কোন কাজই ঘুষ ছাড়া হয় না। পান থেকে চুন খশতেও ঘুষ লাগবে। নগদ টাকা দিতে হবে বা সহজে বহনযোগ্য হিসাবে সিগারেট দিতে হবে। 'আলোর পথ দেখানোর তকমাধারী এই কারাগারের আলো-আঁধারের অনুপাত একটি তথ্য থেকেই পরিসংখ্যান করা সম্ভব। সেটি হলো– কারাগারের অভ্যন্তরে পরস্পর আদান-প্রদান ও বিনিময়ের জন্য প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার নাম 'সিগারেট'। গোসলের পানি পেতে সিগারেট। কোন বৈধ অধিকার বা অবৈধ সুযোগ নিতে হলেও সিগারেট। সাক্ষাত রুমে একটু ভালো জায়গা বা একটু বেশি সময় পেতে চাইলে সিগারেট। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিভিন্ন কাজ ও সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েদীদের কাছ থেকে ভালো সেবা পেতে হলে সিগারেট। কোন অন্যায় কাজ করে ধরা পড়ে গেলে কিংবা কোন অবৈধ বস্তু সংরক্ষণে রেখে ফাঁস হয়ে গেলে মিয়া সাহেবকে (কারারক্ষী) ম্যানেজ করার জন্য সিগারেট। সিগারেটের এই সহজ লভ্যতার কারণে ব্যাপক ধুমপান ও পর্যায়ক্রমে মাদকের ছড়াছড়ি চলে। নিয়মিত ও ছোটখাটো কাজের জন্য চলে সিগারেট। আর বড় ধরনের লেনদেন হয় নগদ টাকায়। নগদ টাকা বহন যেহেতু জেলকোড অনুযায়ী অবৈধ তাই এই লেনদেন দুইভাবে হয়। কারাগারের বাইরে কারো মাধ্যমে অথবা ভিতরেই গোপন পথে নগদ টাকা সংগ্রহ করার মাধ্যমে। প্রতি পাঁচশত টাকায় একশত হারে ঘুষের বিনিময়ে ভিতরেই নিরাপদে নগদ টাকা পৌছানোর ব্যবস্থা আছে।

এভাবে বৈধ-অবৈধ সব কাজেই ঘুষ দিতে হয়। বাইরে থেকে পাঠানো খাবার ও ব্যবহার্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে টেবিলে গেলে সেখানে খাবারের প্যাকেট থেকে কিছু অংশ বা এক প্যাকেট সিগারেটের দাবি আসতে পারে। মামলার জামিন এসেছে, জামিন টেবিলে গেলে কেইস সিলিপ থেকে মামলা কেটে দেওয়ার জন্যও এক দুইশ টাকা কিংবা এক দুই প্যাকেট সিগারেট ডিমান্ড করা হবে। সব ভাব দেখে মনে হয়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়ালের প্রতিটি ইটও যেন হা করে থাকে ঘুষ খাওয়ার জন্য।

সারকথা আপাদমস্তক অন্যায়, অব্যবস্থাপনা, ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। আলোর পথ দেখানোর অঙ্গীকার থাকলেও বাস্তবে আছে গাজা,

হিরোইন ও ইয়াবাসহ মাদকের অন্ধকার রাজ্যে হারানোর পথ। মানবতা এখানে ডুকরে কাঁদে প্রতি পদে পদে। চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবিকতা পদপিষ্ঠ হওয়ার মহোৎসব।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমার দিনকাল

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও তিন দফায় মোট সাত দিন থেকেছি। প্রথম বার খুলনা জেলে পনেরো দিন থাকার পর চালানে ঢাকা আসলাম মে মাসের ২৭ তারিখ রাত দুইটার দিকে। এভাবে ২৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চারদিন থাকা হলো। দ্বিতীয় দফায় ১৭ ও ১৮ জুন মিরপুর থানার রিমান্ড খেটে ১৯ জুন কোর্টে সোপর্দ হয়ে আসলাম ঢাকা কারাগারে। এবার থাকলাম ২০, ২১ জুন দুইদিন। আর সর্বশেষ খুলনা জেলে দ্বিতীয় দফায় চারদিন থেকে খুলনা জেল কর্তৃপক্ষের ভুলে চালানে কাশিমপুরের পরিবর্তে ঢাকা আসলাম। এটা ৪ জুলাই বৃহস্পতিবারের কথা। এবার একদিন থেকেই পর দিন শুক্রবার বিকালে চলে গেলাম কাশিমপুর।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যে ভয়াবহ চিত্রের বিবরণ আমার বর্ণনাতেই এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে ততটা বিপদে পড়তে হয়নি। কারণ আমি যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম আসি ততদিনে আমার পনেরো দিনের ছোটখাটো জেল জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার পরিচয় পেয়ে অনেকে সহযোগিতা করেছে। পুরাতন এই সকল ভাইদের সহযোগিতায় প্রাথমিক ধকলটা মোটামুটি সামাল দেওয়া গেছে। আর আমার আগমন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এমন একটা সময়ে হয়েছে যখন প্রতারক চক্র ঘুমে বিভোর এবং তাদের স্বাভাবিক ধান্ধাবাজী ঐ দিনের মতো শেষ হয়ে গেছে।

গভীর রাতে জমাদার আমাকে নিয়ে এসে আমদানি ওয়ার্ডের সহকারী মেট পাহারাদারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলো। রাত তখন প্রায় তিনটার কাছাকাছি সময়। সহকারী মেট পাহারাদারের চোখে ঘুমের ছাপ। তাই সে আমাকে নিয়ে আর কোন ঝামেলায় না গিয়ে আমদানির যে অংশে কয়েদীরা থাকে সেখানকার একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বলল, আপাতত এখানেই ঘুমিয়ে থাকেন। আমি আর ঘুমাবো কি? ঘড়িতে দেখলাম তাহাজ্জুদের সময় আছে। আমার পায়ে লাগানো ডান্ডাবেড়ি। ঐ অবস্থাতেই বাথরুমের দিকে গেলাম। দুটি পায়খানা ও একটি পেশাবখানা। পাশে একটি চৌবাচ্চার মধ্যে পানি। চৌবাচ্চা থেকে পানি উঠানোর জন্য রাখা আছে একটি থালা। এস্তেঞ্জা-অযু করে আমাকে দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় গেলাম। ব্যাগ থেকে জায়নামায বের করে একটু দূরে রুমের এক পাশে দেখলাম বেশ খালি জায়গা। .ঐ পাশটাতে শুধু দুই সারিতে

মানুষ ঘুমানো। মাঝের সারিটা খালি। আমি খালি জায়গাটার মাঝ বরাবর জায়নামায বিছিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়া শুরু করলাম। আমার ডান দিকে সর্বশেষ কোনায় হালকা-পাতলা একজন মানুষ ঘুমিয়ে। তার সিটটা চার ফুট প্রশস্ত হবে। তার উপর সিটের উভয় দিকে আরো এক ফুট করে খালি জায়গা। আমি একটু অবাকই হলাম জেলখানায় তার আয়েশী বাবুগিরি দেখে। আমি দু-চার রাকাত নামায পড়তেই আমার বাম দিকের একজন চোখ খুলল। আমি সালাম ফেরাতেই আমাকে ডাক দিয়ে বলল– ঐ দিক থেকে সরে এসে নামায পড়ুন। ঐ লোক ঘুম থেকে উঠে দেখলে গালাগালি করবে। দুই সারিতে মানুষ ঘুমানো। মধ্যখানে ছয় ফুট খালি জায়গা। ছয় ফুটের মাঝ বরাবর দাড়িয়ে আমি নামায পড়ছি। ঐ লোকের পায়ের দিকে প্রায় দুই আড়াই ফুটের কম দূরত্ব হবে না। এরপরও সে গালাগালি করবে! হ্যাঁ করবে। কেন করবে? কীভাবে এটা সম্ভব হবে? হবে। কারণ এটা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। সে একজন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। এক সময় নাকি জল্লাদের কাজ করত। রাজার হালে ঐ সিটে সে ঘুমায়। আর দিনের বেলা তার সিটের আশেপাশে কারো যেতে মানা। সবাই তাকে বেশ সমীহ করে চলে তার অশ্রাব্য ভাষার কারণে।

যাই হোক তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে বিছানায় গিয়ে একটু গড়াগড়ি করলাম। ঘুমালাম না। একটু পরেই ফজরের নামায পড়তে হবে। ডান্ডাবেড়ি নিয়ে বার বার অযু করা ঝামেলা।

ফজরের সময় দেখলাম অল্প কিছু মানুষ নিজেদের সিটে দাড়িয়ে ছোট জামাত করে ফজরের নামায আদায় করছে। খুলনার আমদানি ওয়ার্ডে আমরা যেভাবে ওয়ার্ডের পশ্চিম দিক জুড়ে দুই-তিন কাতারে নামায পড়তাম তার ছিটেফোটা ভাবও এখানে নেই। ছোট্ট এলোমেলো ঐ জামাতে ইমামতি করলেন যিনি, দেখতেই বুঝলাম আলেম হবেন। নামাযের পর খুব তাৎপর্যময় দুআ করলেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তিনি একজন উঁচু মাপের আলেম। নামাযান্তে তার সাথে সালাম-মুসাফাহা হলো। পরিচয় পর্বে জানলাম তিনি হলেন গোপালগঞ্জের প্রসিদ্ধ চন্দ্র দিঘলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব। গোপালগঞ্জে অবস্থান করে তার মাদরাসা থেকে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে ছাত্ররা যোগদান করেছে এটা আওয়ামী লীগের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হয়নি। তাই মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ সেলিম সাহেবের বদান্যতায় মাদরাসার প্রিন্সিপালকে জেলে আসতে হয়েছে। মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের সিটে বসে দু-চার মিনিটে কুশল বিনিময় করতেই ডাক পড়ে গেলো। নবাগত বন্দীদেরকে রুমের বাইরে গিয়ে ফাইলে বসতে হবে। ভালো-মন্দ আলাপচারিতার আর সুযোগ হলো না। হন্তদন্ত হয়ে বাইরে গিয়ে ফাইলে অংশ নিলাম।

নতুন বন্দীদের নাম-ঠিকানা ও পরিচয়সহ সনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য সকল জেলেই অভিন্ন ব্যবস্থা আছে। আগের দিনের আগত সকল বন্দীদেরকে ভোর বেলা একত্রিত করে জেলার সাহেব এ কাজ সম্পন্ন করেন। তাই এটাকে জেলার ফাইল বলে। বন্দী সংখ্যা বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার ফাইলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগে। চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগে ফাইলের কাজ শেষ করতে। সেই সাথে এখানে যারা ফাইল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে তাদের আচার-আচরণ এবং মুখের ভাষা তো মাশাআল্লাহ অতুলনীয়।

আমাকে বেশি একটা বিড়ম্বনা পোহাতে হলো না। কারণ ঐ দিনই আমার কোর্ট হাজিরার তারিখ ছিলো। তাই কোর্ট রাইটার এসে আমাদের তিন-চারজনের কাজ দ্রুতগতিতে করিয়ে আর কিছু কাজ বাদ দিয়ে কোর্টে হাজিরার জন্য নিয়ে গেলো। প্রধান ফটকের সামনে দীর্ঘ দীর্ঘ সারি করে গ্রুপে গ্রুপে বের করে নিয়ে প্রিজন ভ্যানে তুলছে। সকাল সাতটা আটটার মধ্যেই জেলগেট থেকে বন্দীদেরকে নিয়ে কোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রিজন ভ্যানগুলো। আমি সারা রাতে দীর্ঘ ভ্রমণে এমনিতেই কিছুটা ক্লান্ত ছিলাম। সেই সাথে ছিলাম বেশ ক্ষুধার্ত। আগের রাতে খুলনা থেকে ঢাকা আসার পথে ভাটিয়াপাড়া মোড়ে রাত আটটার দিকে খাবার খেয়েছিলাম। সকালে আমদানি ওয়ার্ডে আমাদের জন্য রুটি-গুড় বরাদ্দ ছিলো। এমনিতেই শুকনো খাবার আমি খুব একটা খেতে পারি না। তার উপর আবার মোটা মোটা লাল আটার রুটি এই গুড় দিয়ে খাওয়ার রুচি হলো না, তাই সকালেও অভুক্ত থাকলাম। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি, নির্ঘুম রাত্রি যাপনের কারণে ঘুমের ক্লান্তি, সেই সাথে ক্ষুধার তাড়না সব মিলিয়ে সময়টা একটু কষ্টকরই ছিলো। ওদিকে পায়ে তো ডান্ডাবেড়ি আছেই। এভাবেই আমরা ষাট সত্তর জনের মতো মানুষ একটা মাঝারি সাইজের প্রিজন ভ্যানে উঠলাম।

প্রিজন ভ্যান

জেল জীবনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ এই প্রিজন ভ্যান। নেভি ব্লু রঙের জানালাবিহীন চারদিক থেকে আবদ্ধ বড় আকারের একটি লোহার বাক্সের আকৃতিতে বানানো চার চাকা বিশিষ্ট গাড়িটির নামই প্রিজন ভ্যান। একেবারে উপর দিয়ে শুধু নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য সামান্য ফাঁকা করে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা করা হয়। বাইরে থেকে ভিতরের মানুষগুলোর শুধু চোখ-মুখই দেখা যায়। পুলিশের এই প্রিজন ভ্যান আমাদের নগর জীবনে অপরিচিত কোন গাড়ি নয়। বহুবার দেখেছি আগে। ছোটকালে যখন প্রিজন ভ্যানের জালির ফাঁক দিয়ে ভিতরের মানুষগুলোর চোখ-মুখ দেখতাম, মনে করতাম, এরা সব চোর-ডাকাত।

প্রিজন ভ্যান প্রধানত বন্দীদেরকে কারাগার থেকে কোর্টে আনা নেয়া করার কাজে ব্যবহার হয়। আমার কারা জীবনের মেয়াদ স্বল্প হলেও তিনটি জেলে থাকার সুবাদে জেলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বেশি হয়েছে। তেমনি অনেক মামলা থাকায় কোর্টেও খুব ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়েছে। তাই এই প্রিজন ভ্যানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও কম নয়। খুলনায় যখন গ্রেফতার হলাম। থানা থেকে পুলিশের টহল গাড়িতে করেই কোর্টে নেয়া হলো। কোর্ট থেকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ হলে প্রথমবারের মতো প্রিজন ভ্যানে উঠতে হলো। খুলনা কোর্ট চত্বর থেকে জেল গেট পর্যন্ত পৌছতে সাকুল্যে পাঁচ-সাত মিনিট সময় লাগে। খুলনা জেলের পনের দিনে আরেকবারই আমাকে কোর্টে নেয়া হয়েছিলো। সব মিলিয়ে খুলনা থাকতে একবার আসা আরেকবার যাওয়া-আসায় পনের থেকে বিশ মিনিট প্রিজন ভ্যানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো। সেই ভ্যানও নতুন ও তিন দিক ঘুরিয়ে ফোমের গদি লাগানো এবং উপর দিয়ে বড় বড় ফাঁকা। আর বন্দীর সংখ্যাও ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি নয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো এখানকার প্রিজন ভ্যানের অভিজ্ঞতাটাও সুখকর নয়। শুধু সুখকর নয় বললে আসলে যথার্থ বলা হবে না, বরং বলা উচিত চরম অমানবিক ও সীমাহীন কষ্টকর।

ঢাকা, খুলনা ও কাশিমপুর আমার থাকা এই তিন জেলের মধ্যে ঢাকার জেলেই সবচেয়ে কম সময় থেকেছি। তেমনি এই তিন জেলের মধ্যে ঢাকা জেলের প্রিজন ভ্যানেই আল্লাহ পাক সবচেয়ে কম তুলেছেন। কারাগারের মজলুম জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাহায্যের মধ্যে এগুলোও উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রিজন ভ্যানে আসা-যাওয়া মিলিয়ে মোট তিনবার আমাকে উঠতে হয়েছে। দুইবার এই ২৮ মে ঢাকা কারাগার থেকে কোর্টে যাওয়া ও আসার পথে। আরেকবার ১৯ জুন রিমান্ড থেকে কোর্ট করার পর কারাগারে আসার পথে। তিনবারের যাতায়াতে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভ্যানে উঠেছি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভ্যানগুলো বেশির ভাগই আকারে ছোট ও মাঝারি সাইজের। উচ্চতাও কম। সবগুলোরই প্রায় ভগ্নদশা। মান্দাত্তা আমলের অচল গাড়িগুলো দিয়ে এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। কোনটার মধ্যেই সিট নেই। ছাদ ভাঙ্গা কোন কোনটার। আর আলো-বাতাস তো নয় অক্সিজেন গ্রহণের জন্য উপরের সামান্য যে জায়গাটুকু খোলা থাকে সেখানে তো প্রথমে লোহার ফাঁকা ফাঁকা গ্রিল থাকে। এর উপর জালি লাগানো থাকে। কিন্তু ঢাকার গাড়িগুলোতে সেই জালির উপর দিয়ে আবার লোহার পাত লাগিয়ে নব্বই ভাগ ফাঁকই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

'ভর দুপুরে প্রচণ্ড রোদ্রের সময় পুরাতন ঢাকার বিখ্যাত যানজটের মধ্য দিয়ে এক-দেড়-দুই ঘণ্টা সময় যখন লেগে যায় সদরঘাটের কোর্ট-কাচারি থেকে চক বাজারের জেলগেট পর্যন্তের সামান্য দেড়-দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে। তখন যদি জেল কর্তৃপক্ষের জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলারগণ সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন দায়িত্বশীলদের ষাট-সত্তরজনের একটি দলকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঠাসাঠাসি গরু-ছাগলের মতো করে (গরু-ছাগলসহ বোবা প্রাণীর ক্ষেত্রেও এটা অমানবিক) ফুটন্ত এই জাহান্নামের বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা যেতো তাহলে হয়তো তাদের উপলব্ধি হতো বর্বরতা কত প্রকার ও কী কী!'

আনুমানিক আট ফুট দীর্ঘ আর পাঁচ ফুট প্রশস্ত একটা প্রিজন ভ্যান নামক লোহার বক্সের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশজন মানুষ ভরা হয়। আর যদি গাড়িটা আরেকটু বড় হয় তাহলে ভরা হয় এর দ্বিগুণ। প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ এই গাদাগাদি করা আবদ্ধ গাড়িটার মধ্যে প্রায় আশি ভাগ মানুষ একযোগে বিড়ি-সিগারেট আর গাজা সেবন করা শুরু করলে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে!

'ঢাকা কারাগারের প্রিজন ভ্যানের এই অবস্থার কারণে অনেক বন্দী এটাকে প্রিজন ওভেন বলে। আমার কাছেও এই যন্ত্রের এই নামকরণটি খুব যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।

> *ওভেনে যেমন খাবার গরম ও সিদ্ধ করা হয় প্রিজন ভ্যানেও তেমনি বন্দীদেরকে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। জেলখানার পরিভাষায় বলতে গেলে প্রিজন ভ্যান এ্যালাইছ ([illegible]) প্রিজন ওভেন বলা যায়।'*

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কষ্টগুলোর মধ্যে আমার কাছে এই প্রিজন ভ্যানের কষ্টটাই সবচেয়ে তীব্র মনে হয়েছে। শেষবার যখন প্রিজন ভ্যানে করে কোর্ট থেকে কারাগারে ফিরছিলাম তখন আবুল হাসনাত রোডে এসে মারাত্মক জ্যামে পড়লাম। ওদিকে শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। ভ্যানটার ছাদ বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ভাঙা। বৃষ্টির পানিতে অনেকের নেয়ে-দেয়ে একাকার অবস্থা। প্রায় ঘণ্টা খানেক এভাবে কাকভেজা হয়ে যখন জেলগেটে পৌছলাম তখন পড়লাম আরেক বিড়ম্বনায়। বিডিআর সদস্য– যাদের বকশী বাজার মাঠে বিশেষ সিভিল আদালতে মামলা চলছে তাদের বহনকারী কয়েকটি ভ্যান এসে গেটে থেমেছে। ঐ একই সময়েই আমাদের গাড়িও এসেছে। এখন সিরিয়াল পেতে লেগে গেলো প্রায় আরো পনের বিশ মিনিট।

২৮ মে সকাল সকাল আমরা একটা মাঝারি সাইজের প্রিজন ভ্যানে করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গেলাম। সকাল সকাল রাস্তা ছিলো ফাঁকা। পুরাতন ঢাকার চিরাচরিত জ্যাম তখনো জমে ওঠেনি। আমাদেরকে প্রিজন ভ্যান থেকে নামিয়ে সারিবদ্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের গারদে।

গারদ

জেল জীবনে আরেকটি অস্বস্তিকর জায়গার নাম গারদ। আসামীদেরকে যেখানে অপেক্ষমান অবস্থায় আটক রাখা হয় সেটাকেই গারদ বলা হয়। প্রতিটি থানাতেই গারদ থাকে। গোয়েন্দাদের রয়েছে এমন ভিন্ন ভিন্ন গারদ। আবার কোর্টে যখন আনা হয় বন্দীদেরকে, সেখানে বন্দীদের কাঠগড়ায় উঠানোর আগে পরে অবস্থান করার জন্য থাকে কোর্ট গারদ। নির্দিষ্ট হাজিরার দিনে বন্দীদেরকে জেলখানা থেকে কোর্টে পাঠানো হয়। বন্দীরা কোর্টের গারদে অবস্থান করে। অধিকাংশ সময় বন্দীদেরকে আর কাঠগড়ায় উঠানো হয় না। শুধু মামলার কাগজে (কাষ্টডি) তার উপস্থিতি রেকর্ড করে দেয়া হয়। একজন বন্দী যখন কারাগারে আছে সেতো কোর্টের আওতায়ই আছে। শুধু হাজিরার জন্য এই বন্দীকে কোর্টে টানা-হেচড়া করা অনর্থক একটি বিষয়। অনেক সময় দূরবর্তী কোর্ট থাকলে বড় অঙ্কের রাষ্ট্রীয় পয়সা খরচ করে এই বন্দীকে সেই কোর্টে নিয়ে হাজিরা দিতে হয়। শুধু এমন একটি হাজিরা দেওয়ার জন্য আমিও খুলনা গিয়েছি। যাওয়া-আসায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। তিন চারজন পুলিশ নিয়োজিত থেকেছে। আর আমার ব্যক্তিগত খরচ তো আরো বেশি। অথচ এত কষ্ট করে ঢাকা থেকে খুলনা গেলাম, আমাকে কোর্টেও উঠায়নি। গারদেই রেখেছে আর কাষ্টডিতে উপস্থিতির সিল মেরে দিয়েছে। এই কাজটুকুতো আমাকে কাশিমপুর কারাগারে রেখেই করা সম্ভব ছিলো।

> *'কিন্তু ব্রিটিশরা একটা নিয়ম চালু করে গেছে। ব্যস, যুগ যুগ ধরে তাই চলছে। আল্লাহর আইনের অনুকরণে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কত আপত্তি! অথচ ব্রিটিশদের নিয়ম-প্রথা এভাবেই অনুকরণ করে চলেছে যুগের পর যুগ।'*

কোর্টের গারদগুলোরও রয়েছে বিভিন্ন চিত্র। ১২ মে গ্রেফতারের পর আমাকে সোনাডাঙ্গা থানা থেকে খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে প্রেরণ করে। থানা পুলিশের টহল গাড়িতে আমাকে কোর্টির গারদে আনা হয়। আগেও গারদ দেখেছি। তবে বাইরে থেকে। খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের গারদই হলো আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। কোর্টে আনার সংবাদ শুনে অনেক মানুষ সেদিন কোর্টে

এসেছিলো। আইনজীবিদের মধ্যেও অনেকে আমার পক্ষে এজলাসে দাড়িয়েছে বলে শুনেছি। আমাকে সেই প্রথম দিনও কোর্টে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয়নি। গারদেই ছিলাম। গারদ থেকেই জেলখানায় পাঠানো হয়েছে।

খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের গারদে দুটি অংশ। মূল গারদ বেশ বড় একটি রুম। যার ভিতরের অংশে একটি বাথরুম। সেই বাথরুমকে কেন্দ্র করে সেখানে নোংড়া একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে। আর সামনের অংশে আছে একটি জানালা। মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব রেখে ঘন বুননের লোহার জালি দুই স্তরে লাগানো।

> *'বাইরে থেকে কোন কিছু ভিতরে যেনো না দেয়া যায়, তাই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এরপরও আসলে কি মাদক থেকে নিরাপত্তা মিলছে? যাদেরকে রাখা হয়েছে পাহারা দেয়ার জন্য তারাই যদি মাদক সরবরাহ করে লোহার জালি লাগিয়ে কি লাভ?'*

মূল গারদের বাইরে আছে আরেকটি ছোট রুম। এখানে গারদ থেকে কোর্টের কাঠগড়ায় আসামী আনা-নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশরা অফিসিয়াল কাজকর্ম করে। এই রুমটা একটু খোলামেলা। দুইশ টাকার বিনিময়ে কোন বন্দী এখানে থাকতে পারে। এখানে বসার মতো দুটি বেঞ্চ আছে। আর লোহার মাত্র একটি গ্রিলের দূরত্ব থেকে কথা বলার সুযোগ আছে।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের গারদে যখন আনা হলো তখনো ঘড়ির কাটায় আটটাও বাজেনি। পরিচিত কোন মানুষও আসেনি। একজন পুলিশকে বাসার নম্বরটা দিয়ে আমার কোর্টে আসার সংবাদটি জানিয়ে ফোন করে দিতে বললাম। প্রতিউত্তরে সে জানালো একটি কল করতে একশ টাকা লাগবে। নিরূপায় হয়ে বললাম– করেন, আমার লোক আসলে টাকা পেয়ে যাবেন। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে আমাকে নিশ্চিত করণ তথ্য দিয়ে গেলো। বলল, আপনার ছেলের নাম মিদাদ? এর অর্থ হলো, সে আমার বাসায় কথা বলেছে। অন্যথায় সে আমার ছেলের নাম জানলো কী করে?

কোর্ট গারদের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশেরও ভালো বাণিজ্য হয়। মোবাইল বাণিজ্যতো আছেই। মোবাইল বাণিজ্য দুইভাবে হয়। যখন বেশি কড়াকড়ি থাকে তখন সংবাদ পৌঁছে দেয়া বিনিময়ে একশত করে টাকা নেয়। আবার কখনো কখনো ম্যানেজ করতে পারলে পুলিশের মোবাইল দিয়ে নিজেও কথা বলা যায়। কয়েকজন মিলে প্যাকেজ কন্টাক্ট করেও পুলিশের মোবাইল দিয়ে অনেকে কথা

বলে। মোবাইল বাণিজ্য ছাড়াও জিনিসপত্র, খাবার-দাবার পৌছে দেয়ার বাণিজ্য আছে। আর আছে সাক্ষাত বাণিজ্য। একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী গেইটের পুলিশকে তিনশ থেকে পাঁচশ টাকা করে দিয়ে ভিতরে এসে দরজায় দাড়িয়ে কথা বলতে পারে। সেজন্য আবার ভিতরের পুলিশ চাইবে একশ টাকা। এখানকার পুলিশগুলোকে দেখলে মনে হয়, কেমন যেনো খাই খাই একটা আগ্রাসী ভাব তাদের মধ্যে বিরাজমান। ভাবখানা অনেকটা এমন, পুলিশের সামনে পড়লেই টাকা গুণতে হবে। গারদে পুলিশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য হলো মাদকের বাণিজ্য। গাজা, হিরোইন আর ইয়াবা সরবরাহ করে তারা। ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের গারদকে মাদকের আখড়া বললে যথার্থই বলা হবে।

মাদকের ব্যবসার জন্য পুলিশ কিছু কৌশলও অবলম্বন করে। আর এ কৌশলগুলো মাদকসেবীদের জন্য শাপে বর হলেও আমাদের মতো সাধারণ নিরীহ বন্দীদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। যেমন আমরা গারদের যে কক্ষটিতে ছিলাম সেটা কিছুটা ফাঁকা ছিলো। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে আমাদেরকে অন্য আরেকটি কক্ষে স্থানান্তর করল যেটা আগে থেকেই ভরপুর ছিলো। আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি? রুম খালি ফেলে রেখে সবাইকে নিয়ে এক রুমে গাদাগাদি করছে কেন? পরে পরিচিত একজন পুরাতন বন্দীর কাছ থেকে জানতে পারলাম এর রহস্য। মাদকের সকল গ্রাহকদেরকে একত্রিত করা এর উদ্দেশ্য। এভাবে চতুর্দিকে আবদ্ধ শুধু ভেন্টিলেশনের জন্য ছাদের সাথে লাগানো গ্রিলের ফাঁকগলে যতটুকু বাতাস আসতে পারে এমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিশ ফুট একটা কক্ষে দুই শতাধিক মানুষকে রাখা হলে রুমটার পরিবেশ কেমন হয় সহজেই অনুমেয়। নোংড়া আবর্জনার পাশাপাশি নানা রকমের মাদক আর সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গারদ রুমটার মধ্যে সুস্থ মানুষ থাকা কঠিন। এভাবে এক রুমে অধিক বন্দী রেখে কষ্ট দেয়ার আরেকটা লাভ হলো টাকার বিনিময়ে আগে গারদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এভাবে এখান থেকে বন্দীদেরকে পর্যায়ক্রমে জেলখানায় পাঠানো হবে।

যাই হোক, ফোনে সংবাদ পেয়ে গারদে সাক্ষাত করতে আসলেন মাহমুদ ভাই। আব্বার জীবদ্দশা থেকেই মাহমুদ ভাই আমাদের পারিবারিক অভিভাবক। মামলা সংক্রান্ত ঝামেলাসহ বাসা, মাদরাসা, ব্যবসা চতুর্দিক একাই তাকে সামলাতে হচ্ছে। আমি বন্দী। মাহবুব ভাই ও মাহফুজ ভাই আত্মগোপনে। এই অবস্থায় চাপটা মাহমুদ ভাইয়ের উপর অস্বাভাবিক। খুলনায় পনের দিন থাকতে সাক্ষাত করতে পারেননি। অন্যদের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন। বন্দী হওয়ার পর আজই আমার সাথে প্রথম সাক্ষাত হলো।

ছোট ভাইকে পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় গারদের এই অস্বস্তিকর পরিবেশে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। ছোট মানুষের মতো হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলার মধ্যেই পুলিশ এসে আরো টাকা দাবি করতে লাগলো। মাহমুদ ভাই দাবি মেটালেন। আমি ক্ষুধার্ত, নাশতা খাইনি জেনে পকেট থেকে টাকা বের করে পুলিশের কাছেই দিলেন নাশতা আনতে। বাইরে থেকে ইতিমধ্যে আমার সাক্ষাতে আসা শরীফ বিরানী কিনে পুলিশকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঐ বিরানীর উপর দিয়েই চালিয়ে দিলো। যেই পুলিশ বাসায় ফোন করেছিলো, তার ফোন নম্বর নিয়ে বড় বোন (মাসনুনের আম্মা) ফোন করে আমার সাথে সাক্ষাত করা যাবে কিনা জানতে চাইলে সে আসতে বলে। বোনের কাছ থেকে চারশ টাকা নিয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়।

এ দিন গারদ থেকে আমাকে কোর্টে উঠানো হয়। দারুস সালাম থানার একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন ছিলো। মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ডের আবেদন নাকচ করে জামিন মঞ্জুর করেন। বহু কষ্টের মধ্যেও একটি জামিন সান্ত্বনার পরশ হিসেবে কাজ করে।

এভাবে কোর্ট শেষে বিকালে আবার সেই পূর্ব বর্ণিত প্রিজন ভ্যান নামক ওভেনে করে কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বিকাল চারটা বাজার পর আমাদেরকে কোর্ট থেকে পাঠানো হলো। অথচ একটার আগেই আমাদের কোর্টের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এই প্রশ্ন কার কাছে করব যে, এই তিন ঘণ্টা কেন আমাকে ও আমার মতো আরো অনেককে গারদে রেখে কষ্ট দেয়া হলো? কেন আমাদের আসরের নামায হুমকির মুখে ফেলা হলো? এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

> *'এমন আরো বহু প্রশ্ন আছে আমাদের সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যেগুলোর কোন জবাব আমরা খুঁজে দেখি না কিংবা খুঁজে দেখলেও সন্তোষজনক কোন জবাব পাই না। প্রশ্ন হলো এভাবে চলবে আর কত দিন। চলতে দেয়া যায় কত দিন?'*

জেলখানায় পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের ছয়টা বেজে গেলো। আমরা যখন জেলগেটে পৌছলাম তখন দেখি চন্দ্র দিঘলিয়ার মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব তার অপর সঙ্গীসহ জেল অফিসে ঢুকছেন। দূর থেকে দেখা হলো। তিনি জানালেন তারা কাশিমপুর কারাগারে যাচ্ছেন। পূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও ওনাকে জেলখানার ঘনিষ্ঠ আপনজন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। তাই তার চলে যাওয়ায়

কিছুটা হতাশও হলাম। জেল গেটের তল্লাশি ও কয়েক দফার গণনা শেষে ভিতরে ঢুকতে আরো প্রায় আধা ঘণ্টা লাগলো। সন্ধ্যা ছয়টায় লকআপ হয়ে যায়। লকআপের সময় সবাই যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায়। কাজেই ডান্ডাবেড়ি লাগানো ও খোলা হয় যেখানে অর্থাৎ 'বেড়ি দফার' কোন কয়েদী এখন আর সেখানে নেই। তাই সারা রাত এভাবে বেড়ি পরেই থাকতে হবে। কোর্ট গারদে দেরি হওয়ার এটি আরেকটি বড় বিড়ম্বনা। এভাবে আজ রাতটাও আমদানিতে থাকতে হবে।

আমি যেহেতু আজকের নতুন আমদানী না, তাই আমি আমদানীর বিড়ম্বনা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পেলাম। কিন্তু গত রাতে রাত দুইটায় যেই জায়গাটা ফাঁকা পেয়েছিলাম, আজকে দেখলাম নতুন আগত চারজন বন্দীর কাছে সেটা বিক্রি করা হয়ে গেছে। সকাল ও দুপুরের খাওয়া কোর্টের গারদে সেরেছিলাম। তাই খাওয়া নিয়ে আপাতত টেনশন নেই। রাতের খাবার না খেলেও চলবে। কিন্তু থাকার জায়গা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। ইতিমধ্যে মাগরিব ও ইশার নামাযের সময় জামাতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের কয়েক ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। তাদের মধ্যে একজন কুমিল্লা লাঙ্গলকোটের নির্বাচিত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। আরেকজন ছাত্র শিবির করে মহিউদ্দীন নাম। মহিউদ্দীন বেশ কয়েক মাস যাবৎ এই আমদানিতেই আছে। বিভিন্ন সিস্টেম করে এখানকার কায়েমী চক্রের সাথে একটা সখ্যতা গড়ে নিয়েছে। কৌশলগত কারণেই সে এখানে আছে। জামাত-শিবিরের নবাগত বন্দীদেরকে প্রাথমিক শেল্টার দেয়া তার কাজ। চেয়ারম্যান সাহেব ও মহিউদ্দীনসহ চারজনের একটা গ্রুপ ছিলেন তারা। আমার পরিচয় পেয়ে তারা আমাকে কিছুটা মূল্যায়ন করতে লাগলেন। তারা বিশেষ আয়োজনে খাবার খান। রাত্রে আমাকেও তারা তাদের সাথে খাবারে শরীক করে নিলেন। আগের রাত্রের মতো না হলেও মোটামুটিভাবে রাতটা কাটানোর ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

সকাল বেলা ফজরের নামায পড়ে সিটে বসেই কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম। ইতিমধ্যে সকালের গুণতি ফাইলও হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে হালকা একটা বাজনা দিয়ে শুরু হলো মাইক বাজা। সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে অনবরত বেজে চলছে মাইক। বিভিন্ন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তাতে। একেক বিষয়ে একেক ঘোষক ঘোষণাগুলো দিয়ে চলছে। এরই মধ্যে একজন ঘোষক জামিন প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা শুরু করলো। বেশ নরম ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 'অমুক পিতা অমুক থানা মোহাম্মদপুর জেলা ঢাকা আপনার মিরপুর থানার মামলা আপনার

জামিন হয়েছে আপনি জামিন টেবিলে চলে আসুন।' কয়েকবার করে এক একটি নাম ঘোষণা করছে। এভাবেই জামিন প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা চলছে। আমি মামলা-মোকদ্দমা, জেলখানা-কোর্ট ইত্যকার বিষয়গুলো এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার-স্যাপার তেমন কিছুই তখনো বুঝে উঠতে পারিনি।

জামিনপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা শুনে আমার মনে একটা কল্পনা আসতে লাগলো– যদি আমার নামটাও এভাবে ঘোষণা হতো! আমি এ জাতীয় কল্পনা করছিলাম এর মধ্যেই একটা পরিচিত নাম শুনতে পেলাম 'মুফতী ইমরান মাযহারী'। লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব মাওলানা মুফতী ইমরান মাযহারী ও জামেউল উলূম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল বাশার নোমানী সাহেব গ্রেফতার হয়েছেন খুলনা জেলেই এ সংবাদ জেনেছিলাম। জামিনপ্রাপ্ত হিসেবে ইমরান মাযহারী সাহেবের নাম শুনে আমার মনের মধ্যকার সেই কল্পনাটা স্বপ্নে পরিণত হয়ে গেলো। মনে আমার নানান ভাবনা জড়ো হতে লাগলো। সরকার হয়তো সুমতি ফিরে পেয়েছে। হেফাজতে ইসলামকে নমনীয় করার কৌশল নিয়ে থাকতে পারে। সেই হিসাবে গ্রেফতারকৃতদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারে। হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেবকে এক রকম গায়ে পড়ে, আইনজীবিকে ডেকে এনে সকল মামলার জামিন দিয়ে তাড়াহুড়া করে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। আমি স্বপ্নে বিভোর হতে লাগলাম– যদি এমনই হয় যে, আমাদেরকেও এখন মুক্তি দিয়ে দিবে! এমন স্বপ্নে আমি ডুবে ছিলাম এমন সময় অবিশ্বাস্যভাবে মাইকে ঘোষণা শুনতে পেলাম 'মামুনুল হক পিতা মাওলানা আজিজুল হক, লালবাগ, ঢাকা। আপনার জামিন হয়েছে আপনি জামিন টেবিলে চলে আসুন।' ভিতরে ভিতরে আমি পুলকিত হতে লাগলাম। ইমরান মাযহারী সাহেবের পর আমার নাম শুনে আমার ঐ ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হতে লাগলো। স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়ে যায় তাহলে কী করব? কীভাবে বের হবো এই জাতীয় কল্পনাও মনের মধ্যে ভিড় জমাতে থাকলো।

মনের মধ্যে যখন এই জাতীয় কল্পনা আর স্বপ্নগুলো দানা বাধছিলো, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা তাগিদ অনুভব করলাম এবং বিপরীত চিন্তাটাকে মনের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক শক্তিশালী করার চেষ্টা করলাম। ভাবতে শুরু করলাম যে, ব্যাপারটি আমি যেমন কল্পনা করছি তেমন হতে পারে না। যদি তেমনি হতো তাহলে তো গতকালকেই আমার লোকজনের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তারা জানতো, আমাকে জানাতো। আস্তে আস্তে আবার আপনা থেকেই এই চিন্তাটি মনের মধ্যে গভীর হতে লাগলো। বাস্তব চিন্তার সামনে এক সময় কল্পনার সেই

রঙ্গিন ফানুস ফিকে হয়ে যেতে লাগলো। আমি বুঝতে শুরু করলাম, যদি আসলেই সেই জাতীয় কিছু হতো তাহলে তো আমাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত সংবাদ দেয়া হতো। আমি স্বপ্ন থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এসে জামিন টেবিলে যাওয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দু' একজনের সাথে কথাও হলো যারা মাইকে আমার নাম শুনেছে। তাদের মনোভাব থেকেও আমি বাস্তবতা উপলব্ধি করলাম। এরপর আমি নিজেই নিজের সাথে বোঝাপড়া করলাম যে, গতকালকে তো আমার একটি মামলার জামিন হয়েছে সেটার কথাই ঘোষণা এসেছে। কিন্তু খটকা লাগলো ইমরান মাযহারী সাহেবের নাম শুনে। মনে মনে ইমরান মাযহারী সাহেবের সন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু কোন সূত্র পেলাম না। এরপর চিন্তা আসলো, জামিন টেবিলে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেই। একজনের কাছ থেকে জেনে নিলাম জামিন টেবিলটা কোন দিকে। আমি তো এখনো কেইস স্লিপ হাতে পাইনি, তাই আমার বন্দী নম্বর নেই। এটা একটা সমস্যা। এরপরও গেলাম। জামিন টেবিলে অনেক মানুষের ভিড়। একটু ভিড় কমার অপেক্ষা করলাম। ভিড় কমার পর জিজ্ঞাসা করলাম। তারা প্রথমে জামিন তালিকায় আমার নাম পেলো এখন জামিননামা খুঁজে বের করার পালা। সেটা আর তারা করতে রাজি না। এক প্যাকেট বেনসন লাগবে। আমার কাছে তো এই মুহূর্তে দেয়ার মতো কিছুই নেই। খুলনা থেকে টাকা যা নিয়ে এসেছিলাম সেটাতো অফিসে জমা করা হয়েছে। অফিস থেকে পি. সি (ব্যক্তিগত টাকার হিসাব) কার্ড এখনো পাইনি। শেষে আমাদের আমদানী ওয়ার্ডের একজন পুরাতন লোক যার আয়োজনে রাত্রে আমরা খানা খেয়েছিলাম তার জামানতে জামিন টেবিলের লোক জামিননামা খুঁজতে সম্মত হলো। এভাবেই নিশ্চিত হলাম যে, গতকাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে হওয়া মামলার জামিনটিই এখানে এসেছে। ব্যাপার আর কিছু না! প্রায় দুই মাস আগের সে দিনের সেই কল্পনার কথা মনে পড়লে জেলখানার মধ্যে বসেই আমার হাসি পায়।

ইতিমধ্যে ডান্ডাবেড়িও খুলে ফেলেছি। আমদানীতেই থাকতে লাগলাম। আগামী দিনগুলো কীভাবে কাটাবো সেটা নিয়ে ভাবছিলাম। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেই থাকবো না কাশিমপুরে যাওয়ার চেষ্টা করব– এমন একটা দোদুল্যমানতাও ছিলো মনের ভিতর। ঢাকা থাকলে কী সুবিধা, কী অসুবিধা। কাশিমপুরের কী সুবিধা-অসুবিধা। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আগে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করব। তারপর সিদ্ধান্ত নিবো। খুলনা থেকে আসার সময় চিন্তা ছিলো কাশিমপুর যেতে পারলে ভালো হবে। কিন্তু সেটাতো আর হয়নি।

এসে গেছি ঢাকা কারাগার। ঢাকায় যেহেতু এসেই গেছি এখন সিদ্ধান্তটা বুঝে-শুনেই নিতে হবে। যদি ঢাকায়ই থাকি, তাহলে কোন জায়গায় থাকলে সুবিধা হবে এই ব্যাপারও ছিলো। এতো কিছুর আগ-পাছ ভেবে সর্বপ্রথম ঠিক করলাম– কোথায় যাবো সেটা নির্ধারণ করতে একটু সময় নিতে হবে। তাই কোন দিকে না গিয়ে দু-চারটা দিন আমদানীতেই থাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলাম। মহিউদ্দীনের সাথে কথা বললাম। তারা যেভাবে খাবার খায় সেখানে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিলাম। কিন্তু বিকাল বেলা হঠাৎ করে আমদানীর সকল হাজতীদেরকে বের হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো। মহিউদ্দীন আর চেয়ারম্যান সাহেব একদিকে সরে থাকলো। আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখার ফুরসত তাদের নেই। অগত্যা আমদানী থেকে বের হতে হলো। আমদানী থেকে বের করে বিভিন্নজনকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিলো চিফ রাইটার মশাই। ইসলামী মনোভাবাপন্ন আমরা যে কয়জন ছিলাম আমাদেরকে মেঘনা- ৫ ওয়ার্ডে পাঠালো। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় কী করা উচিত কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। আমার চিন্তা হলো কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে হলেও আপাতত আমদানীতে থাকা নতুবা যেতে হলে কিছু টাকা দিয়ে ভালো কোন জায়গায় যাওয়া। কিন্তু এসবের কোন সুযোগই পেলাম না। চিফ রাইটার ব্যাটার সাথে কথা বলতে চাইলে সে বললো, আপনি আলেম মানুষ, আর কোন চিন্তা করবেন না যেখানে দিয়েছি সেখানেই যান। শেষে ব্যাগ-বোচকা নিয়ে সেদিকেই পা বাড়ালাম।

মেঘনা– ৫

আমদানী থেকে সোজা মুখোমুখি উত্তর দিকের ভবনটিই হলো মেঘনা। আর যাওয়ার পথে সর্বপ্রথম ওয়ার্ডই হলো মেঘনা- ৫। জামাত শিবির, হিযবুত তাহরীর আর সর্বশেষ হেফাজত অর্থাৎ ইসলামী রাজনৈতিক সব বন্দীদেরকেই এই মেঘনা- ৫-এ পাঠানো হয়। মাঝারি সাইজের একটি রুম। আমি ঢুকতেই একটা ছেলে আমাকে স্বাগত জানালো। হিযবুত তাহরীর করে। আগের দিন কোর্টের গারদে পরিচয় হয়েছিলো। এক সাথে আদালতের কাঠগড়ায়ও দাড়িয়ে ছিলাম। মোহাম্মদপুর লালমাটিয়া বাড়ি। ছেলেটি আমাকে এবং আমার সাথে অন্য আরো শিবিরের যে ছেলেরা নতুন এই ওয়ার্ডে এসেছে তাদেরকে সহযোগিতা করছিলো। ওয়ার্ডের এক দিকে নামাযীরা থাকে অপর দিকে বে-নামাযীরা। আমাদেরকে নামাযীদের দিকে নিয়ে আসছিলো। এভাবেই সে খুব তৎপরতা দেখাচ্ছিলো। এতে এই ওয়ার্ডের একজন সহকারী মেট তার উপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং তাকে কড়া ভাষায় শাসালো। পরে জানলাম, আসল

ব্যাপার হলো, নবাগতদেরকে সমস্যায় ফেলে তাদের কাছ থেকে টাকা হাতানো এদের অভ্যাস। পুরাতন লোকেরা এভাবে নতুনদেরকে সহযোগিতা করলে তাদের কামাই-রোজগারে সমস্যা হয়। এইজন্য সে ক্ষিপ্ত হয়েছে।

শিবিরের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা ছেলে ছিলো। তারাও বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে বরণ করলো এবং সম্মান প্রদর্শন করলো। এখানে বিশেষ একটা ছেলের সাথে আমার সাক্ষাত হলো, যার নাম হলো শাহজাদা হাশেমী। আমাকে সে আগে থেকেই চিনতো। আমাকে পেয়ে সে খুব আপ্লুত হলো। এক পর্যায়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তার দুঃখের কাহিনী আমাকে শোনালো। তাকে ইতিপূর্বে না চিনলেও সে যেই কাহিনী শোনালো তা আমার আগ থেকেই জানা ছিলো।

শাহজাদা হাশেমী। জামিয়া রাহমানিয়ার পাশেই তার কোন আত্মীয়ের বাসা। সেখানে এসেছে হেফাজতে ইসলামের প্রোগ্রামের আগে। থাকে সিলেটে। সেখানে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করে। ৫ মের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য ঢাকা এসেছে। কর্মসূচির এক-দুই দিন পর হাশেমী একদিন মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করা শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড ও পুলিশি তাণ্ডবের কিছু ভিডিও চিত্র রাহমানিয়ার গেইটে বসে দারোয়ান ও কিছু ছাত্রকে নিয়ে দেখাদেখি করছিলো। ইত্যবসরে রাহমানিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট একজন এটা দেখে তার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর পুলিশকে খবর দিয়ে শিবির কর্মী পরিচয়ে হাশেমীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রাহমানিয়ার দায়িত্বশীলদের অজান্তেই ব্যাপারটি ঘটে যায়। আমাকে জেলখানায় পাশে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয় হাশেমী।

মেঘনা– ৫-এ দুইদিন থাকলাম। একটু চাপাচাপি ছিলো। কিন্তু সকলেরই আচরণ ছিলো আন্তরিকতাপূর্ণ। ছাত্র শিবিরের ছেলেরা মেস-এ থেকে অভ্যস্ত। তারা সেভাবেই এজতেমায়ীভাবে খাওয়া-দাওয়াসহ সব আয়োজন করছিলো। আমিও তাদের সাথে একত্রেই সবকিছু করলাম। আর ভিতরে ভিতরে অন্যান্য জায়গার সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে থাকলাম।

আমরা সবাই আওয়ামী সরকারের রোষানলের শিকার। অন্যায় মামলার কারণে কারারুদ্ধ। এমনিতেই জেলখানায় ভদ্র মানুষ যারা, তাদের পরস্পর সহমর্মিতা থাকে। সেই সুবাদে মুক্ত জীবনে আমাদের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও কারা জীবনে আমরা নিজেদের প্রয়োজনেই মিলে মিশে থাকলাম। আর আমাকে পেয়ে সবাই একটু বেশি উচ্ছ্বসিতও ছিলো। হেফাজতে ইসলামের ৫ মের ঘটনার সময় এরা অনেকেই কারাগারে ছিলো। তাই সে বিষয়ে জানার

কৌতুহলও স্বাভাবিকভাবেই তাদের একটু বেশি। তাদের সেদিনকার প্রতিক্রিয়াও তারা ব্যক্ত করলো। কথা প্রসঙ্গে তারা জানালো, সন্ধ্যায় যখন বিবিসি'র সংবাদে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের খবর প্রচার করলো। সেখানে একজন ভাইয়ের জোরালো বক্তব্য ছিলো এমন– 'রক্ত যখন দিয়েছি... সেই বক্তব্য শুনে সবাই আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। তারা কারাগারে বন্দী থেকেও হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ করেছে এবং পরবর্তীতে তারা তাদের অভিব্যক্তি জানিয়েছে। এভাবেই বন্দীরা তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে। কাশিমপুর কারাগারে এসে এই অভিব্যক্তির আরো তীব্র প্রকাশ ঘটতে দেখেছি। শুধু দেখেছি বললে যথার্থ বলা হবে না বরং আমরাও ঘটিয়েছি। বন্দীদের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধ্বনিতে সারা কারাগার প্রকম্পিত হতেও দেখেছি আমি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভাইয়েরা যখন ৫ মের সন্ধ্যায় বিবিসি'র প্রচারিত হেফাজতের মঞ্চ থেকে দেয়া বক্তব্যের ব্যাপারে তাদের এ উচ্ছ্বাস, মনোবল ও অনুপ্রেরণার কথা বলছিলো তখনো আমার জানা ছিলো না যে, প্রচারিত ঐ বক্তব্যটি আমার ছিলো। সেটা আমি জেনেছি আরো বেশ পরে। আমার ঐ বক্তব্যের মধ্যে উত্তেজনার পারদ যে একেবারে তুঙ্গে উঠেছে সেটা বলাই বাহুল্য। আর তাই ঐ বক্তব্যকে পক্ষের লোকেরা যেমন অনুপ্রেরণামূলক বলে আখ্যায়িত করেছে বিপক্ষের সমালোচকরা চরম উস্কানীমূলক বলেও চিহ্নিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীও ঐ বক্তব্য কোড করে জাতীয় সংসদসহ একাধিক বক্তৃতায় কড়া সমালোচনা করেছেন। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী, এমপি ও সরকার দলীয় নেতৃবৃন্দও করেছেন। শাপলা ট্রাজেডির পরদিন ৬ মে প্রথম আলোতে ঐ বক্তব্যের উপর প্রথম পাতায় বড় শিরোনাম করা হয়েছে এবং আমার উদ্ধৃতিতে আমার হুবহু বক্তব্য তুলে ধরেছে। শুনেছি নিরপেক্ষ পর্যালোচক অনেকের আলোচনাতেও আমার বক্তব্যটির প্রসঙ্গ এসেছে এবং তার সমালোচনাও হয়েছে।

আমি আমার একান্ত এক তরুণের কাছে আমার এই বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের মহলের মনোভাব জানতে চেয়েছিলাম। সে বলল, 'আমরা যারা তরুণ– আমাদের কাছে তো দারুণ অনুপ্রেরণামূলক ও অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে হয়েছে। তবে যারা চিন্তাশীল ও মুরব্বী, আপনার উপর এর কী প্রতিক্রিয়া আসে সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন হয়েছেন।' সব কিছুর পর এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমার অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া কী? মূলত এই আলোচনার প্রয়োজনেই এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছি।

আমি ৫ মে শাপলা চত্বরের মঞ্চে দুইবার বক্তব্য রেখেছি। গাবতলী থেকে মিছিল সহকারে সমাবেশে পৌঁছার পর তিনটার দিকে একবার। তখনকার বক্তব্য ছিলো স্বাভাবিক ও উত্তেজনাবিহীন। কারণ শাপলা চত্বরে তখন পরিবেশ ছিলো শান্ত ও স্বাভাবিক। আরেকবার বক্তব্য রেখেছি মাগরিবের আগ মুহূর্তে। সেই বক্তব্যটি প্রচারিত হয়েছে বিবিসি সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। বিবিসিতে প্রচারিত বক্তব্য ছিলো–

'আমাদেরকে আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে, সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে যদি আমরা উঠে না যাই। সৈয়দ আশরাফ সাহেব কী করবেন? পরিস্কার ঘোষণা করতেছি আজ রাত্রের পরে আপনারা কোন পথে পালাবেন সেই পথ দেখার চেষ্টা করুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, জীবন দেব। রক্তের বিনিময়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজত করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।'

আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত বক্তব্যে দুটি স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ এসেছে। একটি হলো– সরকারের মুখপাত্র, আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফের বক্তব্যকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আরেকটি হলো, পালানোর পথ খুঁজে দেখতে বলার মতো সরকারের প্রতি চরম হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এখানে দুটি প্রশ্ন আসতে পারে।

এক. এতটা চরম বক্তব্য দেয়ার কী যৌক্তিকতা ছিলো?

দুই. এত বড় কথা বলার আমি কে?

প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে আমার জবাব হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান রক্ষার ঈমানী ইস্যুতে উত্তাল জন সমুদ্রকে যে ভাষায় সৈয়দ আশরাফ সাহেব হুমকি দিয়েছেন, আগামীতে ঘর থেকে বের হতে দিবেন না মর্মে যে চরম অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছেন, তার মোকাবেলায় ঈমানের দাবি পূরণ ও আন্দোলনকারীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এমন পাল্টা চ্যালেঞ্জ ও চরম হুঁশিয়ারী প্রদানই ছিলো উপযুক্ত জবাব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলা, এত বড় কথা বলার দায়িত্বশীল অথরিটি আমি নই– এই অনুভূতি আমার বক্তব্য দেয়ার সময়ও ছিলো, এখনো আছে। মূলত আমার বক্তব্যটি ছিলো কেন্দ্রীয় ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মনোভাবের প্রতিফলন। সৈয়দ আশরাফ সাহেবের আল্টিমেটাম আসার সাথে সাথে মাগরিবের বেশ আগেই মঞ্চ থেকে স্পষ্ট ভাষায় তার আল্টিমেটামকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অবস্থানের স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নীতি নির্ধারণী এই ধরনের বক্তব্য নীতি নির্ধারক আস্থাভাজন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আসার পর আমাদের দায়িত্ব ছিলো– এই বক্তব্যের পক্ষে জনতার মনোবলকে চাঙ্গা রাখা।

এই ধরনের চিন্তাই আমার মধ্যে কাজ করেছিলো। এই হলো আমার মূল্যায়ন। ভিন্ন চিন্তার অবকাশ অবশ্যই আছে।

যাই হোক, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মেঘনা– ৫ ওয়ার্ডে আন্তরিক পরিবেশেই কাটছিলো সময়। ছোট ভাই মাসরুরের বন্ধু মাহবুবে রব্বানীর এক সম্পর্কের ভাই 'মুন্না' সেও আছে এই মেঘনা– ৫-এ। মেঘনা ভবনের সে পি.সি রাইটার। সেও বেশ সহযোগিতা করেছে আমার। আর হাশেমী তো আছেই। হাশেমীর সাথে অনেক কথা হয়েছে। তার কথা, আচরণ ও অন্যান্য শিবির কর্মীদের মাধ্যমে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, সে ছাত্র শিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বাকি কারাগার থেকে বের হয়ে কী করবে সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। এমন অনেক হাশেমীকেই দেখেছি যারা আগে না করলেও কারাগারে এসে জামাতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সিংহভাগ কৃতিত্ব যে আওয়ামী লীগের তা বলাই বাহুল্য!!

মেঘনা ওয়ার্ডে এসে কাশিমপুর কারাগার বিষয়ে আরো প্রশংসা শুনলাম। এটাও জানলাম যে, সপ্তাহে দুইবার শুক্র ও শনিবার ঢাকা থেকে কাশিমপুরে বন্দী চালান করা হয়। জামাত-শিবির, হিযবুত তাহরীর ও হেফাজতের বন্দীদেরকে সাধারণত ঢাকায় রাখা হয় না। সারা সপ্তাহে এই জাতীয় যে সকল বন্দী আসে তাদেরকে ঐ দু'দিনে কাশিমপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বন্দীর চাপ বেশি হলে সপ্তাহের মাঝখানেও চালান পাঠায়। আমদানী থেকে ইসলামী বন্দীদেরকে মেঘনায় পাঠায় বেশি। অন্য জায়গায়ও পাঠায়। এরপর সেখান থেকে কাশিমপুর। যে সকল ছাত্র পরীক্ষার্থী আছে পরীক্ষার সুবিধার্থে তাদের অনেকে ঢাকা কারাগারে থেকে যায়।

ইসলামী বন্দী ছাড়া সাধারণ অন্য বন্দীরা ঢাকা থেকে কাশিমপুর আসতে চায় না। অনেকে আপনজনদের দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার কথা বিবেচনা করে। আবার অনেকে ঢাকায় নানা রকম অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পায়। অনেকে আবার মনে করে কাশিমপুর থেকে ঢাকার কোর্টে যাতায়াত অনেক কষ্টকর। প্রকৃত অবস্থা জানা না থাকায়ও অনেকে আসতে চায় না। এমন বন্দীও আমি দেখেছি যাদেরকে পানিশমেন্ট হিসাবে ঢাকা থেকে কাশিমপুর চালান করা হয়েছে, তারা করজোরে জানতে চাইছে কী অপরাধে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এটাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সাধারণ চিত্র। অথচ আমরা আবার ঢাকা থেকে কাশিমপুর যাওয়ার জন্য পাগল। নানান মানুষের নানান চাহিদা। প্রয়োজন ও পছন্দের এই বৈচিত্রই সৃষ্টি জগতের অনন্য সৌন্দর্য। স্রষ্টার অপার মহিমা!

বৃহস্পতিবার ৩০ মে মেঘনা– ৫-এ তালিকা করা হলো। কারা কারা কাশিমপুর যেতে ইচ্ছুক! দু-চারজন বাদে বাকি সবাই নাম তালিকাভুক্ত করে দিলো। আমিও দিলাম। ঐ দিনই একজন লোক আমার সাথে সাক্ষাত করে বলল, কাশিমপুরে আছে হুসাইন, আপনাকে চিনে। তাদের ওখানে আপনাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। শরীফও সাক্ষাত করে হুসাইনের কথা বলল। আমারই ছাত্র। জামেউল উলূমে আমার কাছে পড়েছে। আমি মনে করতে পারলাম না। শরীফ বলল, দেখলে হয়তো চিনবেন। কাশিমপুর ৪নং কারাগারে থাকে। আপনাকেও সেখানে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। হুসাইন থাকে চন্দ্রা ভবনের ৫ম তলায়। কাশিমপুর ৪-এ গেলে আপনি সেখানে খবর দিবেন। হুসাইন আপনাকে ওখানে নেয়ার ব্যবস্থা করবে। ওখানে মাওলানা আবুল বাশার সাহেবও আছেন। হুসাইনের নাম আর চন্দ্রা ৫ম তলার কথা মনে রাখলাম।

শুক্রবার দিন সকালে ওয়ার্ডে এসে একজন রাইটার নিশ্চিত করে গেলো, কার কার কাশিমপুর চালান আছে। সেখানে নাম দেখে নিশ্চিত হলাম। জুমার নামাযের পর পর আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হলো।

আমাদের ওয়ার্ড মেঘনা–৫ এর সামনের বারান্দা বাউন্ডারী দিয়ে নামাযের জন্য তৈরি করা। সেখানে যোহর আর আসরের জামাত হয়। শুক্রবার দিন জুমার নামাযও হয়। জেলখানায় জুমার নামায পড়া শুদ্ধ কিনা, বিতর্কের বিষয়। তবে জায়েয হওয়ার ফতওয়া আছে। নাজায়েয হওয়ার পক্ষেও মত আছে। মূল বিষয় হলো, জুমা সহীহ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল জুমায় শরীক হওয়ার সাধারণ অনুমতি (اذن عام) থাকা। জেলখানা তো আবদ্ধ জায়গা সেখানে সর্ব সাধারণের অনুমতি নেই। কিন্তু জায়েয হওয়ার পক্ষে বক্তব্য হলো, সাধারণ মানুষের যে অনুমতি নেই সেটাতো ভিন্ন কারণে জেলখানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোন কারণে যদি কেউ সেই বাধা অতিক্রম করে জেলখানায় প্রবেশ করতে পারে– যেমন অনেক শ্রমিকরা বিভিন্ন কাজে ভিতরে আসে। সরকারী লোকজন ভিতরে আসতে পারে। যারা জেলখানার ভিতরে আসতে পারবে তাদের কাউকে তো জুমায় শরীক হতে বাধা দেয়া হয় না। এই ধরনের ব্যাপার তো অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। যেমন সচিবালয় এলাকা, কোন মিল-ফ্যাক্টরী এলাকা বা সেনাবাহিনীর সামরিক এলাকা। এ সকল সংরক্ষিত স্থানে বাধা মূলত জুমার মসজিদে নয় বরং অন্য কারণে অন্য ক্ষেত্রে বাধা। সেই সকল জায়গায় যেমন 'ইজনে আম' বা সাধারণ অনুমতি আছে, জেলখানায়ও সাধারণ অনুমতি আছে। এই যুক্তিতে জেলখানায় ব্যাপক পরিসরগুলোতে জুমা হয়। আমারও মত হলো, এই ক্ষেত্রে জুমা পড়া যায় এবং আমিও খুলনা জেলে তিন জুমা ও ঢাকা জেলে

তিন জুমা শুধু আদায় নয় ছয়টি জুমাতেই ইমামতি করেছি। এ যাবৎ অবশিষ্ট চার জুমার দিন কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা হয়েছে। এখানে সেল ব্যবস্থা। একটি ব্লকে আমাদের বিচরণ সীমাবদ্ধ। ব্লকে ৭টি রুম আর রুমগুলোর সামনে ৬০/৬৫ ফুট দীর্ঘ ৫ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দা। এই বারান্দাতেই জোহর-আসরের নামায আমরা ৭ রুমের বাসিন্দারা এক সাথে জামাতের সাথে আদায় করি। শুক্রবারও জোহর পড়ি, জুমা পড়ি না। এত ছোট্ট পরিসরে জুমার শান হয় না। আরো একটি জুমা হয়তো জেলখানায় কাটাতে হবে। (একটি নয় আরো দুটি জুমা পড়তে হয়েছে।) মজার ব্যাপার হলো, সময়ের বিবেচনায় আশি দিনের মতো কারা জীবনের সাকুল্যে ত্রিশ দিনেরও কম থেকেছি ঢাকা ও খুলনা কারাগারে। আর পঞ্চাশ দিনের মতোই থাকা হয়েছে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটিতে। অথচ ঐ ত্রিশ দিনেই জুমা পেয়ে গেছি ৬টি আর এই পঞ্চাশের অধিক দিনে জুমার দিন পড়েছে মাত্র পাঁচটি। সবকিছুই তুমি কর হে আল্লাহ! তাই সকল প্রশংসাও কেবল তোমারই প্রাপ্য হে মালিক!

ওয়ার্ডের সবাই অনুরোধ করলো আমি যেনো জুমার ইমামতি করি। জুমা পড়ালাম এখানে। জুমার পর খাবার খেয়ে মাল-সামানসহ আমাদেরকে ওয়ার্ড থেকে নিয়ে আমদানীতে অপেক্ষমান রাখা হলো। আমদানীতে আউয়াল ওয়াক্তেই আসর নামায আদায় করে দু'জন দু'জন হাত ধরে সারিবদ্ধভাবে চললাম প্রধান ফটকের দিকে। সেখানে গিয়ে অফিসিয়াল কাজ সারতে আরো ঘণ্টা খানেক লাগলো। প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম, থানা, জেলা নিশ্চিত হওয়ার পর আরও একটি তথ্য যাচাই করা হলো। স্ত্রী, বোন, মা, ভাই অথবা সন্তানের নাম। নাম-ঠিকানা রেজিষ্ট্রি করার সময় বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ধরনের কিছু তথ্য নোট করে রাখে। অতঃপর প্রয়োজনের সময় যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। একজনের জায়গায় যেন কোনক্রমে অন্যজন চলে যেতে না পারে সেজন্য এই বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পঞ্চাশ জনের মতো আমাদের এই দলের যাচাই-বাছাইয়ের সময় আমার নাম আসতেই ডেপুটি জেলার সাহেব একটু বিশেষভাবে এবং গুরুত্বের সাথে আমার নাম ডাকলেন। আমার পিতার নাম বলার পর আর স্ত্রী বা মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করলেন না। অতঃপর একটি বিশেষ ডায়েরীতে আমার নাম, ঠিকানা ও তথ্য নোট করে রাখলেন।

এভাবে নাম, ঠিকানা মিলানোর পর ফটকের সামনে জড়ো করে তিনভাগে ফাইল দেয়া হলো। অর্থাৎ কাশিমপুরের তিনটি কারাগারের চালান এখানে। প্রত্যেক কারাগারের চালান আলাদা আলাদা ফাইল দিলো। আমাদেরকে

চালানের জন্য এভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকজন বন্দী ঢুকলো। যাদের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা সাঈদী সাহেবের ছেলে শামীম সাঈদী। শামীম ভাইয়ের সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো। আব্বাজান (রহ.) যখন বারডেম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ঐ সময় সাঈদী সাহেবকেও চিকিৎসার জন্য বারডেমে ভর্তি করা হয়েছিলো। তখন সেখানে একাধিকবার শামীম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত ও আলাপ হয়েছে। শামীম ভাইয়ের সাথে দূর থেকে ইশারায় কুশল বিনিময় করলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি তিনিও চালানে আমাদের সাথে কাশিমপুর যাচ্ছেন। এভাবে মাগরিবের পনের বিশ মিনিট আগে আমরা প্রিজন ভ্যানে উঠলাম।

ইতিপূর্বে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রিজন ভ্যান নামক প্রিজন ওভেনের যে বিবরণ দিয়েছিলাম, আজ ৩১ মে শুক্রবার মাগরিবের আগ মুহূর্তে কাশিমপুর যাওয়ার জন্য যেই প্রিজন ভ্যানটায় উঠলাম সেটা আগের বিবরণের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বড় বাসের মতো একটা ভ্যান। তিন দিকে বসার সিট। উপরে প্রায় দেড় ফুটের জানালা। দাড়ানোর সময় ধরার জন্য দুই সারিতে লোহার রড লাগানো। বাসের ছাদ বেশ উঁচু। অতিরিক্ত ভিড় নেই। আট-দশজন বাদে বাকি সবাই বসার সিট নিয়ে বসে পড়েছে। কাশিমপুর কারাগারের সবগুলো প্রিজন ভ্যানই এমন খোলামেলা ও বড় আকারের। দশ-বারো দিন কোর্টে এসেছি কাশিমপুর থেকে এবং তিনবার চালানে গিয়েছি ঢাকা থেকে। সর্বমোট কোর্টে যাতায়াতসহ বিশ-পঁচিশবার কাশিমপুরের প্রিজন ভ্যানে উঠেছি। কোন দিন মাত্রাতিরিক্ত বন্দী এক গাড়িতে তুলতে দেখিনি। পঞ্চাশ থেকে সর্বোচ্চ ষাটজন এক গাড়িতে উঠায়। এর বেশি হলে দুই গাড়ি নেয়। গাড়ির অপ্রতুলতা থাকলে লাইনের বাস ভাড়া করে বন্দীদেরকে আনা নেয়া করে। কিন্তু ঢাকা কারাগারের মত অমানবিক গাদাগাদি করে যাত্রী ভরে না। ঢাকা কারাগারের প্রিজন ভ্যানে উঠার পর কাশিমপুরের প্রিজন ভ্যানকে আরামদায়ক পরিবহনের গাড়িই মনে হয়েছে।

সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে আমরা যখন ভ্যানে উঠলাম। ভ্যানের দুই পাশে অনেক দর্শনার্থী দাড়ানো। যথারীতি শরীফও আছে। আল্লাহর এই বান্দা কারাগারের পূর্ণ সময়টায় আমার সাথে ছায়ার মতো লেগে থেকেছে। আমি যখন খুলনায় সেও খুলনায়। আমি ঢাকায় সেও ঢাকায়। আমি কাশিমপুরের পথে সেও কাশিমপুরের পথে। আমি কোর্টে সেও কোর্টে। আবার আমি যখন রিমান্ডে মিরপুর থানায় সেও মিরপুর থানায়। আমি চালানে খুলনা যাচ্ছি বা আসছি সেও

আছে আমার সাথে। আমি তো জেল খেটেছি নির্দিষ্ট জায়গায় অনিচ্ছায় বন্দি থেকে। আর শরীফ বন্দী না থেকেও আমার সাথে, আমার পাশে, আমার কাজে নিজেকে আবদ্ধ রেখে স্বেচ্ছায় কারাকে বরণ করেছে। এক হলো এই শরীফ। আরেক হলো (মাওলানা মুফতী) সাঈদ আহমদ। আমার আঠারোটি মামলার বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে সকাল-দুপুর-বিকাল অহর্নিশ ছুটে বেড়িয়েছে উকিলের পিছে পিছে। চেম্বার থেকে কোর্টে। আবার কোর্ট থেকে গারদে। কখনো বা জেলগেটে। আবার কখনো বা হাইকোর্টের আঙ্গিনায়। মামলা আমার বিরুদ্ধে। আর রাজ্যের সব উদ্বেগ, সব উৎকণ্ঠা সব দুশ্চিন্তা ভর করে সাঈদের মাথায়। কি অবিশ্বাস্য পরিশ্রম যে করেছে সাঈদ আর শরীফ তা এক আল্লাহই ভালো জানেন। আর কিছুটা উপলব্ধি করেছি আমি। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনিই যেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন

আরো দুজন আছে। যাদের ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। এক হলো খুলনার শহীদ ভাই। যিনি সোনাডাঙ্গা থানা থেকে নিজের মুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পর ওসি সাহেবকে বলেছিলেন– স্যার! আমাকে রেখে হুযুরকে ছেড়ে দিন। তার আবেগ ও উৎকণ্ঠার ছোঁয়া আমার হৃদয়ে আমি অনুভব করেছি। অপরজন কাশিমপুরের হুসাইন। বাড়ি যশোর। কিন্তু কাশিমপুরের কারাগারে আছে দীর্ঘদিন। যার বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিক সেবা আমার জেল জীবনকে সম্মানিত মেহমানের জীবনে পরিণত করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে এবং আরো জানা-অজানা যারা তোমার এই পাপী বান্দার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করেছে, দুশ্চিন্তা করেছে কিংবা দু' ফোঁটা চোখের পানি দিয়ে চির ঋণী করেছে তাদের সকলকে তুমি জাযা দান করো তোমার শান মোতাবেক।

শরীফ কাছের হোটেল থেকে সিঙ্গারা, সমুচা আর পুরি কিনে দিলো। প্রিজন ভ্যানের ছাদ লাগোয়া জানালা দিয়ে হাত বের করে নিয়ে নিলাম। আস্তে আস্তে যাত্রা শুরু করলো ভ্যান। নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে ভিআইপি রোডের দিকে চললো।

শামীম সাঈদী ভাই আর আমি এক সাথেই পাশাপাশি বসলাম। শামিম ভাইকে আগে যখন দেখেছি মুখে খোঁচা খোঁচা ছাটা দাড়ি ছিলো। এখন মুখ ভর্তি বড় বড় দাড়ি। এই সুন্নতী দাড়িতে তার অবয়বটাই অন্য রকম লাগছে। সুন্দর কাঁচ করা পাঞ্জাবি, মুখে সুন্নতি দাড়ি, মাথায় টুপি– সাঈদী সাহেবের সন্তান হিসাবে বেশ মানিয়ে যায়। যেতে যেতে অনেক কথা হলো। তাদের পরিবারের উপর দিয়ে একটা ঝড়ই বয়ে চলছে। বাবার বিরুদ্ধে ফাঁসির রায়। বড় ভাইটা

সেই শোকে হার্ট এ্যাটাক করে মারা গেলো। তিনিও আজ অনেক দিন যাবৎ কারাবন্দী। থানা থেকে রিমান্ড খেটে আসলেন। এরপরও যথেষ্ট স্বাভাবিকই আছেন বলে মনে হলো। পরিবার কীভাবে চলছে জানতে চাইলে বললেন, আল্লাহই দেখেন। ঘরের মহিলারা এই বিপদে পড়ে সব শিখে ফেলেছে। রিমান্ডে থানায় থাকাকালে ওনার স্ত্রী এসে সব খোঁজ-খবর নিয়েছেন। বললেন, ঘরের মহিলাদের উপরও অনেক মানসিক টর্চার চলছে। মাঝে মাঝেই বাসায় তল্লাশী করে পুলিশ। বললেন, ঘরের মহিলারাও এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পুলিশ বাসায় গেলে এখন আর ভয় পায় না। তারাই বলে– আসেন, আসেন। ঘর-বাড়ি দেখে যান। আরো অনেক কথা হলো। জেল জীবনের অনুভূতি বলতে গিয়ে বললেন, কিছুটা নির্জন কোলাহল মুক্ত পরিবেশে থাকি– জায়গাটা রাত্রে আল্লাহর দরবারে কান্নার জন্য খুব উপযুক্ত। চোখে খুব পানি আসে। ভবিষ্যত চিন্তা নিয়ে বললেন, আল্লাহ না করুন যদি সরকার তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ফেলে তাহলে আমাদের তো আর এদেশে থাকার পরিবেশ থাকবে না। আমি জানতে চাইলাম– কেন? বললেন, আসলে শুধু এক-দুইটা ফাঁসি দেওয়াইতো আর উদ্দেশ্য না। এটা তো শুরু। এরপর দেখা যাবে, এগুলো নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে। বানোয়াট সেই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমাদের সন্তানরা তাদের দাদার সেই ইতিহাস কিভাবে পড়বে। এদেশে আমাদের সন্তানরা পড়াশোনাও করতে পারবে না। কাজেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না।

গাড়ি ভিআইপি রোডে ওঠার পরই বসে বসে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে নিয়েছিলাম। শুক্রবারের সন্ধ্যায় ভিআইপি রোডে অন্য দিনের মতো না হলেও কিছুটা জ্যাম তো আছেই। শিবিরের ছেলেরা সম্মিলিত কণ্ঠে ইসলামী গানের কোরাস গাইতে আরম্ভ করলো। বন্দীদের প্রিজন ভ্যান থেকে এমন সম্মিলিত কণ্ঠের কোরাসে আশপাশের সব মানুষের দৃষ্টি খুব আকৃষ্ট হয়।

প্রিজন ভ্যানের সাথে এক গতিতে চলন্ত গাড়ির যাত্রীরা বিষয়টিকে খুব উপভোগ করে। আর ট্রাফিক জ্যাম বা সিগন্যালে তো কোন কথাই নেই। আশপাশের সব গাড়ির যাত্রীদের দৃষ্টি ও আগ্রহ নিবদ্ধ হয়ে থাকে আমাদের গাড়ির প্রতি। এটা শুধু আজকের একদিনের নয়; কাশিমপুর থেকে ঢাকা যাতায়াতের পথে আমাদের প্রিজন ভ্যানের নিয়মিত দৃশ্য এটি। এভাবে গজল গাইতে গাইতে দীর্ঘপথ সহজেই অতিক্রম হয়ে যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। পারিবারিক মজমাগুলোতে আমরা সবাই মিলে এমন কোরাস

গেয়ে খুব আনন্দ পাই। ভ্রমণের সময়েও এমন গজল গাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। তাই প্রিজন ভ্যানের এই বিষয়টি আমি খুব উপভোগ করেছি। শুধু উপভোগ্যই নয়, প্রিজন ভ্যানের বন্দীদের ব্যাপারে বাইরে থেকে মানুষের যে রকম একটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাপূর্ণ ধারণা থাকে কিংবা তাদেরকে করুণার পাত্র মনে করে– এই সম্মিলিত কোরাসের ধ্বনি আশপাশের সেই সকল মানুষের মধ্যেও ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়। তাদেরকে মানুষ অপরাধী ভাবার পরিবর্তে অত্যাচারিত ভাবতে থাকে। করুণার পাত্র ভাবার জায়গায় তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়। মানুষের চোখে-মুখেই শুধু এমন ভাবনা ফুটে উঠে না, বরং বহু মানুষ মুখের কথায় বা অঙ্গভঙ্গি দিয়ে প্রিজন ভ্যানের এসব উচ্ছ্বসিত তরুণদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ও তাদেরকে সাহস যোগায়।

প্রিজন ভ্যানে গজল গাইতে গাইতে অনেক সময় রুচির পরিবর্তনের জন্য ছেলেরা স্লোগানও ধরে। কখনো দলীয় স্লোগান। কখনোবা সরকারের জুলুম-নির্যাতন বিরোধী স্লোগান। অধিকাংশ সময় শাহবাগ চত্বর হয়েই যাতায়াত হয়। শাহবাগে আসলেই ছেলেদের মধ্যে ভিন্ন উত্তেজনা কাজ করে। এখানে নাস্তিক্যবাদ বিরোধী স্লোগান দেয়া হয়। সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার ঘটেছিলো ৬ জুলাইয়ের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগের দিন। ৫ জুলাই শুক্রবার দিন বিকালে আমরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে চালানে কাশিমপুর এসেছি। নির্বাচনের আগের দিন সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ। আমাদের প্রিজন ভ্যানটি টঙ্গী এলাকায় প্রবেশ করার পর থেকেই অধ্যাপক আ. মান্নান ও তার প্রতীক টেলিভিশনের পক্ষে সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে স্লোগান চলেছে। জ্যামের জায়গা ট্রাফিক সিগন্যাল আর বাজার পেলে তো কোন কথাই নেই। রাস্তার যানবাহনের সকল যাত্রী, পথচারী ও উৎসুক মানুষ অবাক বিস্ময়ে আমাদের প্রিজন ভ্যানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। প্রচারণার এই নিষিদ্ধ সময়ে প্রচার মিছিল করে কারা? রাস্তায় টহল রত বিজিবি সদস্যরা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু তাকিয়ে থেকেছে, করে কি এরা! কিন্তু তা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া তাদেরও করার কিছু ছিল না। পুলিশের স্কোয়াড দিয়ে আবদ্ধ এই গাড়ি। জেল গেটের আগে লকআপ খোলা হবে না। আর রাস্তার দু'পাশ থেকে টেলিভিশনের সমর্থকদের দু'হাত তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশের উপভোগ্য দৃশ্য তো ছিলোই। আমি যদিও স্লোগানে অংশ নেইনি কিন্তু পুরো ব্যাপারটিতে আমিও খুব মজা পেয়েছি।

যাই হোক, বলছিলাম ৩১ মে শুক্রবারের কথা। আমাদের গাড়ি কাশিমপুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নয়টা বেজে গেলো। কোনাবাড়ি থেকে আরেকটু অগ্রসর

হয়ে বা দিকে মোড় ঘুরে জেলখানা রোড। এই রোড ধরেই সোজা কাশিমপুর কারাগারের সংরক্ষিত এলাকার প্রধান ফটক। ফটক দিয়ে গাড়ি যখন কারাগার এলাকায় ঢুকলো, আমরা ঔৎসুক্য নিবারণে দাড়িয়ে গেলাম। প্রিজন ভ্যানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে গাছ-গাছালী শোভিত কাশিমপুরের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলে সামনেই প্রশস্ত পরিসর। পরিপাটি সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজি একটা সুন্দর প্রাকৃতিক আবহ তৈরি করে আছে। ফটক দিয়ে ঢুকে ডান দিকে মোড় নিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা এগিয়ে গেছে আরো বেশ খানিক দূর। এই রাস্তা দিয়ে সামনে গেলেই একে একে কারাগারের ফটকগুলো পড়বে। কিন্তু মূল কারাগারের আগেই বিশাল এরিয়া। যেখানে স্টাফ কোয়ার্টার গড়ে তোলা হয়েছে। আছে স্টাফদের পরিবার নিয়ে থাকার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, স্কুল, চিকিৎসা কেন্দ্রসহ আনুষঙ্গিক আরো কিছু স্থাপনা। সংরক্ষিত এই এলাকার পরিবেশ মনোরম, নিরিবিলি।

কাশিমপুরে একই সীমানা ঘেরা দেয়ালের মধ্যে একটি নয় বরং একে একে চারটি কারাগার। মেইন গেইট দিয়ে ঢুকে দুটি বাঁক ঘুরে সামনে বেশ খানিক অগ্রসর হলে সর্বপ্রথম পড়বে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার– ২। হাতের ডানে কারাগার– ২ এর গেইট। কারাগার– ২। পেছনে ফেলে আরেকটু অগ্রসর হলে হাতের বামে পড়বে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার– ৩। এটি মহিলা কারাগার। এখানে শুধু মহিলা বন্দীদেরকে রাখা হয়। একই পথ ধরে আরো অগ্রসর হলে মুখোমুখি পড়বে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার– ১। কারাগার– ১ থেকে প্রথমে ডানে ও পরে বামে দুটি মোড় ঘুরে একটু অগ্রসর হলে পড়বে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার বা কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার– ৪। একই সীমানা প্রাচীরের মধ্যে হলেও এখানে ভিন্ন ভিন্ন চারটি কারাগার। প্রতিটি কারাগারের বাউন্ডারী দেয়াল ও সকল অবকাঠামো যেমন ভিন্ন ভিন্ন, জেল সুপার ও জেলারসহ পূর্ণ প্রশাসনও আলাদা। দেশের অন্যান্য কারাগারে মহিলাদের জন্য একটা পৃথক ওয়ার্ড এলাকা থাকে। কিন্তু কাশিমপুরে কেন্দ্রীয় কারাগার– ৩ একটি ভিন্ন ও পূর্ণাঙ্গ মহিলা কারাগার। আর বাকী তিনটি কারাগার হলো শুধু পুরুষদের জন্য। এগুলোতে মহিলাদের কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের বহনকারী প্রিজন ভ্যানটি প্রথম এসে থামলো ২নং কারাগারের ফটকের সামনে। স্কোয়াডের পুলিশ কাস্টডির নাম বলে বলে বন্দীদেরকে নামিয়ে নিতে লাগলো। অধিকাংশ বন্দী নেমে গেলো। শামীম সাঈদীও নেমে গেলেন। মুসাফাহা করে দুআর অনুরোধ করে বিদায় দিলাম তাকে। এরপর থামলো ১নং কারাগারের গেটে। সেখানেও বেশ কিছু নেমে গেলো। সর্বশেষ আমরা থাকলাম বারো-চৌদ্দজন। আমাদেরকে

নিয়ে গাড়ি এসে থামলো হাই সিকিউরিটি কারাগারের ফটকের সামনে। আমরা একে একে কারা ফটকে মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকলাম। গেইট তল্লাশি, নাম, পিতার নাম সহ কাষ্টডির সাথে আসামী মিলিয়ে নেয়ার কাজ সেরে আমাদেরকে কারাগারে ঢুকানোর পালা। সারিবদ্ধ সবাই একে একে ভিতরে ঢুকছে। পাশে দাড়িয়ে কারারক্ষী গুণে চলছে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ । আমার পালা এলে আমিও কারাভ্যন্তরে প্রথমে বাম পা রাখলাম ।

কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার

রাতের অন্ধকারেও হালকা হালকা আলোতে চারদিক পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। মেইন ফটক দিয়ে ঢুকার পর গাড়িতে থেকেই কারাগারের বহিরাঙ্গণের খোলামেলা ও প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ দেখেছি। এখন হাই সিকিউরিটি কারাগারে ঢুকে পায়ে হাটা পথে ধীরে ধীরে পা ফেলছি আর এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে মনের মধ্যকার জমে থাকা কৌতুহল নিবারণ করছি। ডানে বামে বছর খানেক পূর্বে রোপন করা বাড়ন্ত গাছগুলোর ঝির ঝির বাতাস মনের মধ্যে একটা শিহরণ ঠিকই সৃষ্টি করছে। চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফেরালেই বোঝা যায় যথেষ্ট পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এই কারাগার। চার-পাঁচ মিনিট হাটার পর চন্দ্রা ভবন এলাকায় পৌঁছলাম। ভবনের গায়ে বড় বড় অক্ষরে 'চন্দ্রা' লেখা দেখেই আমার মনে পড়লো, এটাইতো আমার ইপ্সিত গন্তব্য। রাতে থাকার জন্য চন্দ্রার এক তলায় নিয়ে গেলো। এক রুমে তিনজন করে থাকার ব্যবস্থা। তিনজনের খাবার, প্রতিজনের জন্য তিনটি করে কম্বল, একটি করে থালা ও একটি করে বাটি আগে থেকেই রুমের মধ্যে প্রস্তুত করে রাখা ছিলো। আমাদের সাথে একজন লোক ছিলো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল গেটেই তাকে যথেষ্ট শিয়ানা পাবলিক বলে মনে হয়েছিলো। সে কারাগারে ঢুকেই এখানকার যে কারারক্ষী ওস্তাদ আছে তাকে পটিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি। রুম নির্বাচন করার সময় আমি তার রুমে ঢুকলাম। তার নামটা এখন আর স্মরণ নেই। তবে সে সুইডেন আসলামের ঘনিষ্ট পরিচিত লোক। সুইডেন আসলাম এই কারাগারেই আছে। সে তার কাছে যাওয়ার জন্য সিস্টেম করে ফেলেছে। আগামী কালকেই সেখানে চলে যাবে। আমার গন্তব্যও তো আমার মুখস্ত আছে। 'হুসাইন, চন্দ্রা ৫ তলা।' আমিও সেই সুযোগের অপেক্ষায় রাত কাটানোর প্রস্তুতি নিলাম। ইস্তিঞ্জা-অযু সেরে বিছানায় দাড়িয়েই ইশার নামায আদায় করলাম। সামান্য খাবারও খেয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে আমার রুমের অপর দুই সাথী ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি সবার পরে ঘুমানোর জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। এই হলো, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটির আমদানী। শুয়ে শুয়ে

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের আমদানীর বিভীষিকাময় অবস্থার কথাও মনে পড়লো। আলহামদুলিল্লাহ শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গলো কিন্তু কোন ঘড়িও নেই। সময় জিজ্ঞাসা করার মতো কোন লোকও নেই। সংক্ষিপ্ত তাহাজ্জুদ পড়ে বিছানায় বসে কুরআন তেলাওয়াত করলাম। আশপাশ থেকে ফজরের আভাস পেয়ে ফজরের নামায পড়ে নিলাম। ফজরের কিছুক্ষণ পর একজন কারারক্ষী এসে গত রাতে আগত আমাদের সবাইকে বললো কেইস টেবিলে যেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসুন। কিছুক্ষণ পর আমরা সবাই বের হয়ে কেইস টেবিলের দিকে পা বাড়ালাম।

দিনের আলোতে আরেকবার ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে হাই সিকিউরিটি কারাগারটা দেখলাম। সুন্দর সুপরিকল্পিতভাবে গড়া। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সেরা এই কারাগারটি। দেশের সর্বশেষ চালু হওয়া কারাগারও এটি। স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এখানে।

প্রধান ফটক দিয়ে হাই সিকিউরিটি কারাগারে ঢুকলেই হাতের ডান দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ফুল বাগান আর সোজা পথে হাতের বামে ফলের বাগান। ফুল বাগানে সবুজ সাইন বোর্ডের সাদা অক্ষরে লেখা আছে 'রোজভ্যালী' আর ফলবাগানে আছে একইভাবে 'ফ্রুটসভ্যালী'। পায়ে হাটার লেনের পাশেই একটি সবুজ সাইন বোর্ডে কারাগার জুড়ে রোপিত গাছের একটা পরিসংখ্যান দেয়া আছে। সাইন বোর্ডে দেয়া তথ্য অনুযায়ী হাই সিকিউরিটি কারাগারে ১. ৫. ২০১২ তারিখে রোপিত বৃক্ষরাজির বিবরণ নিম্নরূপ–

কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রোপিত গাছের বিবরণ–

রোজভ্যালী

গোলাপ – ৫০

চেরি– ৬০

দিলবাহার– ১০

ক্রিসমাস ট্রি– ৫

হাসনাহেনা– ১০

ফ্রুটসভ্যালী

ফলজ

কাঠাল– ১২০

লিচু– ২০

আম্রপালি– ১১০

নারিকেল– ৭৫

দেশী ফল– ২০

সফেদা– ২০

কামরাঙ্গা– ২০

লটকন– ১৫

জামবুরা– ২০

কাজী পেয়ারা– ৪০

থাই পেয়ারা– ৪০

জাবেবাটি কাবা– ১৫

লাল জামরুল– ৪০

এ্যাভোকাডো– ২০

ঔষধি

বহেরা– ৪০

আমলকি– ৪০

অর্জুন– ৪০

নিম– ২৫

হাই সিকিউরিটি কারাগারের হালচিত্র

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কারাগারটির অবস্থান। পূর্ব দিকের অনেকটা মাঝ বরাবর প্রধান ফটক। এরপর আড়াআড়িভাবে সমান তিনটি ভাগে বণ্টিত। সর্ব পশ্চিমের অংশে পাশাপাশি দক্ষিণমুখী করে ছয়তলা বিশিষ্ট ছয়টি ভবন নির্মিত। দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে ভবনগুলো হলো গাজী, চন্দ্রা, তিতাস, ভাওয়াল, তমাল ও হিমেল। মাঝের অংশে দক্ষিণ প্রান্তে শুধু একটি ভবন– নীলগিরি। নীলগীরির উত্তর দিকে চৌকা ও গোডাউন। এর উত্তরে বড় একটি উন্মুক্ত পরিসর। সেখানে আপাতত সব্জি চাষ করা হয়। এর উত্তরে একটি ছোট্ট তিন তলা ভবন 'দর্পণ'। নরসুন্দর তথা চুল কাটার কাজ করা হয় এই ভবনের প্রথম তলায়। এর উত্তর দিকে হাসপাতালের এক তলা ভবন। আর এক পাশে ফাঁসির মঞ্চ। আর পূর্ব পাশের অংশে পাশাপাশি তিনটি ভবন। দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে শতাব্দী, শৈবাল ও সৈকত। আর উত্তরে এক তলা একটি ভবন 'বিলাস'। বিলাস ভবনটি

নির্মিত মূলত বন্দীদের কাপড়-চোপড় ধোয়ার উন্নত মানের ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু এই বিলাস এখন কেইস টেবিল, লাইব্রেরী আর স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাপড় ধোয়ার কাজ হয় না। বিলাস-এর উত্তর দিকে একটি তিনতলা ভবন 'উত্তরা'। উত্তরার প্রথম তলায় হাসপাতালের রোগীরা থাকে। আর অবশিষ্ট দুই তলায় চারটি ওয়ার্ড। ওয়ার্ডগুলোতে কয়েদী বন্দীরা থাকে। প্রধান ফটকের উত্তর দিকে বাউন্ডারী প্রাচীর সংলগ্ন সাক্ষাৎরুম। বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাতের জন্য তিন স্তরের লোহার জালি তৈরি করা আছে। আনুমানিক দুই ফুট দূরত্বের তিন লোহার জালির অপর প্রান্ত থেকে আপনজনের সাথে কথা বলার সুযোগ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পনের দিন অন্তর অন্তর পাওয়ার কথা। তবে বিশেষ বিবেচনায় আরো ঘন ঘন সাক্ষাতও করা যায়।

হাই সিকিউরিটির মূল ভবন হিসাবে প্রথমোক্ত দশটি ভবনকেই ধরা হয়। পূর্ব বর্ণনার উল্টো দিক থেকে যথাক্রমে সৈকত, শৈবাল, শতাব্দী, নীলগিরি, গাজী, চন্দ্রা, তিতাস, ভাওয়াল, তমাল ও হিমেল। প্রতিটি ভবন ছয় তলা বিশিষ্ট। প্রতিটি তলায় পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ব্লক। মধ্যখানে সিড়ি। পূর্ব ব্লকে রুম সাতটি। আর পশ্চিম ব্লকে আটটি। পূর্ব-পশ্চিম উভয় ব্লক মিলে পনেরটি করে রুম প্রতি তলায়। এই রুমগুলোই মূলত হাই সিকিউরিটির মূল বন্দীদের জন্য। সেই হিসাবে প্রতিটি ভবনে (৬ × ১৫ = ৯০) নব্বইটি রুম।

এছাড়াও প্রতিটি তলায় সিড়ি বরাবর দুটি করে অতিরিক্ত রুম আছে। এখন এ রুমগুলো দিনের বেলা শুধু ব্লকের সেবকের দায়িত্বে থাকা কয়েদীরা ব্যবহার করে। প্রতিটি ভবনে এমন রুম আছে (৬ × ২ = ১২) বারোটি। দশ ভবনে একশত বিশটি। মূল সেল রুমের সাথে যুক্ত করলে হাই সিকিউরিটির সেল সংখ্যা দাড়ায় এক হাজার বিশটি। প্রতিটি রুমই একটি করে সেল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ মোষ্ট ওয়ান্টেড শীর্ষ সন্ত্রাসী ও এ জাতীয় সেলে আটকে রাখার মতো আসামীদের জন্যই আসলে হাই সিকিউরিটি কারাগার নির্মিত। প্রতিটি রুম বা সেল পনের ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রশস্ত। সাড়ে তিন ফুটের লোহার শিকের একটি দরজা দক্ষিণ দিকে। আর উত্তর দিকে একটি জানালা। রুমের ভিতর কোণে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান পাঁচ ফুটের একটু করে একটি বাথরুম। সাড়ে চার ফুট উচ্চতার দেয়াল ঘেরা এই বাথরুমের মেঝে ও দেয়াল টাইলস ফিটিং করা। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ব্লকে ৫ ফুট প্রশস্থ লম্বা টানা বারান্দা। পশ্চিম ব্লকের বারান্দাটা আট ফুট পরিমাণ বেশি দীর্ঘ। কারণ সেখানে রুম একটি বেশি– আটটি। এই বারান্দাই ব্লকের আসামীদের জগত।

যেই ধরণের আসামীদের জন্য এই হাই সিকিউরিটি কারাগার নির্মিত, সেই জাতীয় আসামী সম্ভবত অপ্রতুল। তাই এখানে এখন অধিকাংশই সাধারণ হাজতী আসামী। বর্তমানে সাধারণভাবে প্রতিটি সেলে থাকে তিনজন করে আসামী। কোথাও কমও আছে। এখন যারা এখানে আছে এদেরকে একা পৃথক সেলে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া একা থাকা অধিকাংশ মানুষের জন্যই কঠিন হবে। আসামীদের সেবা পৌছাতেও বেশি বেগ পেতে হবে। এখন একটি ব্লকে গিয়ে ২১ জন আসামীর খাবার দিয়ে আসা যায়। পৃথক পৃথক সেলে একজন করে রাখলে ২১ জনের সেবা পৌছাতে তিনটি ব্লকে যেতে হবে। এ সকল কারণে সেল প্রতি তিনজন করে আসামী রাখা হয়। বিশেষ কেউ যদি স্বেচ্ছায় একা ভিন্ন সেলে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করে, সেটারও সুযোগ আছে।

এখানে প্রতিটি ভবনের ভিন্ন বাউন্ডারী আছে। বাউন্ডারীর ভিতরেই বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে বৃক্ষ রোপন করা আছে কিছু। আর বাকী সব্জি চাষ করা হয়। পূর্ণ কারাগারই আনুমানিক পনের ফুট উঁচু প্রাচীর ঘেরা। সেই বাউন্ডারী প্রাচীরের উপর তিন ফুটের মতো বৈদ্যুতিক তারের বেড়া। বাউন্ডারী প্রাচীরের দশ ফুট ভিতরে আবার আনুমানিক দশ ফুট উঁচু লোহার গ্রীল দিয়ে তৈরি আরেকটি বাউন্ডারী। এভাবে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা কারাগারের প্রতিটি ভবন এরিয়ায় সি. সি. ক্যামেরা লাগানো। প্রতিটি ব্লকে আবার লাগানো আছে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক অকেজো করার যন্ত্র 'হ্যামার'। (যদিও অনেক জায়গাতেই এখন এই সি. সি. ক্যামেরা ও হ্যামার নষ্ট বা অকেজো পড়ে আছে।) সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বলয়ে গড়া কারাগারটির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো। সব মিলিয়ে সুন্দর ও প্রাকৃতিক আবহ এখানে বিরাজমান।

আমরা কেইস টেবিলে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মুখোমুখি হলাম আবার সেই বিব্রতকর জেলার ফাইলের। এতো সুন্দর ও আধুনিক মানের একটি কারাগার। অথচ জেলার ফাইল দেওয়ার নিয়ম সেই অসভ্য আদিম বর্বর যুগের মতোই। মাটিতে দু' পায়ের উপর ভর করে বাথরুম করার মতো পাঁচজন করে লাইন দিয়ে বসতে হবে। বেশির চেয়ে বেশি লেটকি দিয়ে মাটির উপর বসা যেতে পারে। জেলার সাহেব আসার আগ পর্যন্ত এইভাবে ক্রমিক সাজিয়ে বসে থাকতে হবে। আমি অবশ্য এভাবে বসে থাকি না। সিরিয়ালের জায়গায় সোজা দাড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। এরপর সরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করি বা বসার টেবিল থাকলে বসে পড়ি। আমাকে একটু সমীহ করে বলেই এটা সম্ভব হয়। এরপর

যখন জেলার সাহেব আসেন তখন গিয়ে ফাইলে বসি। এখানে কেইস টেবিলের ভবন বিলাস-এ একটা জায়গা ঘেরাও দিয়ে নামাযের জন্য নির্ধারণ করা আছে। আমি সেখানে গিয়ে চার রাকাত সালাতুদ্দোহা আদায় করে নিলাম এই ফাঁকে। ইতিমধ্যে একজন কয়েদী (শামছু ভাই– আমাদের ব্লকের সেবকের দায়িত্বে যার কামপাশ) একটা বাটির মধ্যে চিড়া-দুধ-কলার নাশতা নিয়ে আসলেন। আমার না দেখা সেই হুসাইন চন্দ্রা পঞ্চম তলা থেকে পাঠিয়েছে। আমি নাশতা করতে লাগলে সেখানে আরেকজন কারারক্ষী নাশতা করার জন্য আসলেন। শশ্রুমণ্ডিত দ্বীনদার আবদুল কাদের কারারক্ষী খিচুড়ি নিয়ে এসেছেন। আমরা একে অপরের নাশতায় শেয়ার করলাম। কিছুক্ষণ পর জেলার ফাইল হয়ে গেলো। হেলথ পাশও হলো। ৫ ফুট দশ ইঞ্চির উচ্চতা ও বয়স মুখস্তই লেখানোর পর ওজন মাপার মেশিন দেখে সেটা প্র্যাকটিক্যাল করলাম। মেশিনে উঠে দেখি ওজন হয়ে গেছে 'চুরাশি কেজি'। আগে যখন মেপেছি তখন ছিলো আশি বা উনাশি। তার অর্থ জেলখানায় বসে বসে খেয়ে আর ঘুমিয়ে পাঁচ কেজি ওজন বাড়িয়ে ফেলেছি।

জেলার ফাইল শেষ হলো। দুই-তিন ঘণ্টা পর হবে সুপার/সাহেব ফাইল। জেলখানার বস হলেন জেল সুপার। তাই তিনিই এখানকার সাহেব। সাহেব ফাইলের আগে আসামীদেরকে কেতা দুরুস্ত (قطع درست) করা হয়। চুল-দাড়ি-গোফ-নখ ইত্যাদি কাটছাট করার জন্য আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো 'দর্পণ' নামক ছোট্ট একটি তিনতলা ভবনে। নিচ তলায় নরসুন্দরের কাজ করা হয়। কয়েদীদের মধ্যে যাদের কামপাশ নরসুন্দর দফা, তারা এ কাজ করে। এখনো বেশ সকাল। আমরা সেখানে অপেক্ষমান। নরসুন্দরকারীরা কেউ এখনো আসেনি। আমরা ঐ ভবনটাই ঘুরে ফিরে দেখছি। আমি সিড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ছাদের সিড়িকোঠায়। ছাদের গেট স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ। সিড়ি কোঠার নিরব নির্জন জায়গা পেয়ে জানালার গ্রীলের ফাঁকে শালিক পাখি বাসা বেঁধেছে। আমাকে দেখে পাখি উড়ে গেলো। উঁকি দিয়ে দেখি পাখির বাসায় দুটি ডিম। শুধু দেখলাম। ধরলাম না। অযথা পাখির বাসায় তার সংসারে হস্তক্ষেপ করার কী দরকার!

নরসুন্দরকারীরা এসে পড়লো। আমার চুল বেশি বড় না। তাই চুল কাটার দরকার নেই। আর গোঁফ আমি অন্যকে দিয়ে কাটাই না। আমার গোঁফ আমি আমার মতো করে কাটি। আমার ধারণা আমার গোঁফ কাটা অনেক সুন্দর হয়। নাঈম-মাসনুন ওরাও এ কথায় সায় দেয়। নিজের গোঁফ নিজে কাটার সময় যখন প্রয়োজন ঠোট শক্ত করতে হয়, মুখ ফোলাতে হয়। মাসনুনের বিয়ের সময় আমি

ওর গোঁফ কেটে-ছেটে দিয়েছিলাম। সুন্দর হয়েছিলো কিন্তু ঠোট শক্ত করা আর মুখ ফোলানোর কাজ নিজের মতো অন্যেরটা ব্যাটে-বলে হয় না। তাই ওর ঠোঁট একটু কেটে গিয়েছিলো। সমস্যা হয়নি, আফটার সেভ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। নিজের গোঁফ নিজে কাটাই ভালো। তাছাড়া অন্য আরেকজন আমার ঠোটে-মুখে হাত লাগাবে, তাও বাম হাত– এটাও ভালো লাগে না।

আমি চুল কাটবো না বলে মনস্থির করেছি। কিন্তু একজন নরসুন্দরকারীর সাথে পরিচয় হলো। নাম তার তোজাম্মেল। বাড়ি টাঙ্গাইল। আলাপচারিতায় সে আমার পরিচয় পেয়ে তের বছর আগের স্মৃতিচারণ করলো। ২০০১ সাল। তখন সে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলো। আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) সেই সময় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গেলে প্রথমে যেই ওয়ার্ডে দেয়া হয়েছিলো, সেই ওয়ার্ডেই ছিলো এই তোজাম্মেল। সে আফসোস করে সেই সময়ের কিছু দুঃখজনক স্মৃতিও রোমন্থন করলো। সুযোগ পেয়ে সে আব্বাজানের খেদমত করেছিলো, এমনকি তখন সে তার চুলও কেটে দিয়েছিলো। এই কথা শুনে আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। ঠিক করলাম তোজাম্মেলকে দিয়ে চুল কাটাবো। তোজাম্মেল আমার চুল কেটে দিলো। আর চুল কাটতে কাটতে তোজাম্মেল দুঃশাসনের কারাগারে বন্দী শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর কারা জীবনের আরো কিছু দুঃসহ স্মৃতির কথা বললো। তোজাম্মেল পরে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে।

বন্দী সব কেতা দুরস্ত হওয়ার পর জানা গেলো আজকে জেল সুপার আসবেন না। অতএব সুপার/সাহেব ফাইলও হবে না। আমাদেরকে আমাদের আমদানীতে ফিরিয়ে আনা হলো। সেখান থেকে মাল-সামান আর থালা-বাটি-কম্বল নিয়ে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত লক-আপে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হলো। হুসাইন তো আমার লকআপ তার রুমে করিয়ে রেখেছিলো। আমরা যখন চন্দ্রা প্রথম তলার আমদানীতে ফিরে আসছিলাম তখনই চন্দ্রা চতুর্থ ও পঞ্চম তলার সবাই আমাদের দিকে দেখছিলো। হাতের ইশারা বিনিময়ও হলো। আমাকে চন্দ্রা পঞ্চম তলায় নেয়ার পথে চতুর্থ তলার গেইটে দাড়িয়ে ছিলেন আমাদের আবু তাহের ভাই। আবু তাহের ভাইয়ের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে হওয়া এই সাক্ষাত ছিলো আমার জন্য একটি সারপ্রাইজ! আবু তাহের ভাই বললেন, ওনাদের চার তলায় নাকি আমাকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারও বেশ আগ থেকেই হুসাইন আমাকে তার ওখানে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। হুসাইনকে আমি এখনো মনে করতে পারছি না,

ওদিকে আবু তাহের ভাই হলেন আমাদের দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ট মানুষ। এরপরও আমি আবু তাহের ভাইয়ের উপর হুসাইনকেই প্রাধান্য দিলাম। কারণ আমাকে এখানে আনার জন্য তার প্রচেষ্টার খবর ঢাকা কারাগার থেকেই পাচ্ছিলাম। আবু তাহের ভাইকে বললাম, আপাততঃ যাই ওখানে। পরে দেখা যাবে। এভাবে চতুর্থ তলা অতিক্রম করে পঞ্চম তলায় উঠলাম। আবুল বাশার সাহেবসহ হুসাইন ও অন্যরা গেইটেই অপেক্ষমান ছিলো। প্রতীক্ষিত হুসাইনকে দেখলাম। চৌদ্দ বছর আগের দেখা ছাত্রকে পুরাতন স্মৃতিতে মনে করতে না পারলেও গত কয়েক দিনের নতুন করে পাওয়া হুসাইনের পরিচয়ই আমার যথেষ্ট পাওয়া ছিলো। গেইট থেকেই ব্যাগ-বোচকা হাতে নিয়ে নিলো হুসাইনরা। আর থালা-বাটি-কম্বল নিয়ে তো পিছনে পিছনে সেবক আছেই। এভাবেই গিয়ে পৌঁছলাম, আমার নির্ধারিত গন্তব্য চন্দ্রা পঞ্চম তলার ৪ নং রুমে।

চন্দ্রা পঞ্চম তলার চার নম্বর রুম

অপূর্ব, অসাধারণ, নয়নাভিরাম পরিপাটি করে সাজানো একটি রুম। সখ ও রুচিশীলতার মাধুরি মিশিয়ে রুমটিকে অনিন্দ্য সুন্দর করে সাজিয়েছে হুসাইন। সৌখিন মানুষ রুচিশীল অথবা রুচিশীল মানুষ সৌখিন হলে ভাঙ্গা কুড়ে ঘরকেও অপরূপ করে সাজিয়ে রাখে। সখ ও রুচিশীলতার সাথে বিলাসিতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। সখ-রুচিশীলতা আর বিলাসিতার মাঝে 'আম-খাস মিন ওয়াজহিন এর নিসবত, তালাযুমের নিসবত নয়।

আমিও অনেক পরিপাটি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা মানুষ। তবে হুসাইন আমার চেয়েও অনেক বেশি এক্সিলেন্ট। কারাগারে তার এ রুমটির সামনে আসলে আগন্তুকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। শুধু আকৃষ্টই হবে না; নিশ্চিতভাবেই কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি আটকে থাকবে। অথচ বিলাসদ্রব্য তো দূরের কথা আহামরি বা অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুই এখানে নেই। মূল থাকার জায়গা দশ ফুট বাই আট ফুট স্পেসটুকুতে সুন্দর মাপ মতো একটি ফ্লোরম্যাট বিছানো। আর পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট জানালা ও বাথরুমের সামনের জায়গাটায় মানানসই আরেকটা ম্যাট। ম্যাটের উপর রুমে ঢুকার সময় পরিমাপ মতো লাল রঙ্গের একটা প্ল্যাষ্টিক ম্যাট পাপোস। পায়ের ধুলা-ময়লা আটকাতে খুবই উপযোগী পাপোস এটি। আবার বাথরুমের সামনে একটি কাপড়ের পাপোষ। তার উপর পাতলা একটা ছোট তোয়ালে বিছানো। যেনো বাথরুমের ভেজা পা রুমে আসতে শুকিয়ে যায়। বোতল-কৌটাসহ টুকিটাকি জিনিস আর বই-কিতাব ও কুরআন শরীফ রাখার জন্য আছে দুটি প্লাষ্টিক র‍্যাক। দেয়ালের দর্শনীয় একটি জায়গায় আছে একটি

দেয়াল ঘড়ি। কাপড়-চোপড় রাখার জন্য রুমের দুই কোণে দু'টি ওয়াল হ্যাঙ্গার লাগানো। জিনিসপত্র বহন করার ব্যাগগুলো রুমের এক দিকে সারিবদ্ধ ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিস সেটা হলো– এখানে যেহেতু ফ্লোরিং ব্যবস্থা। ফ্লোরেই থাকতে হয়। তাই বসার সময় দেয়ালে হেলান দিলে দেয়ালের চুন রং উঠে কাপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য বসার জায়গা বরাবর অনেকেই কোন পেপার বা পলিথিন কাগজ আঠা দিয়ে দেয়ালের সাথে সেটে দেয়। কিন্তু হুসাইন তার রুমে চারদিক ঘুরিয়ে সুন্দর সুন্দর সব সিনারী লাগিয়ে দিয়েছে। বাহারি সিনারির নান্দনিকতা রুমটিকে দারুন শোভা দান করেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত চৌদ্দটি সিনারি পেপার কিনতে সাকুল্যে পাঁচশ-সাড়ে পাঁচশ টাকার মামলা। আর বাকি ম্যাট, র‍্যাক ও পাপোস হয়তো দেড়-দুই হাজার টাকার ব্যাপার। এই সামান্য খরচে একটি সুন্দর ও সৌখিন পরিবেশ হয়ে গেছে। আসলে এটা টাকা দিয়ে হয়নি, হয়েছে সখ ও রুচি দিয়ে।

এই সুন্দর ও পরিপাটি রুমটিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা। এখানে হুসাইন থাকে। আর হুসাইনের সাথে আছে নিযামুদ্দীন। নিযামুদ্দীনের বাড়ি ফরিদপুর। এক সময় রাহমানিয়া হাকীকিয়া মাদরাসায় আমাদের কাছে পড়েছে। হাকিকিয়ার আরাফার ময়দানের ইমাম ছিলো সে। আর আমার সপ্তাহ খানেক আগে এখানে হুসাইন তার আরেক উস্তাদ আবুল বাশার সাহেবকেও আনিয়েছে। আর সর্বশেষ আসলাম আমি। স্বাভাবিকভাবে প্রতি রুমে তিনজন করে থাকলেও এই রুমে আমি আসার আগেও চারজন ছিলো। উপরোক্ত তিনজনের সাথে হেফাজতের মামলায় আটক রফিক নামে একটা ছেলে ছিলো। আমি আসাতে রফিককে পাশের রুমে দেয়া হলো। পরে অবশ্য রফিক জামিনে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে।

হাই সিকিউরিটি কারাগারে আমার দিন-কাল

এখানে আসলাম ৩১ মে শুক্রবার রাতে। পরদিন শনিবার ১ জুন পঞ্চম তলার ৪ নম্বর রুমে আমার লকআপ নির্ধারিত হলো। সেই থেকে অদ্যাবধি প্রায় দুই মাস এখানেই আছি। মাঝখানে অবশ্য অল্প অল্প সময়ের জন্য দু'বার খুলনা ও একবার রিমান্ডে গিয়েছি। সেটা বাদ দিলে প্রায় পঞ্চাশ দিন সময় আমার এখানেই কাটছে।

এখানে যখন প্রথম আসলাম তখন এখানে জামেউল উলূম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল বাশার নোমানী সাহেবও ছিলেন। আমি ২০০০ ও

২০০১ সালে দুই বছর জামেউল উলূমে শিক্ষকতা করার সুবাদে মাওলানার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো। শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর সন্তান হিসেবে তিনি আমাকে বিশেষ মহব্বত করেন। মাওলানা আবুল বাশার সাহেব নরম মানুষ। আন্দোলন-সংগ্রামের সক্রিয় কোন লোক নন। মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। এখন প্রিন্সিপাল। আর মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। নেহায়েত ঈমানী দায়িত্ব পালনের কর্তব্যবোধ থেকে হেফাজতে ইসলামের ঈমানী আন্দোলনে কাফরুল থানার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু হেফাজতের ৫ মের অবরোধ বা অবরোধ পরবর্তী শাপলা চত্বরের মহা সমাবেশ কোথাও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন না। পেছন থেকে যতটুকু পেরেছেন সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু জামেউল উলূমের পার্শ্ববর্তী মাদরাসা দারুল উলূম মিরপুর- ১৩ মাদরাসার মাহফিলে স্থানীয় আওয়ামী এমপি কামাল মজুমদার হেফাজত বিরোধী বক্তব্য দিতে গিয়ে শ্রোতাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হলে ব্যাপারটি মিরপুর- ১৩ মাদরাসা কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে পড়ে। তারা সরকার দলীয় এমপি'র রোষানল থেকে বাঁচতে গিয়ে দায় অস্বীকার করেন। বলেন, ঘটনার সাথে আমাদের মাদরাসার ছেলেরা জড়িত নয়। আশপাশের মাদরাসার ছেলেরা করে থাকতে পারে। মূলত সে দিনের সেই এমপি লাঞ্চনার ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট কোন মাদরাসার ছাত্ররাই জড়িত ছিল না। বরং সেটি ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত জনতা ও ছাত্রদের উপস্থিত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পার্শ্ববর্তী দুই মাদরাসার দুই প্রিন্সিপাল যথাক্রমে জামেউল উলূমের মাওলানা আবুল বাশার নোমানী আর খাদেমুল ইসলামের মুফতী ইমরান মাযহারী গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর আবুল বাশার সাহেব মিরপুর থানা-কোর্ট-রিমান্ড-ঢাকা কারাগার হয়ে এখানে হাই সিকিউরিটিতে এসেছেন। আর ইমরান মাযহারী সাহেব এসেছিলেন কাশিমপুর- ২ কারাগারে।

আমি এসে দেখি আবুল বাশার সাহেব মন মরা-আতঙ্কগ্রস্ত। তার গ্রেফতারের পর মাদরাসা ও মসজিদ উভয় জায়গায় একটি মহল চক্রান্ত করছে- ইত্যকার বিষয় নিয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনি। তাছাড়া হেফাজতে ইসলামের ঘটনা নিয়েও বেশ হীনমন্যতার শিকার হয়ে আছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলেই ফেললেন, ৫ মের কর্মসূচি অবরোধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে, শাপলা চত্বরে সমাবেশ না করলে আমাদের এত বদনাম হতো না। হেফাজতে ইসলামের ইমেজটা রক্ষা পেত। এই রকম চলমান বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। আমি বলেছি- শাপলা চত্বরের ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের কিছু ভুল থাকতে পারে কিন্তু আওয়ামীলীগের ভুলের তুলনায় সেটা কোন ভুলই নয়। হেফাজত লক্ষ

লক্ষ মানুষ নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। অবস্থান কর্মসূচি হলো সবচেয়ে দুর্বল ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি। সহিংসতা হয়েছে দিনের বেলায়। সেটাও শাপলা চত্বরে নয়। অন্যান্য স্থানে। এই অজুহাতে শেষ রাতের ভুতুড়ে অন্ধকারে ফেলে লাখো মানুষের সমাবেশে গুলি চালানোর মতো অন্যায় ও বর্বর আচরণ আর হতে পারে না।

এখন মনে হচ্ছে বদনাম হেফাজতের হয়েছে? আমি অত্যন্ত আস্থার সাথে বললাম, আওয়ামীলীগ নিজের পায়ে যেভাবে নিজেই কুঠারাঘাত করেছে, এই ক্ষতি পুষতে আওয়ামীলীগের পঞ্চাশ বছর লাগবে। আপাততঃ মিডিয়া দিয়ে হেফাজতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে দেখে এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু অচিরেই এমন সময় আসবে, দেখবেন হেফাজতের সাথে আপোষ করতে আওয়ামীলীগ এসে হেফাজতের পায়ে পড়বে।

আওয়ামীলীগ হেফাজতকে ম্যানেজ করার চেষ্টা না করে করেছে দমন করার চেষ্টা। এই পথ আওয়ামী লীগের জন্যই আত্মঘাতি হয়েছে। আমার এ সকল আত্মবিশ্বাসী কথায় মাওলানা আবুল বাশার সাহেব মনে হতো অনেকটা প্রাণে পানি ফিরে পেতেন। আরো বিভিন্ন কথা আমাদের মধ্যে হতো।

রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাও আলোচনায় উঠে আসতো। তিনি রাজনীতি নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা জানতে চাইলে একদিন আমি বললাম,

আমার কাছে রাজনৈতিক দুটি পরিকল্পনা আছে। একটি হলো স্বল্প মেয়াদী। অপরটি দীর্ঘ মেয়াদী। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হলো, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সেক্টর ওয়াইজ ব্যক্তি গঠন ও দাওয়াত সম্প্রসারণের মাধ্যমে শক্তিশালী ভিত তৈরি করা। সকল সেক্টরে বাতিলের সাথে মোকাবেলার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও প্রভাবশালী বিভাগগুলোতে বিশুদ্ধ চিন্তা-দর্শনে লালিত ব্যক্তিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এ কাজ করতে হবে। এটা হলো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বিষয়। খুব সহসাই এর বড় কোন ফলাফল দেখা যাবে না।

আর স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হলো, যারা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, ইসলামী শরীয়ত ও

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে জরুরি এই কথা যারা মানে তাদের সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। সকল পথ ও মতের ঐক্যমতের বিষয়গুলোকে সামনে আনতে হবে আবার যে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে সেগুলোকে রাষ্ট্র চিন্তা থেকে দূরে রাখতে হবে। এভাবে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে সেই ফ্রেম ওয়ার্কের আলোকে ঐক্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সেই হিসাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শুদু কাদিয়ানী সম্প্রদায় বাদ দিয়ে ইসলামের নামে আর যতগুলো পক্ষ আছে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে পারলে একটি বিপ্লব করা সম্ভব হবে এবং সেটা একটা ভারসাম্যপূর্ণ বিপ্লব হবে। এজন্য বড় বড় যে পক্ষগুলো আছে যেমন ধরুণ একটা পক্ষ কওমী বা দেওবন্দী হালকা, আরেকটা পক্ষ হলো বিদআতপন্থী যারা আছে। এদের মধ্যে আবার অনেক উপগ্রুপ আছে। আরেকটা পক্ষ হলো আহলে হাদীস। বিদআতী আর আহলে হাদীস বিপরীতমুখী দুটি পক্ষ। সেই সাথে জামাতে ইসলামী। এই হলো বাংলাদেশে ইসলামের নামে বিদ্যমান পক্ষসমূহ। এদের মধ্যে যারাই কুফরীর সীমায় পৌছেনি, ঈমানের সীমানায় আছে সবাইকে নিয়ে ঐক্য করতে হবে। এই জাতীয় বৃহৎ ঐক্য করে মাঠে নামতে পারলে বাংলাদেশে বিপ্লব হওয়া সম্ভব।

তবে সেজন্য দক্ষ অনুঘটকের প্রয়োজন যে এই কাজটি ঘটাবে। পাকিস্তানের মাওলানা ফজলুর রহমানের মতো নির্ভরযোগ্য ও ঋানু মানুষের দরকার। পাকিস্তানের মুত্তাহিদা মজলিসে আমল গঠন করে তার একটি নজির তারা সামনে এনেছেন। আমাদের দেশে তো আলহামদুলিল্লাহ পাকিস্তানের মতো এত কট্টর বিরোধিতা নেই। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী বিরোধ তো ঈমান- কুফরের বিরোধ। দেওবন্দী-বেরেলবী বিরোধও আমাদের দেশ থেকে অনেক বেশি উত্তপ্ত। অথচ সেখানে দেওবন্দী, বেরেলবী, শিয়া ও জামাত এই চারপক্ষ মিলে মুত্তাহিদা মজলিসে আমল গড়ে সরকার গঠন করার

দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। তবে আবারও বলছি, এই কাজের জন্য এমন একজন লোক সামনে আসতে হবে যার মধ্যে দুই গুণ থাকবে। এক হলো– তাকে মুখলিস ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। দুই তাকে খুবই হুঁশিয়ার, সতর্ক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে হবে। ইখলাস না থাকলে কাজের নামে ধান্ধাবাজী হবে। ঐক্য গঠন করে এটা নিয়ে ব্যক্তিগত দেন-দরবার শুরু হবে। আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সতর্কতা না থাকলে ধান্ধাবাজদের ধোকায় পড়তে হবে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এটাকে অনেকে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি এটা অবাস্তব তো নয়ই খুব কঠিনও নয়। যাদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে, এরা এই ধরনের আহ্বানে সাড়া দিবে না। আসলে এমন একটা পরিবেশ যখন হয়ে যাবে, ফ্লো যদি উঠে যায় তাহলে সবাই নিজ নিজ আগ্রহে এসে ঐক্যে শামিল হওয়ার জন্য লাইন ধরবে। চার দলীয় জোট গঠনের সময় সামান্য একটা ফ্লো উঠেছিলো, তখন বিদআতপন্থী এমন গ্রুপ যারা আমাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না এমন গ্রুপকে আমি দেখেছি আমাদের বাসায় আব্বাজান হযরত শায়খের (রহ.) সাথে এসব বিষয়ে লিয়াজো করতে এসেছেন।

এমনও বলেছি যে, এখনই আমাদের দেশে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে হেফাজত, জামাত আর জাতীয় পার্টি এই তিনটি পক্ষও যদি নির্বাচনী কোন সমঝোতা করতে পারে– ক্ষমতার ব্যাপারে এই শক্তি একটি ফ্যাক্টরে পরিণত হয়ে যাবে। এটা অবশ্য একটা কথার কথা। হেফাজতে ইসলাম তো প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা নির্বাচনে আসবে না এমন ঘোষণা দিয়েই মাঠে নেমেছে।

আমার কথায় আবুল বাশার সাহেব বৃহৎ এই ঐক্যের প্রতি নিজেরও প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে বলেন যে, আপনি এই মিশন নিয়ে ময়দানে নামেন। আমি বলি যে, আমার মতো ছোট মানুষের কাজ এটা না। তিনি বললেন যে, আরে কাজ করতে করতেই তো মানুষ বড় হয়। তাছাড়া আপনার বড় নিসবত আছে, আপনি শায়খের সাহেবজাদা, আপনাকে সবাই মূল্যায়ন করবে। এভাবেই আবুল বাশার সাহেবের সাথে অনেক বিষয়েরই মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনা হয়। আমি এই ধরনের ঐক্যচিন্তার কথা খুলনা কারাগারে থাকতে মাওলানা গোলাম কিবরিয়া সাহেব ও সাবেক এমপি গোলাম পরোয়ার সাহেবের সাথেও আলোচনা করেছিলাম। তারাও অনেক উৎসাহ দেখিয়েছেন এই ধরনের চিন্তার প্রতি। পরোয়ার ভাই তো বলেই বসলেন, মামুন ভাই! আল্লাহ হয়তো

আপনাকে আমাদের আগেই মুক্ত করবেন। আপনি বের হয়ে এই মিশন নিয়ে নেমে পড়ুন। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা একাত্মতার ঘোষণা দিচ্ছি।

আবুল বাশার সাহেব যতদিন থাকলেন, এভাবে বিভিন্ন আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে সময় কেটে যেতো। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ওনার জামিন হয়ে গেলো। জামিনে মুক্তি পেয়ে চলে যাবেন, ব্লকের কেউ কেউ ওনাকে ধরলো খাওয়ানোর জন্য। উনি সানন্দেই সম্মত হলেন। উনি থাকতে আর আয়োজন করা গেলো না। উনি বের হয়ে পার্শ্ববর্তী এক মসজিদের পরিচিত ইমাম সাহেবের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমরা জম্পেশ একটা খাবার দিলাম। পোলাও-গোশত-সালাদ ছিলো। আর ছিলো প্রতি তিনজনের জন্য এক কেজি করে দই।

আমি যখন কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে তখন এখানে হেফাজতে ইসলামের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বন্দী ছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকজন ছিলেন গোপালগঞ্জ ভবানীপুর মাদরাসার নাযিমে তালিমাত মাওলানা শোয়াইব আহমাদ। তিনি থাকতেন নীলগিরি ভবনে। মাওলানার সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। ব্যক্তিগতভাবেও আমার মহব্বতের মানুষ। কিন্তু কারাগারে তার সাথে খুব একটা দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে উঠত না। এক ভবনের বন্দি তো আরেক ভবনে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে উভয়ে একই সাথে ভবনের বাইরে আসার সুযোগ পেলে সাক্ষাত সম্ভব ছিলো।

হাই সিকিউরিটির বিভিন্ন ভবনের বন্দীরা পরস্পর সাক্ষাতের সুযোগ পায় সাধারণত তিনভাবে। একই সময়ে যদি বাইরে থেকে সাক্ষাতের লোক আসে অথবা মেডিকেলে গেলে। আর এক সাথে কোর্ট পড়লে। মাওলানা শোয়াইবের সাথে একদিন সাক্ষাত হয়েছিলো আমাদের উভয়ের সাক্ষাতে লোক এসেছিলো একই সময়ে। আরেক দিন একই সাথে কোর্ট পড়েছিলো। এক সাথে কোর্টে আসা-যাওয়া ও গারদে থাকা সব মিলিয়ে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এক সাথে ছিলাম। মাওলানার নামে মামলা ছিলো তিনটি। তাই কারাগারের সাধারণ প্রচলন অনুসারে ডান্ডাবেড়ি পরার সৌভাগ্য! তারও হয়েছিলো। বৃহত্তর দক্ষিণবঙ্গে হযরত সদর সাহেব (রহ.)-এর সাহেবজাদা আমার মুহতারাম উস্তাদ মুফতী রুহুল আমীন সাহেব যিনি আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে বিশেষ যোগাযোগ ও লিয়াজোর সম্পর্ক রাখেন, সরকারের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি আলেম সমাজের দাবি-দাওয়া আদায়ের তৎপরতা চালান। তার দক্ষিণহস্ত ও অন্যতম সহায়ক হিসেবে মাওলানা শোয়াইব দক্ষিণবঙ্গে পরিচিত। কওমী মাদরাসার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসহ আরো বেশ কিছু বিষয়ে দেশের সিংহভাগ ও চিন্তাশীল আলেমদের সাথে রুহুল আমীন সাহেবের ভিন্নমত থাকার বিষয়টি

একটি আলোচিত বিষয়। মাওলানা শোয়াইব বয়সে তরুণ হলেও তাকে একজন চিন্তাশীল মানুষ বলেই মনে করা হয়। কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে তার সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তার যুক্তি হলো, আমাদের পদ্মার ওপারে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। কাজেই আমাদের জন্য কাজ করতে হলে রুহুল আমীন সাহেব হুযুরকে সামনে রেখে কাজ করা সুবিধা। আমরা যদি ওনার বিরোধিতা না করে ওনাকে পরামর্শ দিয়ে চলতে পারি সেটাই তো ভালো। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত যেই রুহুল আমীন সাহেব হুযুরের হাত, তার ঘনিষ্ট সহযোগী তিন মামলা নিয়ে ডান্ডাবেড়ি বয়ে বেড়াচ্ছে। অপরাধ একটাই, প্রশাসনের সম্মুখে একজন আলেমে দ্বীন হিসাবে দ্বীনের হক কথাগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন।

হেফাজতে ইসলামের অন্যান্য বন্দী যারা ছিলো তাদের মধ্যে আমি এসে দেখলাম অনেকেই এখনো বেশ সমস্যায় আছে। এরা ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার হয়েছে। অনেকের বাড়ি অনেক দূরে। কাপড়-চোপড়সহ প্রয়োজনীয় আসবাব ইতিমধ্যে পুরাতন বন্দীরা কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাইরে থেকেও অনেকে পাঠিয়েছে। আরো কিছু বিছানার চাদর, লুঙ্গি ও গেঞ্জি দরকার। আমি সংবাদ দিয়ে ব্যবস্থা করলাম। অনেকের আইনী সহায়তার প্রয়োজন ছিলো, আমি সকলের নামের তালিকা সংগ্রহ করে হেফাজতের দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করলাম। এভাবে হেফাজতের বন্দীরা আমাকে পেয়ে মনে হলো একজন অভিভাবক পেয়েছে। তারা তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে আমার কাছে চিরকুট পাঠাতো, আমি সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। আলহামদুলিল্লাহ! রমযানের আগেই অধিকাংশ এবং বাকীরা রমযানের শুরুতেই জামিনে মুক্ত হয়ে গেছে। এখন হাই সিকিউরিটি কারাগারে হেফাজতের আসামী একমাত্র আমিই আছি। আজকের এই লেখার সময় পর্যন্ত আমার ১৭টি মামলার জামিন হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! আছে আর একটি মামলা। ইনশাআল্লাহ আগামী দুইদিন পর সেটারও জামিন হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

শাফিউর রহমান ফারাবী। মুরতাদ ব্লগার রাজিবের জানাযার ইমামকে ফেসবুকে হত্যার হুমকি দেয়ার মামলার আসামী সে।

বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী ব্লগার ফারাবী আজ দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবৎ আটক। তার জামিন হয় না। তার নামে চার্জ গঠন হয়ে গেছে। অথচ নবীর দুশমন আসিফ মহিউদ্দীন ও অন্যান্য

নাস্তিক ব্লগারদের ঠিকই জামিন হয়ে যায়। একটু আত্মভোলা সরল-সহজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক এই ফারাবী নিতান্তই আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন হুমকি দিয়েছে এবং সেই আবেগ অবশ্যই ঈমানী আবেগ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরী আইন এই ঈমানী আবেগকে মূল্য দিতে অপারগ।

ফারাবী আগে আমাদের চন্দ্রা ভবনেরই চতুর্থ তলায় থাকতো। আমি বিভিন্ন প্রয়োজনে সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করার সময় সে আমার পরিচয় পেয়ে আমার সাথে কথা বলতো, সমস্যা জানাতো। পরে চেষ্টা করে আমরা তাকে আমাদের ব্লকে আনিয়ে নিয়েছি। এখানে এসে সে মহা খুশি। ভাবখানা অনেকটাই এমন যে, এখন জামিন না হলেও চলবে। দ্বীনদার এই সমমনাদের পরিবেশে এভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দেয়া যাবে।

আমরা চন্দ্রা পঞ্চম তলার পূর্ব ব্লকে থাকি। এই ব্লকের সবাই নামাযী। সুন্দর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ। অধিকাংশই কওমী মাদরাসা মহলের মানুষ। তাই দু-একদিনের মধ্যেই তাদের সবার সাথে বেশ হৃদ্যতা জমে উঠলো। কারো কারো সাথে তো পুরনো পরিচয়ও আছে। তাদের মধ্যে রাহমানিয়ার সাবেক আরো দু'জন ছাত্র আছে। আবদুল ওয়াদুদ গাজী ও মুফতী মঈনুদ্দীন। একই মাদরাসায় পড়ুয়া হওয়ায় তাদের সাথেও আলাদা একটা হৃদ্যতা হয়েছে। মুঈনুদ্দীন জামেউল উলূম মাদরাসায় শায়খের কাছে বুখারী শরীফ পড়েছেন। শায়খ তাকে খুব মহব্বত করতেন। তিনি শায়খের অনেক খেদমতও করেছেন। তার সাথে শায়খকে নিয়ে অনেক গল্পও হয়। তিনি একদিন আমাকে একটি সৌভাগ্যের ও সান্ত্বনার ঘটনা বললেন।

মুঈনুদ্দীন বললেন– নিজের দেখা একটি স্বপ্নের কথা। তিনি বলেন, আমি এক রাতে দেখি আমরা অনেকে কারাগারে আছি। তাদের সবার শেষে আমি। হঠাৎ দেখি হযরত শায়খ (রহ.) কারাগারের ভিতরে আমাদের ওখানে উপস্থিত। শায়খ (রহ.)কে দেখে আমরা তো সবাই অবাক যে, হুযুর এখানে কেন? শায়খ (রহ.) হাটতে হাটতে যেভাবে তিনি সুস্থ অবস্থায় লাঠি নিয়ে হাটতেন একেবারে আমার কাছে এসে দাড়ালেন। মুঈনুদ্দীন বলেন, আমি স্বপ্নের কিছুই তখন বুঝিনি। এর পরই আপনি আমাদের এখনে আসলেন। তখনই আমার ঐ স্বপ্নের তাবীর ও মর্ম বুঝে এসেছে। মুফতী মুঈনুদ্দীনের এই বরকতময় স্বপ্নটি আমার ছোট্ট কারা জীবনের অন্যতম পাওয়া। এটিকে আমি একটি শুভ সংবাদ ও সৌভাগ্যের বার্তা হিসাবেই গ্রহণ করেছি।

সাতটি রুম আর করিডোরের এই ছোট্ট কিন্তু হৃদ্যতাপূর্ণ পরিসরই আমাদের পৃথিবী। খারাপ লাগে না। গল্প আর নানান বিষয়ের আলোচনায় সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। এর উপর বহু মামলা থাকায় দু-চার দিন পরপরই কোর্ট হাজিরার তারিখ থাকে। কোর্টে যাতায়াতে সারা দিন পার হয়ে যায়। এর উপর দুই বারের খুলনায় চালান আর রিমান্ড মিলিয়ে একটা লম্বা সময় এভাবেও কেটে গেছে।

আবুল বাশার সাহেব হুযুর চলে যাওয়ার পর আমাদের রুমটায় থাকলাম আমরা তিনজন। রুমের আর দুজনই আমার ছাত্র। তারা দুজনই উস্তাদ হিসাবে আমার যথেষ্ট খেদমত করে। দু'জন খাদেম আর একজন মাখদুম এক সাথে থাকলে যা হওয়ার কথা, ব্যাপারটা তাই দাড়ালো। সব মিলিয়ে কারাগারের এই ছোট্ট রুমটা বেশ আপন হয়ে উঠলো। তাছাড়া বাথরুম-গোসল ইত্যকার সুবিধা তো আছেই। আর সেই সাথে আছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার।

কাছের-দূরের যার সাথেই দেখা হয় বা যেই দেখা করতে আসে সকলের মুখেই অভিন্ন যে প্রশ্নটি শুনতে হয়– খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় না? সবার কাছেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বিবরণ দিতে হয়। প্রথমেই অভিন্নভাবে সবাইকে যে কথা বলেছি ও বলি, আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া-দাওয়ায় কোন সমস্যা নেই।

জেলখানা থেকে তিন বেলা খাবার দেয়। সকালে আটার রুটি আর গুড়। দুপুরে ভাত-ডাল। রাত্রে ভাত-সব্জি। সব্জির সাথে মাছ অথবা গোশত থাকে। জেলকোড অনুযায়ী প্রতিদিন কী পরিমাণ খাবার একজন কয়েদী বন্দী আর হাজতী বন্দী প্রাপ্য তার চার্ট প্রতিটি ভবনের প্রবেশ পথে লাগানো আছে। প্রদত্ত ঐ চার্টে কয়েদী ও হাজতী বন্দীদের মধ্যে সামান্য তারতম্যসহ খাবার বরাদ্দ দেয়া আছে। উক্ত চার্টের আলোকে একজন বন্দীর দৈনন্দিন প্রাপ্য ও তার জন্য বরাদ্দ খাবাবের তালিকা নিম্নরূপ–

একজন কয়েদী/হাজতী বন্দীর দৈনিক খাদ্য তালিকা

সকাল	কয়েদী	হাজতী
নাস্তার আটা	১১৬.৬৪ গ্রাম	৮৭.৪৮ গ্রাম
নাস্তার গুড়	১৪.৫৮ গ্রাম	১৪.৫৮ গ্রাম
দুপুর/বিকাল		
চাউল/আটা	৫৮৩.২০ গ্রাম	৪৯৫.৭২ গ্রাম
ডাল	১৪৫.৮০ গ্রাম	১৪৫.৮০ গ্রাম

তরকারী	২৯১.৬০ গ্রাম	২৯১.৬০ গ্রাম
মাছ/মাংস	৩৬.৪৫ গ্রাম	৩৬.৪৫ গ্রাম
গরুর মাংস	৩৮.৭৮ গ্রাম	৩৮.৭৮ গ্রাম
পিয়াজ	৪.৬১ গ্রাম	৪.৬১ গ্রাম
শুকনা মরিচ	২.০৪ গ্রাম	২.০৪ গ্রাম
শুকনা হলুদ	১.০২ গ্রাম	১.০২ গ্রাম
ধনিয়া	০.৫০৫ গ্রাম	০.৫০৫ গ্রাম
ভোজ্য তেল	২০.৪৯ গ্রাম	২০.৪৯ গ্রাম
জ্বালানী কাঠ	৬৫৬.১০ গ্রাম	৬৫৬.১০ গ্রাম
লবন	৩২.৩৫ গ্রাম	৩২.৩৫ গ্রাম

সরকারীভাবে এই পরিমাণ বরাদ্দও আছে। কিন্তু আর দশটি খাতের মত এই খাতেও দুর্নীতি আছে। আছে চুরি। চুরি-দুর্নীতির পরও যে পরিমাণ খাবার প্রতিজন বন্দী পায় তাতে আমরা যারা কওমী মাদরাসায় পড়ুয়া আমাদের বুঝার সুবিধার জন্য বলা যায় ফুল ফ্রি খানা প্রতিজন বন্দীকে দেওয়া হয়। এর উপর আমরা ব্লকের সকলে মিলে তরকারী রান্না করে খাই। পি. সি. দিয়ে ক্যান্টিন থেকে মাছ-গোশত ও তরি-তরকারী ক্রয় করি। এরপর সেগুলো প্রস্তুত করে আমাদের জন্য নির্ধারিত যে সেবক আছে সে চৌকা থেকে রান্না করে দেয়। এভাবেই দুই বেলার খাবার চলে। আর সকালের নাশতা একেক সময় একেক রকম হয়। কোন দিন ক্যান্টিন থেকে পরাটা-ভাজি বা পরাটা ডিমভাজি কিনিয়ে আনাই। কোন দিন চিড়া ভিজিয়ে আম-দুধ দিয়ে খাই। আবার যে দিন কোর্ট থাকে সেদিন চৌকা থেকে সকাল ভোরে ভাত-ডাল দেয়। এটাকে বলে কোর্ট ভাত। এই সাধারণ ব্যবস্থার পর জেলখানার ভিতর থেকেই আমার পরিচয় পেয়ে কেউ কেউ খাবার-দাবার তরকারী ইত্যাদি হাদিয়া পাঠায়। আমাদের লালবাগের সাবেক এমপি নাসিরুদ্দীন পিন্টু সাহেব এই কারাগারেই আছেন। তিনিও আমার জন্য তরকারী পাঠিয়ে দেন।

আমার এই জেলে থাকার সময়টা ফলের মৌসুম গেলো। প্রথমে ছিলো আম, লিচু আর জামরুল। খুলনা আর ঢাকায় আলহামদুলিল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণ লিচু খাওয়া হয়েছে, আমও খেয়েছি। বাইরে থেকে আনিয়েছি বা সাক্ষাতকারীরা হাদিয়া দিয়ে গেছে। আর কাশিমপুর আসার পর থেকে বাহারি আম। আম্রপালি, হিমসাগর আর ল্যাংড়া ভালো জাতের এই সমস্ত আম প্রায় সময়ই আমাদের

ঘরে থাকত। এরপর রমযান মাসে আসল ফজলি আম। ইফতারী আর সেহরীতে অধিকাংশ দিন আম খেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! কাঠালও খেয়েছি যথেষ্ট পরিমাণ। খাওয়া-দাওয়ার পর্যাপ্ততার মধ্য দিয়েই জেলখানার সময় কেটেছে।

কাশিমপুর হাই সিকিউরিটিতেই মূলত সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছি। রিমান্ড-চালান-কোর্ট ইত্যকার প্রয়োজনে যতটুকু সময় হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে বাইরে যেয়ে থাকতে হয়েছে শুধু একটা অস্থিরতা আর অপেক্ষা কাজ করেছে– কখন ফিরে যাব নিজের রুমে। সময় মতো গোসল, চাহিদা মাফিক খাবার আর প্রয়োজনীয় বিশ্রামসহ পরিচিত ও প্রিয়জনদের সাথে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি কারণেই এই আকর্ষণ তৈরি হয়েছে।

দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যক্তিগত মামুলাত

জেলখানায় যারা আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে তাদের অনেকেই বিশেষত ছাত্র সংগঠনের ছেলেরা আর আমার প্রিয় অনেক ছাত্রই খুব আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছে 'আমার সময় কাটে কীভাবে অথবা আমি সারাদিন কীভাবে কাটাই, আমার মামুলাত কী'? এই মুহূর্তে আমার আশা, আমার কারাজীবন আর খুব বেশি প্রলম্বিত হবে না ইনশাআল্লাহ! অচিরেই আল্লাহ চাইলে মুক্তি পাবো। সেই হিসাবে আশি দিনের মতো আমার এই কারা জীবনে বিশ দিনের মাথায় আমি কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে এসেছি। এর পূর্বে পনের দিন খুলনায় আর পাঁচ দিন ঢাকা কারাগারে থেকেছি। কাশিমপুর আসার পরেই মূলত একটা নেযামের উপর সময় কাটানো সম্ভব হয়েছে।

পূর্বাপর সম্পূর্ণ সময়ের মামুলাত বলতে যা ছিলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কিছু তেলাওয়াতে কুরআন। ১২ মে সোনাডাঙ্গা থানায় যখন দ্বিতীয়বার আমাকে গারদে ঢুকালো আর শহীদ ভাইকে বের করে নিয়ে গেলো তখনই আমি এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেছি আমার সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ব্যাপারে। সেই মুহূর্তে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছি নিজের মানসিকতাকে স্বাভাবিক রাখতে। আলহামদুলিল্লাহ! যতক্ষণ গ্রেফতার করবে কি করবে না? এমন অনিশ্চয়তা ছিলো ততক্ষণ একটা অস্থিরতা ছিলো। কিন্তু যখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম, গ্রেফতারের ব্যাপারে তখন আল্লাহর রহমতে মনকে শক্ত করতে পেরেছিলাম। গারদের যে বাথরুম আছে সেখানে অযু করে এসে নফল নামায শুরু করে দিলাম। নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফ শুরু থেকেই তেলাওয়াত আরম্ভ করলাম। এরপর কুরআন তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। জেলখানায় থাকার প্রায় পুরোটা সময় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কুরআন তেলাওয়াত বেশি হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে পূর্ণ কুরআন ইয়াদ করার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছি। আমি যখন হিফয শেষ করি তখন খুব ভালো ইয়াদ নিয়ে আসতে পেরেছিলাম না। এরপর তারাবীহ পড়ানোর জন্য রমযানে ইয়াদ করে করে কিছুটা আয়ত্ব করেছিলাম। কিন্তু চলতে-ফিরতে যে কোন সময় কুরআন পাকের যে কোন স্থান থেকে ধারাবাহিকভাবে তেলাওয়াত করতে পারার মতো ইয়াদ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিলো না। হ্যাঁ এতটুকু ইয়াদ ছিলো যে, যতটুকু অংশ তারাবীহতে তেলাওয়াত হবে সেটুকু দু একবার তেলাওয়াত করলেই চলতো। লোকমা-ভুল

সচরাচর হতো না। কিন্তু আগে না দেখেই পাঁচ দশ পারা অব্যাহত তেলাওয়াত করতে পারার মতো অবস্থা ছিলো না। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা আবেগ তো সব সময়ই ছিলো যে, চলতে ফিরতে ধারাবাহিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে যেন পারি। এখন থেকে পাঁচ-সাত বছর আগে পরিকল্পনা নিলাম যে, কুরআন পাক প্রথম থেকেই এই রকম ইয়াদ করার পদক্ষেপ নিবো। অল্প অল্প করে ইয়াদ করবো আর পিছনের ইয়াদ করা অংশটুকু চলতে ফিরতে তেলাওয়াত করতে থাকবো। আলহামদুলিল্লাহ! এই পদ্ধতিতে কয়েক বছর আগেই প্রথম দশ পারা এমন ইয়াদ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এরপর আবার গাফলতি পেয়ে বসে। রমযান মাস আসলে আবার সেই পরিকল্পনা নিতাম। কিন্তু খুব বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। ঘুরে ফিরে আগে না দেখেও তেলাওয়াত করার মতো ইয়াদ ঐ দশ-এগারো পারা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এবার জেলখানায় সেই সীমাবদ্ধতা ভাঙ্গার অঙ্গীকার করলাম এবং রমযানের আগেই তেইশ-চব্বিশ পারার মতো হয়েও গেলো। ইয়াদ হয়ে যাওয়া অংশটুকুই বার বার তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরো পোক্ত করতে লাগলাম। কারাজীবনে এমন সুযোগ খুব বেশি আসলো। জেলখানা থেকে কোর্টে যাতায়াতের পথে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, গাড়িতেই বসে থাকি, সময়টা কোন কাজে লাগে না। এই সময়টা কাজে লাগানোর চিন্তা করলাম। সব সময় খুব একটা না পারলেও কোন কোন দিন কুরআন তেলাওয়াতে খুব তৃপ্তি লাগে। সে দিন বেশ পরিমাণ তেলাওয়াত করে নিয়েছি। কোর্টে যাতায়াত ও কোর্ট গারদে কোন কোন দিন নয় দশ পারাও তেলাওয়াত করেছি। এইভাবে রমযানের আগেই তেইশ-চব্বিশ পারা ইয়াদ হয়ে যাওয়ার পর রমযানের শুরুতেই অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমার পূর্ণ কুরআন শরীফই এমন ইয়াদ হয়েছে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একভাবে তেলাওয়াত করতে পারবো। হয়তো কোথাও কোথাও সামঞ্জস্যতার কারণে লোকমা লাগবে অথবা আটকে গেলে একটু দেখতে হবে। তবে দিনের বেলা দেখে তেলাওয়াত করা ছাড়াই রাত্রে নামাযের মধ্যে আট দশ পারা কুরআন পাকের যে কোন জায়গা থেকে তেলাওয়াত করা সম্ভব। রমযান শুরু হওয়ার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই রাত ও দিনে দীর্ঘ দীর্ঘ নামায আদায় করার তাওফীক হচ্ছে। সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক তুমি আল্লাহ!

আগে থেকেই ফরয নামাযের অতিরিক্ত নিয়মিত তিন নফল পড়ার অভ্যাস ছিলো।

> *সকাল বেলা চার রাকাত সালাতুদ্দোহা, সন্ধ্যায় ছয় রাকাত সালাতুল আওয়াবিন আর শেষ রাতের পরিবর্তে ইশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত। অনেক বছর ধরে এই*

আমল করার চেষ্টা করছি। আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) একটি হাদীসের দ্বারা এই তিন নফলের প্রতি খুব উৎসাহিত করতেন।

واستعينوا بالغدوة والروحة ۪ ـ ئ من الدلجة.

'আর তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর সকাল, সন্ধ্যা আর রাতের অন্ধকারের কিছু সময়ের (ইবাদতের) মাধ্যমে।'
হযরত শায়খ (রহ.) এই হাদীসের আলোকে তিন নফল নামাযকে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির বিশেষ বাহন বলে আখ্যায়িত করতেন। আমার বর্তমান শায়খ কুমিল্লার হযরত আশরাফ আলী সাহেব হুযুর (দা. বা.)ও এই তিন নফল নামায পড়তে তাকিদ করেছেন। সকালের চার রাকাত নফলের ব্যাপারে হযরতের পরামর্শ হলো, প্রথম দুই রাকাতে তাওবার নামাযের আর শেষ দুই রাকাতে সালাতুল হাজতেরও নিয়ত করে নিবে।

নিয়মিত অভ্যস্ত এই তিন নফলের আমল আলহামদুলিল্লাহ জেলখানায় আসার পর আরো উত্তমরূপে আদায় হওয়ার সুযোগ হচ্ছে। বাইরে থাকতে সংক্ষিপ্ত নফল আদায় হতো। এখানে দীর্ঘ তেলাওয়াতের দ্বারা আদায়ের তাওফীক হচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত বাইরে থাকতে কদাচিৎ তাহাজ্জুদের নামায শেষ রাতে আদায় হতো। আলহামদুলিল্লাহ! জেলখানায় নিয়মিতই শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার তাওফীক হয়। এছাড়া কিছু যিকির-আযকারের নিয়মিত অযিফা আদায়ের চেষ্টা করি।

নিয়মিত এই আমলগুলোর সাথে জেলখানায় এসে আরো তিনটি আমল করার পরামর্শ পেয়েছি আমার দু'জন পারিবারিক মুরব্বীর পক্ষ থেকে। আমাদের মদীনার আপা সংবাদ পাঠিয়েছেন, বিপদ থেকে মুক্তির নিয়তে নিম্নোক্ত দরূদটি ৭১ বার এবং সুযোগ মতো আরো বেশি পড়তে–

اللهم صل على النبى محمد حتى لا يبقى من صلوتك شيئ

وبارك على النبى محمد حتى لا يبقى بن بركتك شيئ

وارحم النبى محمدا حتى لا يبقى من رحكتك شيئ

وسلم على النبى محمد حتى لا يبقى من سلامك شيئ.

আর দুই রাকাত সালাতুল হাজত তিনবার সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। প্রথম রাকাতে দুইবার আর দ্বিতীয় রাকাতে একবার। আর খুলনার জেলে সাক্ষাতে এসে আম্মাজান বলেছিলেন, সূরা ইউসুফ পড়তে। এইভাবে উপরোক্ত দরূদ, প্রতিদিন তিনবার সূরা ইয়াসীন দিয়ে দুই রাকাত সালাতুল হাজত আর সূরা ইউসুফ তেলাওয়াতের আমলও আলহামদুলিল্লাহ্ হয়েছে।

এছাড়াও সালাতুল হাজত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআটিও বেশি পড়া হয়েছে। দুআটি আমার বিপদগ্রস্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহন করে।

اللهم انك انت مليك مقتدر ما تشاء من امر يكن فاسعدنى فى الدارين - وكن لى ولا تكن على - وانصرنى على من بقى على واعذنى من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العلمين.

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমিই বাদশা, তুমিই ক্ষমতাবান, তুমি যা চাও তাই হয়। উভয় জগতে তুমি আমাকে সৌভাগ্য দাও। আর তুমি আমার পক্ষে থাকো বিপক্ষে নয়। যে আমার উপর অত্যাচার চালায় তার বিরুদ্ধে আমাকে তুমি সাহায্য করো। আর তুমি আমাকে পরিত্রাণ দাও ঋণের পেরেশানী থেকে, মানুষের আধিপত্য থেকে আর শত্রুর উপহাস থেকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি রহমত দান করো। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র জন্য।

বিপদ-আপদ ও পেরেশানীতে পড়লে আব্বাজান হযরত শায়খ (রহ.)কে দেখতাম এই দুআগুলো বার বার পড়তে।

يسر يا الهى كل عسر بحرمة سيد الابرار يسر

سهل يا الهى كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل

عجل يا الهى كل خير بحرمة سيد الابرار عجل

অর্থ : সকল মুশকিল আসান করো আমার মাওলা
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের উসিলায়।
সকল জটিল সহজ করো আমার মাওলা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের উসিলায়।

সকল কল্যাণ দ্রুত দাঁও আমার মাওলা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের উসিলায়।

আমিও পড়ি। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সব সময় পড়ছি। আল্লাহ সারা জীবন পড়ার তাওফীক দিন। আমীন।

রমযান মাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত উপরোক্ত আমলসহ দৈনন্দিন কাজকর্মের একটা নিয়মিত রুটিন হয়ে গিয়েছিলো। জেলখানার জীবনে নিয়মানুবর্তিতার একটা স্বাভাবিক পরিবেশ থাকে। সময় মতো খাওয়া, সময় মতো ঘুমানোসহ নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই জীবন ঘড়ির কাটা ঘুরতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা সাতাশ বছরের জেলজীবনে একটা নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। মুক্ত জীবনে গিয়ে এমনকি প্রেসিডেন্ট হয়েও সেটা ধরে রেখেছেন। কর্মক্ষমতার শেষ সময় পর্যন্ত তার সেই রুটিন অব্যাহত ছিলো। জেলখানা অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ভালো যা কিছু দেয়, তার অন্যতম হলো, যদি কেউ গ্রহণ করতে পারে তাকে একটি নিয়ম মাফিক সুশৃঙ্খল জীবন দেয়।

জেলখানায় যে দৈনন্দিন রুটিন আমি পালন করেছি তা অনেকটা এমন– সকালে আমাদের লক-আপ খোলা হয় সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে। তখন ট্রাউজার-কেড্‌স আর ব্যায়ামের জন্য নির্ধারিত পাঞ্জাবিটা পরে শরীর চর্চা করি। টানা আধা ঘণ্টা শক্ত ব্যায়ামে ঘাম ঝরানো শরীর চর্চা হয়। এরপর রুমের ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে আরো আধা ঘণ্টা শরীর থেকে ঘাম বের হয়ে শরীর ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম। বাতাসে শরীর শুকালে ঠাণ্ডা লাগার জোরালো আশঙ্কা থাকে। এই ফাঁকে রেডিওতে সকালের সংবাদ শুনে নেওয়ার চেষ্টা করি। এরপর ভালো মত একটা গোসল। গোসল সারতে সারতে নাশতার প্রস্তুতি হয়ে যায়। গোসল সেরে নাশতা করি। নাশতার পর সালাতুদ্দোহার চার রাকাত নামায দীর্ঘ কিরাতে পড়ার চেষ্টা করি। ঘণ্টা খানেক লাগে নামাযে। ইতিমধ্যে দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। এরপর খাতা-কলম নিয়ে বসি লিখতে। বারোটা নাগাদ চলে লেখা। এর মধ্যে পত্রিকা চলে আসে। কাশিমপুর হাই সিকিউরিটিতে দৈনিক ইত্তেকাফ আর জনকণ্ঠ অনুমোদিত। ঢাকাতেও তাই। খুলনায় যুগান্তর অনুমোদিত। আমাদের ব্লকে দৈনিক ইত্তেফাক রাখা হয়। বারোটার দিকে পত্রিকা আসে। হেফাজতে ইসলামের সংবাদ থাকলে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। পৌনে একটায় জোহরের জামাত হয়। নামাযের পর পরই খাবার খাই। খাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত

কাইলুলা করে আবার খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসি। বিকাল পাঁচটার আগেই আসর নামাযের জামাত হয়ে যায়। পাঁচটার পর পর লক-আপ করে দেয়া হয়। লক-আপের পর কোন দিন আরো একটু লিখি। কোন দিন পত্রিকার কলাম পড়ি। মাগরিবের আগে চা-নাশতা করি। মাগরিবের নামায পড়ে আওয়াবিন পড়ি। আওয়াবিনের নামায বেশ দীর্ঘ হয়। সাধারণত আটটা সোয়া আটটা বেজে যায়। আওয়াবিন নামাযে দেড় থেকে দুই পারা পড়ার টার্গেট থাকে।

আওয়াবিনের পর সোয়া আটটা সাড়ে আটটার দিকে রাতের খাবার খাই। খাওয়ার পর ইশার নামায পড়ি। ইশার নামাযের পর সালাতুল হাজত পড়ে ঘুমিয়ে যাই। ততক্ষণে ঘড়ির কাটায় দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। আড়াইটার দিকে আবার উঠার টার্গেট থাকে। কোনদিন যথাসময়ে ওঠা হয়। কোন দিন আবার একটু দেরিও হয়ে যায়। এক-দেড়-দুই পারা কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে তাহাজ্জুদ পড়ি। এরপর বেতেরের নামায। ইতিমধ্যে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের নামায পড়ি। ফজরের নামাযের পর আগের দিনের ভেজানো ছোলাবুট-বাদাম, সেই সাথে খেজুর খাই। একটু মধুও চাখি। এরপর হাতে তাসবীহ নিয়ে দরূদের আমলটা করতে করতে আবার একটা ঘুম দেই। ঘুম থেকে যখন উঠি তখন আবার লক-আপ খোলার সময় হয়ে যায়। লক-আপ খোলার পর আবার আগের দিনের মতো শরীর চর্চা দিয়ে শুরু।

মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায রুমের মধ্যেই পড়তে হয়। আযান দিয়ে তিনজনেই জামাত পড়ি। কাশিমপুরের কারাগারে দৈনন্দিন সাধারণ রুটিনটা এমনই কেটেছে। মাঝে মধ্যে আবার গল্প বা আলোপ-আলোচনাও চলেছে। অনেক আপনজন, পরিচিতজন, বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্ররা এসেছে সাক্ষাতে। তাদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছি। আমরা যে চন্দ্রা ভবনে থাকি এখান থেকে সাক্ষাত রুমে যেতে তিন-চার-পাঁচ মিনিট লেগে যায়। নিয়মিতই সাক্ষাতে লোকজন এসেছে। হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকেও দুইবার এসে খোঁজ-খবর নিয়েছে।

বিশেষ উপলক্ষ্য তৈরি হলে রেডিওর খবর শুনেছি। সংসদ অধিবেশনে যখন খুব উত্তপ্ত অবস্থা তখন সংসদ অধিবেশনও শুনেছি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মিশরের সংবাদ শোনার জন্য একটা উদগ্রতা থাকত। আর জাতীয় প্রেক্ষাপটে হেফাজতে ইসলামের বিষয় যখন আলোচনার লাইম লাইটে চলে আসে তখন খুব আগ্রহ নিয়ে সেই সংবাদও শুনি। আর সবচেয়ে আগ্রহ-উত্তেজনা নিয়ে শুনেছি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোর ফলাফল ঘোষণার আয়োজন। নিউজ আপডেট জানার জন্য চ্যানেল থেকে চ্যানেলে টিউন করেছি।

আমাদের বন্দীদের কাছে সিটি নির্বাচনগুলোর গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলাম। মানুষ যখন নিজে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকে না কিংবা স্বকীয়ভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অবস্থানে থাকে না তখন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটতম পক্ষ যেটা থাকে তার জয়-পরাজয়ই মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে অথবা অপেক্ষাকৃত বড় শত্রুর পতন কামনা মানুষের মধ্যে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। এটাই হলো স্বভাবজাত ব্যাপার। স্বভাবজাত প্রতিটি ব্যাপারকেই ইসলাম সমর্থন করেছে, যদি তার মধ্যে অন্য কোন অনিষ্টতা না থাকে। স্বভাবজাত এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করা আঁতেলামী ছাড়া আর কিছুই না।

রোম আর পারস্য দুই পরাশক্তি। উভয়টাই কুফরী শক্তি। তাদের মধ্যে চলছে লড়াই। এই লড়াইয়ে যেই জিতুক তাতে মুসলমানদের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু মুসলমানগণ এখানে মনে-প্রাণে এক পক্ষের বিজয় কামনা করে। শুধু মুসলমানগণ কামনা করে তাই নয়; আল্লাহর কুরআন সেটা সমর্থনও করে।

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে সেই ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের শানে নুযুলের বিবরণে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকদের সাথে ছিলো মুসলমানদের দ্বন্দ্ব। মুসলমানরা আসমানী কিতাব কুরআনের অনুসারী। ওদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি রোম-পারস্যের মধ্যে রোম হলো নাসারা তথা আসমানী কিতাব ইঞ্জিলের অনুসারী আর পারস্য হলো অগ্নিপূজকদের দেশ। রোম-পারস্যের যুদ্ধে মক্কার কুরাইশরা পারস্যের বিজয় চায় কারণ কুরাইশ যেমন মুশরিক পারস্যও মুশরিক। অপর দিকে মুসলমানরা চায় রোমের বিজয় কারণ রোম হলো আসমানী কিতাবের অনুসারী। রোমের বিজয়ে ইসলামের কোন কল্যাণ হবে না। এরপরও মুসলমানরা বিজয় চায় কারণ পারস্য বিজয়ী হলে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী কুরাইশরা উল্লাস করবে। আমরাও তেমনি আজকের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি চেয়েছি। কারণ আওয়ামী লীগের বিজয়ে নাস্তিক-মুরতাদ গোষ্ঠী উল্লাস করে। তাছাড়া আইন-আদালত ও প্রশাসনের সকল স্তর থেকে আমরা হতাশাজনক আচরণ পাচ্ছিলাম।

আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছায় নিজেকে ইসলামী শক্তির মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। আওয়ামী লীগের হাত শাপলা চত্বরে শাহাদত-বরণকারী সদ্য শহীদ ভাইদের রক্তে রঞ্জিত। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের যদি উচিত শিক্ষা না হয় তাহলে এ দেশে ইসলামের বাণী তার স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে

> *না। জানি, আওয়ামী লীগের পরাজয়ে যে শক্তি বিজয়ী হয়েছে তারাও রোম সাম্রাজ্যের মতো। তাদের বিজয়ে ইসলামের কোন কল্যাণ হবে না। দুই দিন পরে এই রোমের বিরুদ্ধেই মুসলমানদেরকে অভিযান চালাতে হয়েছে। আজকের আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষের বিজয়েও ইসলামের কোন কল্যাণ হবে না। দুই দিন পর তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে অভিযান চালাতে হবে। তবুও এ প্রেক্ষিতে আমরা আওয়ামী লীগের পরাজয় চেয়েছি এবং সর্বোতভাবেই চেয়েছি।*

আমরা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পিছিয়ে থাকার সংবাদগুলো পাচ্ছিলাম রেডিওর সংবাদে সেই সাথে উল্লাসে ফেটে পড়ছিলো কাশিমপুরের বন্দীগণ। একদিকে ঘটছিলো আওয়ামী লীগের পরাজয়, অপর দিকে পাল্টে যাচ্ছিলো প্রশাসনের আচরণ। এগুলো তো আমাদের চাক্ষুষ দেখা ইতিহাস।

এভাবে দৈনন্দিন কার্যসূচির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটগুলো সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলো। আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মে মামুলাত ও কাজকর্ম চলছিলো। এরপর চলে আসলো পবিত্র রমযান। পবিত্র রমযানে দৈনন্দিন কার্যসূচি ও মামুলাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসলো।

পবিত্র রমযানের মামুলাত

আমার এবারের রযমানের শুরুটাই হয়েছে একটা ঝামেলার মধ্য দিয়ে। এমনিতে তো জেলখানার বন্দিত্ব আছেই, তার উপর বাড়তি ঝামেলা হিসেবে যেটা আসলো সেটা হলো, খুলনার চালান। খুলনার মামলায় হাজিরার তারিখ ছিলো ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার। এ দিনই ছিলো ১ রমযান। তাই রমযানের আগের দিন বুধবার কাশিমপুর থেকে খুলনা চালান হলো আমার। দূরবর্তী চালান সকালেই যাত্রা শুরু হওয়ার কথা কিন্তু পুলিশের স্কোয়াডের সমস্যার কারণে বিলম্ব হলো। পুলিশ স্কোয়াড আসলো দুপুর ১২টার সময়। ১২ টায় রওয়ানা দিয়ে খুলনা জেলে পৌছতে পৌছতে বেজে গেলো রাত প্রায় নয়টা। জেলখানার অফিসিয়াল কাজকর্মের লোকজন সব নামাযে চলে গেছে। তাই জেলগেটের অফিসেই প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হলো। এভাবে রমযানের প্রথম নামায মাগরিব রাস্তায় আদায় করার পর ইশা ও তারাবীহ নিয়েও জটিলতা হলো। আমি অবশ্য জেল-পাহারাদারের কাছ থেকে জায়নামায নিয়ে অফিসেই একা একা নামায শুরু করে দিয়েছিলাম। ইশার নামায পড়ে

তারাবীহও শুরু করে দিলাম। অর্ধেক মতো তারাবীহ্ অফিসে আদায় করার পর ঢুকলাম জেলে। আমদানীর লোকজন তো পূর্ব পরিচিতই। বাকি তারাবীহ সেখানে আদায় করলাম। প্রথম দিনের তারাবীহতে সূরা বাকারার তেলাওয়াত শেষ হলো। খুলনায় থাকলাম দুই দিন। বৃহস্পতিবার হাজিরা দিয়ে শুক্রবার দিন সকালে আসতে পারতাম। কিন্তু জুমার সুবিধার্থে ঐ দিনটা খুলনা জেলেই থেকে গেলাম। খুলনা জেল থেকে কাশিমপুর চালান নিয়ে রওয়ানা করলাম রাত আটটার পর। খুলনা জেলের দুই দিনের তারাবীহতে সূরা মায়েদা পর্যন্ত তেলাওয়াত হলো। সালাতুদ্দোহা, সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদেও তেলাওয়াত শুরু করে দিলাম। কিন্তু চালানের রাত্রের তারাবীহ নিয়ে পড়ে গেলাম সংশয়ে। কী হবে, কে জানে। কিন্তু ভাগ্য ভালো, সাড়ে আটটায় জেল গেট থেকে অটোরিক্সা নিয়ে রওয়ানা হয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসের টিকেট কাটলাম রাত সোয়া দশটার। হাতে বেশ সময় ছিলো। সাথে শরীফও ছিলো। বাস কাউন্টারে এক কোণে দাড়িয়ে আমি আর শরীফ জামাতের সাথে ইশার নামায পড়লাম। তারাবীহও পড়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম। আধা পারা তেলাওয়াত হলো। রাতে আর কিয়ামুল লাইলের সুযোগ হলো না। শেষ রাতে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে সেহরী খেলাম। নবীনগর নামলাম বাস থেকে। খবর দিয়ে রেখেছিলাম। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলো। রাস্তায় ফজর নামায আদায় করে স্বল্প সময়েই সোজা চলে এলাম কাশিমপুর কারাগারে। তৃতীয় রোযা শনিবার সকাল থেকে আমার জেল গন্তব্যে এসে রমযানের বিশেষ পরিকল্পনায় মামুলাত শুরু করতে পারলাম। সকল প্রশংসা এক আল্লাহর।

বেশ কয়েক বছর থেকে রমযান মাসে যেভাবে আমল করার তাওফীক হয়, সেটা হলো। তারাবীহতে এক খতমের পাশাপাশি সালাতুদ্দোহা, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদ– তিন নফলে আরো তিন খতম। তারাবীহতে যে অংশটুকুর তেলাওয়াত হয় সেটাই প্রতিদিন তিন নফলে তিনবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে তিন খতম পূর্ণ হয়। আর এছাড়া দেখে দেখে এক খতম। আর শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে নামায ও তেলাওয়াত মিলিয়ে আরো এক খতম। এভাবে চলেছে বিগত কয়েক বছরের রমযান।

এবার যেহেতু রমযান কাটছে জেলখানায়, স্বাভাবিকভাবেই মামুলাতে একটু পরিবর্তন আছে। এ বছর রমযান কাটছে সীমাবদ্ধ একটি পরিসরে। বিকাল পাঁচটা থেকে পর দিন সকাল সাতটা আটটা পর্যন্ত তো একটি রুমের ভিতরে কাটে সময়। আমরা যে রুমে থাকি, এখানে আমিসহ আছি তিনজন। আগেই বলেছি, বাকী দু'জনই আমার ছাত্র। হুসাইন আর নিযামুদ্দীন।

নিযামুদ্দীনের মামুলাত হলো অতি মানবীয় ও বিস্ময়কর। সারা বছরই সে রাত একটার দিকে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ শুরু করে দেয়। সম্ভবত প্রতিদিন তার আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদ মিলিয়ে ১০ পারা তেলাওয়াত চলে। এটা হলো তার নিয়মিত প্রতিদিনের আমল। সহীহ হাদীসের মধ্যে যে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে দুটি গুণ এবং দুই ব্যক্তি হলো ঈর্ষণীয়।

এক. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন। অতঃপর সে রাতে দিনে লম্বা লম্বা সময় দাড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে।

দুই. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর সঠিক পথে ব্যাপক দান করার সুযোগ দিয়েছেন। (বুখারী)

মাওলানা নিযামুদ্দীনের সাধারণ সময়ের কুরআন তেলাওয়াত দেখেই মাওলানা আবুল বাশার সাহেব বলেছিলেন, 'তার আমল দেখে গিবতা (ঈর্ষা) হয়। আবুল বাশার সাহেব নিযামের রমযানের আমল দেখলে যেন কী বলতেন! নিযামুদ্দীন আগের এক রমযানে একত্রিশ খতম করেছিলো। এরপর করেছিলো একচল্লিশ খতম। এ বছর তার টার্গেট ছিলো একান্ন খতম। ইচ্ছা ছিলো পর্যায়ক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত একষট্টি খতম পর্যন্ত পৌঁছা।

তবে একান্ন খতমের টার্গেট করে এবার তার বিশ্বাস হয়ে গেছে সেটা সম্ভব নয়। কারণ একান্ন খতমও তার পূর্ণ হচ্ছে না। তবে একান্ন খতম না হলেও এই রমযানেই চল্লিশের কম হবে না ইনশাআল্লাহ। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিযামুদ্দীনের রমযানের কার্যসূচি হলো– মাগরিবের পর এক থেকে দেড় ঘণ্টার ঘুম, ফজরের পর দেড় ঘণ্টা ঘুম। আর দিনের বেলায় দুপুরের দিকে আধা ঘণ্টার ঘুম। এছাড়া সাহরী ও ইফতার মিলিয়ে এক ঘণ্টা। এর বাইরে অযু-ইস্তেঞ্জা আর নামায ছাড়া আর কোন কথা ও কাজ নেই। সারাদিন কুরআন দেখে দেখে আর সারা রাত নামাযরত অবস্থায় দাড়িয়ে ও বসে চলতে থাকে অনবরত তেলাওয়াত। বেশি দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে নামায পড়তে পারে না। তাই বসার সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে। তবে বেশি খতমের টার্গেটে তেলাওয়াত একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বিশ মিনিটে এক পারা পড়ে। একান্ন খতমের টার্গেট পূর্ণ না হওয়ায় আর একষট্টি খতমের ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হওয়ায় আগামীর ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম চিন্তা। আমিও পরামর্শ দিয়েছি আরো ধীরে ধীরে তেলাওয়াতের। সর্বনিম্ন আধা ঘণ্টায় যেন এক পারা শেষ হয়।

কারাগারের রমযানে আমার মামুলাত ও কার্যসূচি একটা ছকবদ্ধ রুটিন অনুযায়ী চলছে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আটটা বেজে যায়। অযু-ইস্তেঞ্জা সেরে দুই দুই চার রাকাত সালাতুদ্দোহা (দুই রাকাতে সালাতুত তাওবার আর দুই রাকাতে সালাতুল হাজতেরও নিয়তসহ) আদায় করি। সাধারণত দুই পারা তেলাওয়াত হয় সালাতুদ্দোহায়। ঘন্টা খানেক বা কিছু বেশি সময় লাগে এই চার রাকাত নামাযে। এরপর শুরু করি লেখা। কারাগারের জীবন ও স্মৃতি নিয়ে চলমান লেখাটি কারাগারে থাকতেই সমাপ্তির পথে নেওয়ার চেষ্টা করছি। রমযান পর্যন্ত চালান-কোর্ট-রিমান্ড টানা-হেচড়াতেই প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। রমযানে এসে আল্লাহর খাছ রহমত হয়েছে যে, অনেকগুলো মামলার জামিন হয়ে যাওয়ায় কোর্ট হাজিরার তারিখ কমে গেছে। এরপরও দুই দিন কোর্ট হাজিরার নির্দিষ্ট তারিখ ছিলো। কিন্তু হরতালের কারণে দু' দিনই এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে যাই। একভাবে লিখতে পারার কারণে যতটুকু লেখার পরিকল্পনা ছিলো আলহামদুলিল্লাহ টার্গেট পূর্ণ হওয়ার পথে। এভাবে এক নাগাড়ে বিকাল পর্যন্ত লিখি। মধ্যখানে একঘেয়েমী দূর করতে সামান্য সময় পত্রিকা পড়া বা সাথী-সঙ্গীদের সাথে কিছু কথাবার্তা হয়। জোহরের নামাযের পর নিয়মিত তালীমের নিয়ম চালু আছে। বেশ কয়েক দিন সাথীদের অনুরোধে রমযান ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি।

রমযানে অনেকে সাক্ষাত করতে এসেছে তাদের সাথে কথা বলেছি। ইফতারের আগ দিয়ে সামান্য সময় কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। ইফতারের আয়োজনে শরীক হই। মাগরিবের নামায জামাতে পড়ে আওয়াবিন পড়ি। এক পারা পর্যন্ত ছয় রাকাত আওয়াবিনে পড়া হয়। এরপর একটু ঘুমাই। রাত আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ঘুমের টার্গেট থাকে। কোন কোন দিন একটু কম-বেশি হয়। এরপর জামাতের সাথে ইশার নামায আদায় করি। এরপর আমি আর হুসাইন দু'জন মিলে তারাবীহর জামাত পড়ি। প্রথম তিন দিনের কিছুটা এলোমেলোর পর পাঁচ পারা করে পড়ে নবম তারাবীহতে এক খতম শেষ করি। একটু ধীরে-সুস্থেই পড়ার চেষ্টা করি। পাঁচ পারা পড়তে একটু চাপ হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় খতম শুরু করি তিন পারা করে। দশ দিনে আরেক খতম হয়ে আজ ইনশাআল্লাহ তারাবীহর তৃতীয় খতম শুরু হবে। তারাবীহর আট বা বারো রাকাত হলে রাত একটার দিকে দস্তরখান বিছানো হয়। চা-নাশতা চলে। এরপর অবশিষ্ট তারাবীহ শেষ করতে সোয়া দুইটা আড়াইটা বেজে যায়। তারাবীহর প্রতি চার রাকাতের বিরতিতে একটু সময় নিয়ে সেই দরূদের আমলটা করি। তারাবীহর জামাতের সাথে বেতেরও পড়ে নেই। এরপর ঘন্টা খানেক সময়

পাই। সময়টা তাহাজ্জুদের মধ্যে কাটানোর চেষ্টা করি। সালাতুদ্দোহা, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদ মিলিয়ে খতম পড়ি। দুই খতম পূর্ণ হয়ে তৃতীয় খতমের অর্ধেকের কাছাকাছি পৌঁছেছি। সেহরীর পর আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের নামায জামাতে পড়ি। সোয়া চারটা-সাড়ে চারটার মধ্যে আবার শুয়ে পড়ি। ঘুম চলে সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। মোটামুটি এই এক রুটিনেই আজ উনিশ রোযা পর্যন্ত চলছে। গতকালকে আমার সর্বশেষ মামলার জামিন হয়েছে। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে আল্লাহ চাহে তো মুক্তি পাওয়ার আশা করছি।

কারাগারে ইফতার উৎসব

জামিনে মুক্তি পেয়ে চলে যাওয়ার সময় আবুল বাশার সাহেবকে সবাই আবদার করেছিলো, খাওয়ানোর জন্য। তিনি খাইয়েছিলেন। তবে চলে যাওয়ার পর। এখানকার সবার সাথে আমার হৃদ্যতাটা আরো বেশি ও ঘনিষ্ট। তাই আমার জামিনের বেশ আগে থেকেই আবদার টাবদার নয় সরাসরি ভালো একটা খাওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। আমিও সানন্দেই সম্মত হই। ২৮ জুলাইয়ের মধ্যেই জামিন হবে এমন একটা আশাবাদ তৈরি হওয়ার পরই হুসাইনকে বললাম, আয়োজন করে ফেলো। গাজী আর মুঈনুদ্দীনসহ অন্যদের সাথে পরামর্শক্রমে শনিবার দিন ১৭ রমযান ইফতারের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হলো। খাবারের মেন্যু নির্ধারিত হলো ভুনা খিচুড়ি আর গরুর গোশতের ঝোল ঝোল ভুনা। সাথে হালকা ইফতারী আইটেম। কিন্তু বাজার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে শনিবার দিন আয়োজন করা সম্ভব হলো না। অগত্যা রবিবারই করতে হলো। একদিন আগের টার্গেট থাকায় রবিবার দিন সকাল থেকেই বেশ একটা উৎসব উৎসব আমেজে রান্না-বান্নার আয়োজন শুরু হলো। হাড় ছাড়াই পিওর সাত কেজি গরুর গোশত। আট কেজি পোলাওর চাউল, তিন কেজি মুগ ডাউল। আর বাকি সব পর্যাপ্ত পরিমাণ মতো। পাঁচ তলা আর চার তলার পূর্ব দুই ব্লকের যারা আছে তাদের সেবকসহ চল্লিশজনের পরিকল্পনায় আয়োজন হলো।

বিকালের আগেই চৌকা থেকে রান্না হয়ে চলে আসলো। বণ্টন করার জন্য শরীফকে দিয়ে খিচুড়ি আর গোশতের আলাদা আলাদা ওয়ান টাইম চল্লিশ চল্লিশ আশিটি বাটি আর প্যাকেট আনিয়ে ছিলাম। এভাবে সুন্দরভাবে বণ্টন করা হলো, সাথে সাথে টমেটো খিরাইয়ের সালাদ। ইফতারের জন্য আম-দুধের জুস সেই সাথে আপেল আর খেজুর। মোটামুটি ভালো একটা আয়োজন হয়ে গেলো। ব্লকের বাইরেও পরিচিতদের জন্য প্যাকেট পাঠিয়ে দিলাম। নাসিরুদ্দীন পিন্টু

ভাইয়ের ওখানে এক প্যাকেট পাঠালাম। মুফতী সাহেবের কাছেও পাঠানো হলো। একদিকে জামিনের সুসংবাদ অপর দিকে এমন উৎসবের আমেজ সব মিলিয়ে জেল জীবনে সুন্দর উপভোগ্য একটি দিন কাটলো ১৮ রমযান ২৮ জুলাই রবিবার।

মুক্তির আভাস ও নতুন শঙ্কা

বহু চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে ১৮ রমযান মোতাবেক ২৮ জুলাই রবিবার মিরপুর থানার ৭৫(২) ১৩ নং মামলার জামিনের মধ্য দিয়ে আপাতত মামলামুক্ত হলাম। এদিন ঢাকার জেলা দায়রা জজ আদালতে সকাল দশটার পর আমার এই আঠারোতম মামলার জামিন হয়। ইতিপূর্বে হাইকোর্ট থেকে দুটি, জজকোর্ট থেকে আরো দুটি, (এটিসহ মোট তিনটি) ও অবশিষ্ট তেরটি মামলার জামিন হয়েছিলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে। এখন অপেক্ষা হলো বহু কাঙ্ক্ষিত শুভ মুক্তির। শেষ জামিন হওয়া মামলাটির জামিনের কাগজ জজকোর্ট থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হয়ে, আর হাইকোর্টে সপ্তাহ খানেক আগে জামিন হওয়া দুটি মামলার কাগজ হাইকোর্ট থেকে খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট অতঃপর খুলনা জেল হয়ে কাশিমপুর আমাদের এই হাইসিকিউরিটি কারাগারে পৌঁছার অপেক্ষায় আছি। জামিনের এ কাগজগুলো জেলগেটে পৌঁছলেই আমার মুক্তি পাওয়ার কথা। গত রবিবার দিন ২৮ জুলাই শেষ মামলায় জামিনের সংবাদ শুনেই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে শোকরানা সিজদা আদায় করেছিলাম। তখন থেকেই তো মুক্তির সুবাতাস গায়ে লাগছে। দীর্ঘ দুই চিল্লার পর জেল জীবন থেকে মুক্তি পাবো– এমন স্বপ্ন মনের মধ্যে অনেক তোলপাড় সৃষ্টি করছে। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর মাকবারায় যাবো। আম্মাজানের কপালে চুমু খাবো। মিদাদ, ইমাদ ও যিমামদেরকে আলিঙ্গন করে বুকে জড়িয়ে ধরবো। প্রিয়তমা স্ত্রীর বিরহ-যন্ত্রণা ঘুঁচবে। অন্যান্য সকল আপনজনদের মাঝে ফিরে গিয়ে মুক্ত জীবনের স্বাদ পাবো। কল্পনার রঙ্গিন ভেলায় চড়ে মুক্তি পাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কাল্পনিক সুখ-সাগরে সন্তরণ করবো– এটাইতো স্বাভাবিক। রাতের নিকষ ঘন কালো আঁধারকে হটিয়ে পৃথিবীময় আলো ছড়াতে প্রভাত সূর্যের উদয় হয়। আর নতুন ভোরের সেই সূর্যোদয়ের পূর্বাভাষ ছড়িয়ে দিয়ে যায় প্রিয় সুবহে সাদিক। ভোরের আগমনী বার্তা হয়ে আসা সুবহে সাদিকে কোন সংশয় থাকে না। থাকে না কোন কলঙ্ক। থাকে শুধু একরাশ নিষ্পাপ আলোরচ্ছটা।

অথচ আমার মুক্তির সূর্যোদয়? আমিও তো মুক্তির পূর্বাভাষ পাচ্ছি। কিন্তু এ পূর্বাভাষ সুবহে সাদিকের মতো সংশয়হীন নয়, নয় শঙ্কামুক্ত। আঠারোটি মামলায় জামিন পেয়েছি আদালত থেকে। আমি তো ভয়-বাধাহীন মুক্ত বিহঙ্গের

মতো হাসতে হাসতে জেলগেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে পরিবেশ নেই। মানুষের সুখের জীবনের সুবহে সাদিক আমার দেশে আজ শঙ্কামুক্ত নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই এটিও স্বার্থপর রাজনীতির নির্মম শিকার।

> *আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ প্রচলিত ক্ষমতার পূজারীরা আমাদের দেশে বহু অন্যায়-অবিচারের পথ খুলেছে। তবে বিগত দুই দশকের ক্ষমতার পালা বদলকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রতিবারই নতুন নতুন কিছু অন্যায়-অবিচারের রাস্তা দেখায়। আর অপদার্থ বিএনপি এসে সে পথই অনুসরণ করে। আওয়ামী লীগের এবারের বিশেষ উদ্ভাবন হলো, নিম্ন আদালত থেকে রাজনৈতিক মামলার জামিনকে জটিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে অঘোষিত নিষিদ্ধ করে দেয়া।*

যে ধরনের মামলায় আগে নিম্ন আদালতের কাঠগড়ায় দাড়ালেই জামিন হয়ে যেতো, বিচারকরা জামিন দিয়ে দিতেন, সেই ধরনের মামলাতেই এবার আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকালে জামিন দেওয়ার হার প্রায় শূন্যের কোঠায়।

> *আওয়ামী লীগের এবারের আরেক উদ্ভাবন ও বহুল ব্যবহৃত কৌশল হচ্ছে রি-এ্যারেস্ট বা পুনঃগ্রেফতার। তিন মাস, চার মাস, ছয় মাসের মতো কিংবা তার চেয়েও দীর্ঘ সময় পর উচ্চ আদালত থেকে জামিনে বের হওয়ার পর জেলগেট থেকে পুনঃ গ্রেফতার করা। একবার, দুইবার, তিনবার বা তার চেয়েও বেশি পুনঃ গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন অনেকে।*

আদালতের উপর থেকে সরকারের প্রভাব কিছুটা কমার পর কিছুদিন আগের ঘটনা শুনেছি, তৃতীয়বার পুনঃ গ্রেফতার করে একজনকে আদালতে উঠানোর পর বিচারক বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উপস্থিত জামিন দিয়ে কোর্ট থেকেই ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। দীর্ঘ প্রতিক্ষা ও বহু কাঠখড়ি পুড়িয়ে জজকোর্ট-হাইকোর্ট করে জামিন নিয়ে জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যদি আবার জেলগেট থেকেই আটক করা হয়, সেটা যে কত কষ্টের ভুক্তিভোগী ছাড়া অনুভব করা কঠিন।

> *আর সরকারের এই পলিসির কারণে পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী আর জেল কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে বিশাল মুক্তি বাণিজ্যের একটা সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। তাই আদালত থেকে জামিন*

পাওয়ার পরও নিরাপদে বাড়ি যেতে পারবো– এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হয় মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে আগে থেকেই ম্যানেজ করতে হবে আর না হয় পুনঃ গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়েই জেলগেট থেকে বের হতে হবে। টাকা দিলেও অনেক সময় পার পাওয়া যায় না।

এই ধরনের চূড়ান্ত এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কাটছে আমার সময়। আল্লাহ তুমি আছান কর। জামিনের খবর পাওয়ার পর মুক্তির স্বপ্নগুলো যখন রঙ্গিন হয়ে আমার কল্পনার আকাশে ভাসতে আরম্ভ করলো, সহসাই নিরাপদে বের হতে পারবো কি না? বন্দিত্বের এই জীবনের অবসান ঘটবে কি না? না আবার পুনঃ গ্রেফতার নামক বিষাক্ত তীরের ছোবলে লন্ডভণ্ড হয়ে যাবে আমার সকল স্বপ্নসাধ– এমন হাজারো দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছে রঙ্গিন স্বপ্নগুলোকে। স্বপ্ন দেখারও স্বাধীনতা নেই। লাখো শহীদের রক্তের কি প্রাপ্য ছিলো এমনই স্বাধীনতা?...

বন্দী জীবনের দুঃসহ যত স্মৃতির কথা

বন্দী জীবন স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত জীবনের মতো আনন্দদায়ক নয়। বন্দীত্বই বড় যাতনা। বড় কষ্ট। বর্তমানে আমাদের কারাগারগুলোতে জীবনযাত্রার যে অবস্থা তাতে আমাদের মতো সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উঠে আসা মানুষের শারীরিক কষ্ট ভোগের খুব একটা ক্ষেত্র নেই। কষ্ট বলতে মূলত মানসিক যন্ত্রণা ও যাতনাই এ জীবনের নিত্য সঙ্গী। কেউ যদি মানসিক দৃঢ়তা কিংবা ঈমানী শক্তি দিয়ে এ যাতনার মোকাবেলা করতে পারে তাহলে কারাগার তার কাছে খুব কষ্টকর কিছু মনে হবে না। এরপরও কিছু কিছু ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি এমন আসে বা আসতে পারে যা আসলেই খুব কঠিন।

আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার কারা জীবনের দিনগুলোতে প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই (এখন পর্যন্ত) শারীরিক ও মানসিকভাবে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দে থাকার তাওফীক লাভ করেছি। তবে কিছু কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতি যে ব্যতিক্রম ছিলো না তা নয়। তেমনি কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

শ্বাসরুদ্ধকর গ্রেফতার

প্রথম ব্যাপারটাই তো ছিলো গ্রেফতার হওয়া। আমাকে আর শহীদ ভাইকে ডিবি পুলিশ যখন আটক করে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিলো সেই থেকে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত উভয় সম্ভাবনার দোদুল্যমানতায় দুলছিলাম। কখনো মনে হচ্ছিলো হয়তো ছেড়ে দিবে। আবার ক্ষণিকের ব্যবধানেই সেই আশার আলো হতাশার কালো মেঘে আচ্ছন্ন হচ্ছিলো। ওসি সাহেব যখন আমাকে ডেকে কথা বললেন এবং নিশ্চিত হলেন আমি যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মামুনুল হক। এরপর আলাপচারিতায় আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে ধারণা পেলেন যে, আমরা আঠারো দলীয় জোটে অন্তর্ভুক্ত নই তখন তাকে আমার ব্যাপারে বেশ নমনীয় মনে হলো এবং বেশ সমীহও করলেন তিনি আমাকে। আমাদেরকে গারদে না রেখে বাইরে চেয়ারে বসতে দিতে বললেন। একটু পর একজন এস. আই এসে জানতে চাইলেন হাইকোর্টের জামিননামা সাথে আছে কিনা, না থাকলে আনতে বললেন। তখন মনে হয়েছিলো, ব্যাপারটি সহজের দিকে যাচ্ছে। সাঈদ ভাইকে দ্রুত জামিনের কাগজ নিয়ে আসতে বললাম। কিন্তু

কিছুক্ষণ পর আমাদেরকে নিয়ে আবার গারদে আটকানো হলো। মূলত তখনই এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমার ভাগ্যের ব্যাপারে। কিছুক্ষণ পর শহীদ ভাইয়ের মাদরাসা থেকে দু'জন ছাত্র আসল। এরা হলো তালীমুল মিল্লাত ফাযিল মাদরাসায় ছাত্রলীগের লোক। পুলিশের সাথে বেশ দহরম মহরম এদের। এদের কথায় পুলিশ কাউকে ধরে আবার কাউকে ছাড়ে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে এরা শিবিরের লোক বলেই পরিচিত ছিলো। ক্ষমতার পালাবদলে এরা রাতারাতি লীগ হয়ে যায়। যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করা যেতে পারে, শিবিরের এ্যাসাইন্টমেন্ট নিয়েই এরা কৌশলগত কারণে ছাত্রলীগের খোলস পরেছে। তারা এসেই প্রথমে আমাদেরকে বলল, শহীদ ভাই একা হলে কোন ব্যাপারই ছিলো না। আমার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এরপরই তারা ওসি সাহেবের রুমে ঢুকে কথা বলল, কিছুক্ষণের মধ্যে সেন্ট্রি এসে শহীদ ভাইকে ডেকে বের করে নিয়ে গেলো। আমার গন্তব্যের ব্যাপারে অবশিষ্ট সম্ভাবনাটুকুও মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। আল্লাহর উপর ভরসা করে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। পেণ্ডুলামের মতো উভয় সম্ভাবনার দোলাচলে দুলতে থাকা এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল শ্বাসরুদ্ধকর।

মামলার পর মামলা

তুলনামূলক কঠিন পরিস্থিতির তালিকায় এর পরের যে ঘটনা সেটি হলো ১৭ মে শুক্রবার ঢাকা থেকে আমার নামে মামলা আসায় আশাহত হওয়ার ও স্বপ্নভঙ্গের দুঃখজনক ঘটনা। শুক্রবার দিন আসল মতিঝিল থানার ১৩(৫)১৩ নং একটি মামলা। শনিবার দিন অফিসের একজন আমাকে বলল, মিরপুর থানা থেকে ফোন এসেছিল, আপনার নামে আরো মামলা আসবে। আমি কিছুটা আশ্চর্যবোধ করলাম মিরপুর থানার নাম শুনে। কারণ হেফাজতে ইসলামের শাপলা চত্বরের ঘটনায় বহু মামলা হয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলোর মধ্যে আমার নাম এজাহারে উল্লেখ আছে এটা আমার জানা ছিলো। হেফাজতে ইসলামের ঘটনায় মিরপুরে মামলা হওয়ার কোন কারণ খুঁজে না পাওয়ায় ব্যাপারটি রহস্যময় থেকে গেলো।

যাই হোক মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম হেফাজতের ঘটনায় দায়ের কৃত আমার নামের অবশিষ্ট মামলাগুলো আসবে। ব্যাপারটি নিয়ে খুব একটা বিচলিত ছিলাম না। কারণ ইতিমধ্যে আলাপ-আলোচনায় জেনেছি যে, এক মামলার জামিনের যেই সময় লাগে দশ মামলার জামিনের একই প্রক্রিয়া। তাই যত দ্রুত অবশিষ্ট মামলাগুলো আসবে ততই মঙ্গল। রবিবার ১৯ মে সকাল বেলা

আমার কেইস টেবিল থেকে ডাক আসল, 'মামুনুল হক পিতা আজিজুল হক'। এদিন তিনটি মামলা এল এবং সেই লোকের কথা অনুযায়ী ঠিকই মিরপুর থানার মামলা। অপেক্ষায় থাকলাম হেফাজতের ঘটনায় দায়েরকৃত মতিঝিল, পল্টন, রমনা প্রভৃতি থানার মামলাগুলো আসার। আর কিছুটা রহস্যময়তায়ও আচ্ছন্ন থাকলাম মিরপুর থানার মামলা আসায়। একদিন বাদে আবার কেইস টেবিল থেকে আমার ডাক আসল। কেইস টেবিলে যেতেই রাইটার বলল, আরো নয়টি মামলা এসেছে। নয়টি মামলার কথা শুনে মনে মনে কিছুটা আনন্দিত হলাম যে, এবার মনে হয় হেফাজতের সবগুলো মামলা এক সাথে চলে এসেছে। ভালো হবে, সব মামলার কাজ এক সাথে শুরু করা যাবে। কিন্তু কেইস স্লিপ হাতে পাওয়ার পর তো আমার চোখ চড়ক গাছে। একি! নতুন সবগুলো মামলা মিরপুর ও দারুস সালামের। তিন আর নয় মোট বারোটি মামলা। ছয়টি মিরপুর ও ছয়টি দারুস সালাম থানার। মূল মামলার মাত্র মতিঝিলের একটি। দায়েরকৃত এজাহার নামীয় মামলা আসার আগেই মামলা সংখ্যা তেরো! সেই সাথে চুয়ান্ন ধারার আটকাদেশ তো আছেই। মোট চৌদ্দ মামলার আসামী আমি। এক দিকে তো বিরাট একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। মিরপুর অঞ্চলের সাথে আমার বা আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখান থেকে বারোটি মামলা আসার রহস্য কী? অপর দিকে পুরো জেলখানায় চাউর হয়ে গেলো আমার চৌদ্দ মামলার সংখ্যাটি। বিএনপি, জামাত, হেফাজত সব ঘরানার লোকজন আমার সাথে কৌতুক করে বলতে লাগলো, 'নেতা যত বড় মামলা তত বেশি'। মামলার এই সংখ্যাধিক্য আমার জন্য একদিকে যেমন কষ্ট-ঝামেলা- বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। অন্যদিকে এই ব্যাপারটি সবার চোখে আমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপলক্ষ্য হয়েছে। খুলনা থেকে বয়ে আনা চৌদ্দটির সাথে ঢাকায় আসার পর মিরপুর থানা থেকে আরো একটি এবং মতিঝিল থানার আরো দুটি এই তিনটি মামলা যুক্ত হয়েছে। আর খুলনা সদর ও সোনাডাঙ্গা থানার দায়েরকৃত ফেব্রুয়ারি মাসের দুটি তো আছেই। সর্বমোট উনিশটি মামলার মুখোমুখি হলাম এই জেল জীবনে। আরো নয়টি মামলার এজাহার নামীয় আসামী হওয়ায় সেগুলোর খড়গও ঝুলছে মাথার উপর।

১৯ + ৯ মোট আঠাশটি মামলার কোনটি চুরি, ডাকাতি বা সন্ত্রাসের দায়ে নয় বরং অপরাধ আমার একটাই। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জতের পক্ষে কথা বলা, নাস্তিক্যবাদ বিরোধী চলমান আন্দোলনে সামান্য

হলেও ভূমিকা পালন করা। আর হেফাজতে ইসলামের উত্থাপিত ১৩ দফার পক্ষে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মান রক্ষার আন্দোলনের অপরাধে আরোপিত বিশাল সংখ্যার এই মামলা দুনিয়াতেও সবার চোখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধম এই উম্মতীর মর্যাদাই বৃদ্ধি করেছে। রিমান্ড চলাকালীন মিরপুর থানার গারদে মাদকের মামলায় আটক এক অভিজাত যুবকের কথা আমাকে এখনো অনুপ্রাণিত করে। সে বলেছিলো, 'মামুন ভাই! মাদকের মামলা আমাদের জন্য অপমানজনক কিন্তু আপনি যে অপরাধে আজ বন্দী, যে অপরাধে আপনার পায়ে ডান্ডাবেবড়ি সেটা অপমানের নয় সেটা গৌরবের'। আধুনিক শিক্ষিত এক যুবকের কথায় এখনো আমি অনুপ্রেরণা খুঁজি। নিশ্চয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে দরবারের কুকুর হতে পারা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান রক্ষার আন্দোলনের সৈনিক হওয়ার অপরাধ (?) আমার সারা জীবনের অহঙ্কার! আমার গৌরব! হে আল্লাহ! শত্রুরা বহু মামলার আসামী করে, হাতে হ্যান্ডকাপ পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে তোমার নবীর সম্মান রক্ষার আন্দোলনের এই অপরাধীকে কোর্টে উঠিয়েছে। দিনের পর দিন থানার গারদে ফেলে রেখেছে, ঢাকা থেকে খুলনার পথে পথে এভাবে ঘুরিয়েছে। তোমার দরবারে অধম পাপিষ্ঠ এই বান্দার আকুতি– কিয়ামতের দিন এভাবেই তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করে দিও! আমীন।

পুনশ্চঃ মিরপুর ও দারুস সালাম থেকে আমার নামে শ্যেন এ্যারেস্ট দেখানো মামলা তেরটি ডিসেম্বর ১২ থেকে এপ্রিল ১৩ সময়ের মধ্যে জামাত-শিবিরের হরতাল ও আন্দোলনে মিরপুর অঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মামলা। জামাত-শিবিরের এই ঝুলন্ত মামলাগুলোতে আমাকে জড়ানোর রহস্যটা পরে অবশ্য মিরপুর থানার রিমান্ডে থাকাকালীন আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। রিমান্ডের আলোচনায় তার বিবরণ লিখব ইনশাআল্লাহ।

ডান্ডাবেড়ি

আমার কারা জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময় আমাকে যে কষ্ট বয়ে বেড়াতে হয়েছে সেটি হলো– দুই পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানো। আমি হিসাব করে দেখলাম সব মিলিয়ে আনুমানিক ২৩৮ ঘণ্টা সময় ডান্ডাবেড়ি পরে আমাকে থাকতে হয়েছে। দিনের হিসাব করলে প্রায় দশ দিনের সমপরিমাণ হয় এই সময়। এর মধ্যে রিমান্ডে থাকাকালীন ও অগ্র-পশ্চাত মিলিয়ে লাগাতার প্রায় ৯০ ঘণ্টা ডান্ডাবেড়ি পরে থাকতে হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, নামায আদায় এমনকি ইস্তিঞ্জা ও অযু-গোসলও এই অবস্থাতেই করতে হয়েছে। বেড়ি লাগানো থাকায় এই চার দিনে কোন কাপড়ও পরিবর্তন করা যায়নি। এক কাপড়ে প্রচণ্ড গরমের দিনে ঘামে একাকার হলেও কিছু করার ছিলো না।

প্রচলিত জেলখানার নিয়ম হলো, তিন বা ততোধিক মামলার আসামী হলে ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে কোর্টে হাজির করা হয়। এছাড়া ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির আসামীদেরকেও লাগানো হয়। দূরে কোথাও স্থানান্তরের সময় কিংবা চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে কারাগারের বাইরে নিতে হলেও ডান্ডাবেড়ি লাগানো হয়। আমার যেহেতু অনেক মামলা তাই আমিও ডান্ডাবেড়ির স্বাভাবিক আওতায় পড়ি। এক্ষেত্রে রাজ বন্দীদের ব্যাপারে ভিন্ন বিধান ও সুযোগ রয়েছে। হাইকোর্ট থেকে নাকি এমন নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার যে সকল রাজ বন্দীদের উপর বেশি ক্ষুব্ধ তাদের ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষও কঠোর হওয়ার চেষ্টা করে। ২৭ মে আমার প্রথম কোর্টে হাজিরার দিন। স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ডান্ডাবেড়ি লাগানো হবে। বিষয়টি নিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুরু হলো। কোনভাবে ব্যাপারটি এড়ানো যায় কিনা তা নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন গোলাম কিবরিয়া সাহেব। আমি ওনাকে নিবৃত্ত করতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন, আপনি বয়সে ছোট হতে পারেন কিন্তু আপনি শায়খের ছেলে আমাদের ভালোবাসার পাত্র। আমরা চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা। তিনি প্রথমে গেলেন গোলাম পরোয়ার সাহেবের কাছে। তিনিও সাড়া দিলেন। চলেন দেখি কী করা যায়। ইতিমধ্যে জানা গেল জেলার সাহেবের সাথে কোন এক সূত্রে বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম সাহেবের সম্পর্ক আছে। তাকে দিয়ে বলানো যেতে পারে। কিবরিয়া সাহেব এবার ছুটলেন তরিক সাহেবের কাছে। সাথে আছেন লিয়াকত লস্কর, নুরে আলমসহ অন্যরা। তরিক সাহেব শুনে ছুটে আসলেন। সবাই মিলে প্রথমে কথা বললেন, সুবেদার আনসার সাহেবের সাথে। তিনি জানিয়ে দিলেন– কথা বলে

তেমন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আমার কথা বললেন– ওনার ব্যাপারে ওপর মহল থেকে চাপ আছে। সম্মানিত মানুষ অনুরোধ করার পর তা রক্ষা না পেলে কেমন হয়– এই বিবেচনায় সুবেদার সাহেব নিরুৎসাহিত করলেন। তাই গোলাম পরোয়ার সাহেব বিষয়টি নিয়ে আর অগ্রসর হলেন না। কিন্তু অন্যরা তখনো দমলেন না। জেলারের আসার অপেক্ষায় থাকলেন। তাদের কথা হলো চেষ্টা করতে দোষ কী? জেলারের আগমনের অপেক্ষায় সবাই মেইন ফটকের সামনে দাড়ানো। এর মধ্যেই জেলার ঢুকলেন। তরিক সাহেব এগিয়ে গিয়ে জেলারকে অনুরোধ করলেন, 'মাওলানা সাহেব একজন সম্মানিত মানুষ, ওনাকে ডান্ডাবেড়ি থেকে মুক্তি দেয়া যায় কি না?' জেলার সাফ জানিয়ে দিলেন– আমি পারবো না, জেল সুপারের কাজ এটা। জেল সুপার তখন ঢাকায়। অগত্যা সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানোর নিয়তিই বিজয় লাভ করলো। আমি ডান্ডাবেড়ি লাগানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। কিবরিয়া সাহেব তখনো হাল ছাড়ার পাত্র নন। আমাকে স্বেচ্ছায় বেড়ি পরতে বারণ করলেন। বললেন, যদি তারা বাধ্য করে তাহলে পরবেন। আমি ভাবলাম, এই ব্যাপারটি নিয়ে আর আগে বাড়া সমীচীন হবে না। আমি ব্যাপারটিকে সহজে মেনে নিলাম। অবশেষে ডান্ডাবেড়ি লাগিয়েই কোর্টে গেলাম। গোলাম কিবরিয়া সাহেব আমার পায়ে ডান্ডাবেড়ি দেখে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। নিজের সিটে গিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে বুকের কষ্ট হালকা করার চেষ্টা করলেন।

> *এই যে শুরু হলো ডান্ডাবেড়ি লাগানো। এরপর আরো বহুবার লাগানো হয়েছে। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)-এর সন্তানের পায়ে দাগী আসামীর মত ডান্ডাবেড়ি লাগানো দেখে অনেককেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছি আমি। ডান্ডাবেড়িতে এক সময় আমি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এটাকে তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আলেম-ওলামাদের পায়ে ডান্ডাবেড়ি দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এই সরল মানুষগুলোর পাথরচাপা বুকের কষ্ট আর চোখের অশ্রু দেখে আমার হৃদয়ও ব্যথিত হয়েছে।*

গত ২৯ জুন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজবন্দী সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানোর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। এর পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে আমার ব্যাপারে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সাংবাদিক সম্মেলন করে এর প্রতিবাদ জানায়।

হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকেও বিবৃতি আসতে থাকে। যুব মজলিসও এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেয়। জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সংবাদগুলো আসায় জেল প্রশাসনের টনক নড়ে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি জেলার নুর মোহাম্মদ সাহেব নিজেই আমার সংবাদ নেয়ার জন্য আমি যেখানে পূর্বে ছিলাম সেখানে ছুটে যান। কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারের জেল সুপারকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাতে সাড়া দেন।

৮ জুলাই সোমবার দিন প্রথম বারের মতো ডান্ডাবেড়ি মুক্ত কোর্টে যাই। খাঁচা বন্দী পাখিকে ডানা বেধে ফেলে রাখার পর ডানার বাঁধন খুলে খাঁচার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে থাকার সুযোগ দেয়া হলে পাখি যেমন বন্দীত্বের মধ্যেও এক রকম স্বস্তি খুঁজে পাবে তেমনি আমিও বন্দী জীবনে এক রকম মুক্তির স্বাদ পেলাম।

এভাবেই ডান্ডাবেড়ির এই বর্বর ও অন্যায় সাজা থেকে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দান করেন। এরপর তো হাজতী সকল আসামীদেরকেই ডান্ডাবেড়ি পরানো বন্ধ করে দেয়া হয়। বাছ-বিচার না করে অপরাধ প্রমাণের আগেই শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার আরো যত জাহেলী ও বর্বর নিয়ম প্রচলিত আছে, এই জাতীয় সকল অন্যায় থেকে আল্লাহ আমাদের জাতিকে মুক্তি দান করুন।

রিমান্ড জিজ্ঞাসাবাদ

আমি মোট ১৯টি মামলা ফেইস করেছি। ২টি মামলা খুলনার। যেগুলো হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন ছিলো। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষে নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন নাকচ হয়। নিম্ন আদালতে এই দুই মামলায় রিমান্ড চাওয়া হয়নি। হেফাজতের ঘটনায় মোট ২৭টি মামলা হয়। যার মধ্যে ১২ টি মামলার এজাহারে আমার নাম আছে। তবে এই ১২ টির সবগুলো মামলায় আমাকে আটক দেখানো হয়নি। প্রথমে দেখানো হয়েছিলো মতিঝিলের ১৩ (৫) ১৩ নং একটি মামলায়। যাতে মোট ধারা ছিলো ১৮টি। এর মধ্যে হত্যার ধারাও আছে। এই মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন ছিলো এবং মামলাটি মতিঝিল থানার হলেও এটি ডিবিতে স্থানান্তরিত ছিলো। শুরু থেকেই আমরা এই মামলার কার্যক্রমে সময় ক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। যদিও আমাদের কৌশল কোন কাজে আসেনি। আমাদের কৌশল ছিলো ঢাকার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত খুলনায় থেকে যাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু খুলনা জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে খুলনা জেলে বেশি দিন রাখতে চায়নি। তাই খুলনার ৫৪ ধারার আটকাদেশ যে দিন কেটে গেলো ঐ দিনই তারা আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলো। ঢাকায় এসে ২৮ মে দারুস সালাম থানার একটি মামলায় কোর্টে উঠলাম। সেই মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন ছিলো। ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড আবেদন নাকচ করে জামিন দিলেন। এরপর ৩ জুন মিরপুর থানার ৫টি ও দারুস সালাম থানার ৫টি মোট দশটি মামলার শুনানী করা হলো। প্রতিটি মামলায় ৭ দিন করে ৭০ দিনের রিমান্ড আবেদন ছিলো। সবগুলোর রিমান্ড আবেদন নাকচ হলো।

উল্লেখ্য মিরপুর ও দারুস সালাম থানার সবগুলো মামলা ছিলো ঝুলন্ত মামলা। অর্থাৎ ডিসেম্বর ১২ থেকে এপ্রিল ১৩ পর্যন্ত এই সময়টায় বিভিন্ন হরতাল-প্রতিবাদের ঘটনায় যতগুলো মামলা এই দুই থানায় ছিলো এবং যেগুলো মূলত ছিলো ১৮ দলের বা জামাত-শিবিরের। হেফাজতে ইসলাম বা আমাদের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক ছিলো না। কোন একটি মামলার এজাহারেও আমার নাম ছিলো না। অজ্ঞাত নামা আসামীদের মধ্যে আমার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। মিরপুর অঞ্চলের ডিসি যখন দেখলো মিরপুর-দারুস সালামের ১২ টি

মামলার মধ্যে ১১ টিরই রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর হয়ে গেছে তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে মিরপুর থানার আরো একটি ঝুলন্ত মামলার সরাসরি চার্জশিটে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। যেহেতু চার্জশিটেই নাম দিয়েছে তাই এই মামলায়ও আর রিমান্ড আবেদন করার সুযোগ নেই। এরপর ১৩ জুন মিরপুর থানার অবশিষ্ট ঐ মামলাটি যেটির রিমান্ড শুনানি ইতিপূর্বে হয়নি সেটির জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। মধ্যখানে ৬ জুন মতিঝিলের ঐ ১৩(৫) ১৩ মামলার রিমান্ড শুনানির ধার্য দিন ছিলো কিন্তু ঐ দিন কোর্ট অনেক বেশি ব্যস্ত থাকায় আর শুনানি করতে পারেনি। এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অপ্রত্যাশিত রহমত। কারণ ঐ দিন শুনানি হলে নির্ঘাত দুই-চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়ে যেতো। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। অথচ ঐ দিনের এই শুনানি পেছানোর জন্য আমি, আমার লোকজন বা আমার আইনজীবি কেউই চেষ্টা করেনি। আমাদের সকলের চেষ্টার বাইরে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সেটা করে দিলেন। এরপর যখন মতিঝিল থানার ঐ মামলার শুনানি করা হয়েছে সেটা ২৭ জুনের কথা। ২৭ জুন মতিঝিল থানার মোট তিনটি মামলার রিমান্ড শুনানি করা হয়েছে। তিনটি মামলার একটিতে ১০ দিন আর অপর দুটিতে ৭ দিন করে ১৪ দিন সর্বমোট (সম্ভবত) ২৪ দিনের রিমান্ড আবেদন ছিলো। কিন্তু তত দিনে পদ্মা-মেঘনায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। ১৫ জুনের ৪ সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কপালে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি জুটে গেছে। প্রশাসনের রংও অনেক বদলে গেছে। আওয়ামী লীগ তলে তলে জামাতের সাথে মামলা-মোকাদ্দমা ও গ্রেফতারকৃত নেতা- কর্মীদের মুক্তির বিনিময়ে আতাত ও সমঝোতা করার তদবীর শুরু করেছে। কাজেই এজাহারভুক্ত আসামী হওয়া সত্ত্বেও তিনটি মামলারই রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর হয়ে গেলো। এইভাবে আমার নামে মোট ১১১ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় কেবলমাত্র দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়। অন্যথায় হয়তো আরো দুই চারদিন রিমান্ড খাটতে হতো। সকল ক্ষমতার মালিক এক আল্লাহ। আল্লাহ যখন চান তখন ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতাহীন করেন। আবার চাইলে ক্ষমতাহীনকে করে দেন ক্ষমতাসীন।

রিমান্ডের যত কথা

জেল জগৎ ও কারা জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অধ্যায়টির নামই হলো রিমান্ড। যদিও আইনগতভাবে রিমান্ডে আসামীর উপর কোনরূপ টর্চার করা বা শারীরিক নির্যাতন করার বৈধতা নেই।

কিন্তু মানুষের বানানো আইনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিক হলো যারা আইন বানায় বা যারা আইন রক্ষা করার দায়িত্বশীল তারাই ঐ আইনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাশীল থাকে না। তারা নিজেরাই আইন লঙ্ঘন করে।

রিমান্ড হলো তেমনই একটি প্রক্রিয়া যেখানে সবাই জানে শাস্তি দেওয়া বৈধ নয়, আবার সবাই জানে যে এখানে অবৈধ কাজটি করা হয়। আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকরাও জানে, আদালতও জানে। এরপরও আবার আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করে। রাষ্ট্র আইন করে রেখেছে টর্চার করা যাবে না, আবার রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে টর্চার করার যন্ত্র কিনে আনে। এটা আইনের সাথে কোন হাস্যকর তামাশা কি না, বিবেক দিয়ে ভেবে দেখা দরকার।

রিমান্ড জিজ্ঞাসাবাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের ভিন্ন রিমান্ড ব্যবস্থা আছে। আবার সিআইডি ও ডিবি পুলিশেরও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ন বা র‍্যাব-এর আছে আলাদা রিমান্ড ব্যবস্থা। থানা পুলিশের তো আছেই। আবার সিআইডি, ডিবি ও আর্মির সমন্বয়ে জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেল নামে যৌথ জিজ্ঞাসাবাদও হয়।

সাধারণ সিভিল যত মামলা আছে এগুলো থানায় হয়। থানা থেকে মামলার একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, যাকে মামলার ইন্সপেকশন অফিসার বা আইও বলা হয়। অনেক সময় কোন কোন মামলার তদন্তভার ডিবি পুলিশ বা সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়। মামলার তদন্তকারীরই দায়িত্ব রিমান্ড জিজ্ঞাসাবাদের। এজন্য সাধারণ রিমান্ড জিজ্ঞাসাবাদ থানার আইও করে। মামলা সিআইডি বা ডিবির থাকলে তারা করে। আবার অনেক সময় অন্যদের সহযোগিতার দরকার হলে তাদেরকে সাথে নিয়ে যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অথবা তাদের কাছে হস্তান্তরও করা হয়। ডিজিএফআই, সিআইডি, ডিবি ও র‍্যাব প্রত্যেকটি সংস্থার কাছে আছে ভিন্ন ভিন্ন রিমান্ডের সেল। যেখানে চালানো হয় আসামীদের উপর নানা রকম টর্চার। এজন্য এগুলোকে টর্চার সেল বলে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকাসহ পশ্চিমা প্রশিক্ষণ ও কলা-কৌশল অনুসরণেই সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদ ও টর্চার চালানো হয়। ভয়াবহ ও লোমহর্ষক এ সকল টর্চারের বিবরণ শুনলে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। পশ্চিমাদের হাস্যকর মানবাধিকার বিষয়ক ধ্যান-ধারণায় এই অমানবিক আচরণের

কোন ব্যাখ্যা নেই। পশ্চিমা প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত হিংস্রতার সাথে যুক্ত হয় অর্থের দানবীয় লালসা। এই হিংস্রতা আর লালসার শিকার হয়ে মানবতা আর ইনসানিয়াত যে কী করুণভাবে কেঁদে মরে এ সকল টর্চার সেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তা বাইরের আলোকিত জগত থেকে কল্পনাও কর যায় না।

রিমান্ডের এই অন্ধকার জগতের সত্যিকার চিত্র তো তারাই তুলে ধরতে পারবেন যারা এখানে নৃশংসতার শিকার হয়েছেন। তবে আমি আমার কারা জীবনে রিমান্ডের মুখোমুখি হওয়া অনেক বন্দীর ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক বর্ণনা শুনেছি, অনেককে দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াতে দেখেছি, অনেককে নির্যাতনের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ক্ষত নিয়ে চলতে দেখেছি।

রিমান্ড নির্যাতন বা টর্চারের কিছু বিবরণ

পুরুষাঙ্গের সাথে তিন কেজির পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে– এমন একজন রাজশাহী নিবাসী একজন ব্যবসায়ী বন্দী আমি দেখেছি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। একই বন্দীকে ডিবি কার্যালয়ে দুই চোখে আঙ্গুল দিয়ে সজোরে খোঁজা মেরেছে। ঘটনার এক মাস পর দেখেছি তার এক চোখের অর্ধেকটা জুড়েই লাল রক্তের থোকা জমাট বাধা আছে।

এমন বন্দীও দেখেছি, যার পুরুষাঙ্গের সাথে বিদ্যুতের ক্লিপ লাগিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করে দেয়া হয়েছে। উলঙ্গ করে দশজন মানুষের সামনে দাড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আলেম ও দ্বীনদার মানুষকে। পায়খানার রাস্তা দিয়ে একের পর এক গরম ডিম বা ঠাণ্ডা বরফ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এমন বন্দীও দেখেছি, হাত-পায়ের সমস্ত নখগুলোকে প্লাস দিয়ে টেনে টেনে তুলে নিয়েছে। হাতের আঙ্গুলের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিয়েছে অতঃপর সেই পিনের মাথায় অনবরত আঘাত করেছে বা গ্যাস লাইটে আগুন ধরিয়ে পিনের মাথায় উত্তাপ দিয়েছে এতে আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকানো সম্পূর্ণ পিন গরম হয়ে আঙ্গুলের মাথা পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

দুই হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে বা দু পা উপরে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বন্দীর সামনে তার স্ত্রীকে, বোনকে বা মাকে এনে উলঙ্গ করে ফেলেছে। এমন বন্দীও আছে যার স্ত্রীকে এনে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছে। ষোল বার ধর্ষণ করা হয়েছে একজনের স্ত্রীকে– এমন ঘটনাও ঘটেছে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী আঠারো-বিশ বছরের একটি ছেলেকে দেখেছি তাকে উপুড় করে ফেলে পিঠের উপর পাড়া দিয়ে দুই হাত পেছন দিকে মুড়ে উভয় হাতের হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলেছে। দু হাত ব্যান্ডেজ করা ছেলেটিকে দেখলে চোখের পানি সংবরণ করা কঠিন। ছাত্র শিবিরে কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে দেখেছি রিমান্ডের নির্যাতনে কোমর থেকে নিচের দিকে অচল হয়ে আছে।

এমন বন্দীও দেখেছি, মাসের পর মাস হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রেখেছে পিঠের পেছন দিকে হাত মুড়িয়ে। টানা ৩৬ দিন হ্যান্ডকাপ পরিয়ে হাত উচু করে বেধে দাড় করিয়ে রেখেছে।

কাসিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে চন্দ্রার পঞ্চম তলায় পূর্ব ব্লক যেখানে আমি আছি, এখানেই একজন বন্দী আমাদের সাথে আমার পাশের রুমেই থাকেন। জুয়েল ভাই। পুরো নাম শাহাদাত উল্লাহ জুয়েল। নারায়নগঞ্জের আলোচিত ডেভিড নামে খ্যাত মমিন উল্লাহর ছোট ভাই তিনি। স্থানীয় বিএনপি'র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। গ্রেফতার হয়েছেন ১৯৯৭ সালে। গ্রেফতারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে টর্চার করা হয়। ২০০৮ সালে র‍্যাবের টর্চার সেলে তার উপর টর্চার করে টিএফআই নামক যৌথ বাহিনীর টিম। টর্চারের এক পর্যায়ে গলায় পাড়া দিয়ে চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম করে। জুয়েল ভাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাননি। কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ না হলেও তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন আজ পাঁচ বছর যাবৎ। বিএনপি'র গ্রুপিংয়ের শিকার হয়ে গ্রেফতার হওয়া তরতাজা যুবক জুয়েল ভাইয়ের বাকরুদ্ধ বোবা অবস্থা দেখলে দুঃখ হয় তার জন্য। আর মনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে একটি প্রশ্ন– এভাবে আর কত মায়ের ছেলে শিকার হবে এমন রিমান্ড নির্যাতনের?

মিরপুর থানায় ৭২ বছর বয়সী একজন মসজিদের ইমামকে হেফাজতের মামলায় দুই হাত বেধে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত উপর্যুপরি লাঠির আঘাত করেছে। আঘাতের কারণে হাত ফুলে পচন ধরে গিয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর সব টর্চার চালানো হয় রিমান্ডে। অনেক সময় অবৈধ অস্ত্রের সন্ধানে বা হত্যাকাণ্ডের তথ্য জানতে বা জঙ্গী তৎপরতার খোঁজ নিতে এসব টর্চার চালানো হয়। অনেক সময়

টাকা খাওয়ার জন্য বা শত্রুর টাকা খেয়েও এমন নির্যাতন চালায়। ভিন্ন মতের লোকদের উপর ক্ষোভের বশবর্তী হয়েও এ ধরনের আচরণ করা হয়।

রিমান্ডের মুখোমুখি আমি

আমার মিরপুর থানার ৭৫(২)১৩ নং মামলায় ১৩ জুন আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। ১৭ জুন রবিবার দিন বিকাল তিনটায় কাশিমপুর কারাগারে আমার রুমে সংবাদ আসলো রিমান্ডে যাওয়ার। ব্যাগে কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে বের হয়ে আসলাম। রিমান্ড খাটা পুরাতন বন্দীর পরামর্শে পায়জামা পরে নিলাম। বুকের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা থাকলেও ঘাবড়ে যায়নি। রিমান্ডের সময় পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানোর কথা না। কিন্তু আমাকে লাগানো হলো। একজন পুলিশের এ. এস. আই আরেকজন কনস্টেবল এসেছে মিরপুর থানা থেকে আমাকে নিতে। পায়ে ডান্ডাবেড়ি তার উপর আবার হাতে হ্যান্ডকাপ লাগানো। জেলগেট থেকে বেরিয়ে দেখি কাশিমপুর– ২ কারাগার থেকে একজন বন্দী যে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলো তাকে আবার পুনঃ গ্রেফতার করেছে। আমাদের দুইজনকে মিরপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সিএনজি অটোরিক্সা ঠিক করলো। অটো রিক্সায় পিছনে আমরা দুইজন বন্দী আর এক পুলিশ বসলাম। আর সামনে চালকের সাথে বসলো আরেক পুলিশ। অটোরিক্সা যোগে মিরপুর যাওয়ার পথে অপর বন্দীর সাথে আলাপচারিতায় তার পরিচয় জানলাম। জনাব আতাউর রহমান সাহেব। রাজশাহী মহানগর জামাতে ইসলামের আমীর। ষাটোর্ধ বয়সের আতাউর রহমান সাহেব পেশা জীবনে একটি স্কুলের শিক্ষক। বেশ সহজ-সরল মানুষ। ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ তার জামাতা। ইতিপূর্বেও এই মিরপুর থানা পুলিশই তাকে গ্রেফতার করেছিলো। তিন চার মাস জেল খেটে হাইকোর্টের জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু জেলগেটে তাকে আটকে রেখে মিরপুর থানায় খবর দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ আসার পর জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। হাটতে কষ্ট হয়। ডান পা টেনে টেনে হাটেন। মিরপুর থানার ওসি সালাহুদ্দীন রিমান্ডে পিটিয়ে এ অবস্থা করেছে। ষাটোর্ধ একজন টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষকে এমন বেদম মারপিট কীভাবে করে তা আমার কাছে বিস্ময়করই মনে হলো।

বিকাল ছয়টা নাগাদ আমরা মিরপুর মডেল থানায় পৌছলাম। থানার গারদে নেয়া হলো। গারদে আরো প্রায় দশ-বারো জন মানুষ। আটজনের একটা গ্রুপ ছিলো। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবি মানুষ তারা। থানার গারদে কোন সিলিং ফ্যান নেই। একটি স্ট্যান্ড ফ্যান দরজার বাইরে রাখা আছে। লোহার শিকের

দরজার বাইরে থেকে গারদ রুমের বরাবর ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায়। ঐ লোকগুলো ফ্যান বরাবর পূর্ণ জায়গা নিয়ে সারিবদ্ধ সিট বিছিয়ে শুয়ে-বসে ছিলো। আমাদেরকে দেখে একটু ফাঁকা করে দিলো। আসরের নামায পড়ে নিলাম। নামাযের পর পর তাদের সাথে কথা হলো। তারা কিছু মানুষ একটা সমিতি করেছে, সম্মিলিতভাবে জমি কিনে এ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য। তাদের মধ্যে দু-একজন জামাত-শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত। যে জমিটা তারা কিনেছে সেটার সীমানা নিয়ে পাশের জমির মালিকের সাথে গণ্ডগোল আছে। বিষয়টি নিয়ে তারা সমিতির মিটিং ডেকেছেন। পাশের ঐ জমির মালিক জামাতের মিটিং বলে তাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে।

> *এমন কত ঘটনা যে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর ঘটলো। কাউকে জব্দ করতে চাইলে সে জামাত-শিবিরের লোক এই কথা থানা-পুলিশকে জানিয়ে দিলেই হলো। ব্যস! পুলিশ তো এক পায়ে দাড়ানোই থাকে। ঢোলের বাড়ি পড়ার সাথে সাথে নাচুনে বুড়ির মতো নাচতে নাচতে আসামীকে পাকড়াও করার জন্য হাজির হয়ে যায়। এরপর তো পুলিশের দ্বিমুখী বাণিজ্য। নালিশ দায়েরকারীর কাছ থেকেও খাবে আবার আসামীরা মোটা অঙ্ক দিতে পারলে ছেড়েও দিবে। অন্যথায় রিমান্ডে এনে পিটিয়ে টাকা বের করবে।*

ঐ লোকগুলো প্রায় সবাই নামাযী। জামাতী বলে তাদেরকে পাকড়াও করে এনেছে। তাদের সাথে একই মিটিংয়ে এক-দুইজন মহিলা সদস্যাও ছিলো। মজার ব্যাপার হলো, একজন হিন্দু মহিলা ছিলো। লোকগুলো ঐ হিন্দু মহিলাকে দিয়ে পাল্টা জিডি করিয়ে নিজেরা মামলা থেকে বাচার চেষ্টা করছেন। একজন হিন্দু মহিলা তাদের সাথে আছে এটা প্রমাণ করতে পারলে তাদের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। এই কথা শুনে আমার বিশিষ্ট হিন্দু কলামিষ্ট সঞ্জিব চৌধুরীর 'আমার দেশ পত্রিকায়' লেখা একটি উপসম্পাদকীয়র কথা মনে পড়ে গেলো। জনাব চৌধুরী সেখানে দেখিয়েছেন আওয়ামী লীগের আমলে টুপি-দাড়িওয়ালা ও মুসলমানরাই সংখ্যালঘু হয়ে থাকে। তাদের কোন নিরাপত্তা থাকে না। পক্ষান্তরে হিন্দুরা থাকে দাপটের সাথে।

পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারলাম মাগরিবের আযান হয়েছে। গারদের ভিতর থেকে আযানও শোনা যায় না। আলো-অন্ধকারও কিছুই বুঝা যায় না। সারাদিন অন্ধকার রুমটাতে লাইট জ্বলতে থাকে। কখন রাত কখন দিন বুঝার

উপায় নেই। ঘড়িও নেই। তাই ভরসা একমাত্র টহলরত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা। মাগরিবের নামায জামাতে পড়লাম। পায়ে ডান্ডাবেড়ি নিয়েই আমি ইমামতি করলাম। ফরয পড়ার পর দুআ-দরূদ পড়ে সুন্নাত শুরু করেছি। সুন্নাতের দুই রাকাত শেষ করার আগেই সাদা পোশাকের একজন এসে নতুন আসামীকে সন্ধান করতে লাগলো। নতুন আমরা দু'জন ছিলাম। সে মোবাইলে তথ্যটি কাউকে জানালো। অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো, বয়স্ক যে আছে তাকে লাগবে না। সাদা পোশাকধারী পুলিশের লোক আমাকে আসতে বললো। আউয়াবিন পড়ার সময় আর পেলাম না। থানার গেইটের সামনে মাইক্রো দাড় করানো ছিলো। কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশও দাড়ানো। একজন হাতে করে একটা কাগজ নিয়ে আসলো। দেখলাম, তাতে মাইক্রোফোন হাতে সমাবেশে বক্তব্য দানরত আমার ছবি এবং সমাবেশটা ৫ মের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির গাবতলী পয়েন্টের সমাবেশ। সারা পৃষ্ঠা জুড়ে বড় ছবি। ছবির সাথে আমাকে মিলিয়ে মাইক্রোবাসের পেছনের সিটে আমাকে বসালো। আমার সাথে একজন বসলো। মাঝে দু'জন। সামনে ড্রাইভারের পাশে একজন। কোন অভদ্র ব্যবহার করল না। গাড়ি ছাড়তেই আমি আউয়াবিনের নিয়ত করলাম। সামনে থেকে আমাকে কিছু বলতে চাইলো। নামাযরত দেখে চুপ হয়ে গেলো। নামাযের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। দুই দুই চার রাকাত নামায পড়তেই গাড়ি এসে থামলো একটি অফিসের সামনে। নিয়ন সাইনের আলো ঝলমলে সাইনাবোর্ডে ডিসির কার্যালয় ব্যাপারটি লেখা দেখে নিশ্চিত হলাম আমাকে কোথায় আনা হয়েছে। একে একে সবাই নামলো। সবার শেষে আমিও গাড়ি থেকে নামলাম। তাদের আচরণ আমার সাথে এ পর্যায়ে সম্মানজনকই ছিলো।

আমরা ঢাকা মেট্রোপলিটন মিরপুর অঞ্চলের ডিসির কার্যালয়ে ঢুকলাম। ওয়েটিং রুম পার হয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলাম। আমি সালাম দিয়ে ঢুকলাম। চল্লিষোর্ধ বয়সের পাঞ্জাবী পরিহিত ডিসি সাহেব তার চেয়ারেই বসা। পাশে লম্বা সোফা সেট। অন্য দুই দিকেও চেয়ার পাতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষটির। কেউ সালামের উত্তর দিল না। সালাম দিয়ে ঢুকে আমি জানতে চাইলাম বসতে পারি? ডিসি আমার কথায় কোন সাড়া দিলেন না। আমাকে তুই করে সম্বোধন করলেন। 'সামনে আয়' বলে আমাকে তার টেবিলের সামনে দাড়ানোর জন্য বললেন। ডিসির কথার ভাব দেখে আমি বুঝে গেলাম এখানে কোন ভদ্র আচরণ আমার কপালে জুটবে না।

সোফায় ছিলেন ফর্সা হালকা-পাতলা গড়নের ঐ মুহূর্তের আচরণে বেশ ভদ্র একজন মানুষ। আলাপচারিতায় বুঝলাম, ইনিই সেই বহুল আলোচিত মিরপুর

থানার ওসি সালাহুদ্দীন। ওসি সাহেব ডিসির কথায় শুধু সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর কথা বলছিলেন ডিসি। ডিসি আমাকে প্রথমেই ভর্ৎসনা করলেন ৫ মে গাবতলী পয়েন্টে ব্রিজের এ পাড়ে সমাবেশ করার জন্য। তিনি জানালেন, কথাতো ছিলো সমাবেশ ব্রিজের ঐ পাড়ে হবে। এই পাড়ে অবস্থান ও সমাবেশের সম্পূর্ণ দায় আমাকে দিলেন। অন্য যারা ছিলো– ওসি সালাহুদ্দীন সহ তারাও ডিসির সাথে সুর মেলালেন এবং কার কার সাথে কথা হয়েছে সেটা দেখার জন্য কম্পিউটারে ছবি বের করলেন। সেখানে ডিসির অফিসেই ডিসির সাথে আলাপ রত আমাদের হেফাজতে ইসলাম মিরপুর অঞ্চলের কোন কোন দায়িত্বশীলের ছবি দেখতে পেলাম।

ডিসির অফিসে সংরক্ষিত ছবির ঐ সকল নেতৃবৃন্দের সাথে কী কথা হয়েছিলো সেগুলো নিয়ে ডিসি, ওসিসহ অন্যরা পর্যালোচনা করছিলেন। ঐ ছবির বাইরেও অন্য আরো কার কার সাথে কথা হয়েছে সে বিষয়েও তাদের পর্যালোচনায় উঠে আসছিলো। আর আমার সামনে ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছিলো এত দিনের সেই রহস্য। বাড়ি আমার লালবাগ-আজিমপুর, শ্বশুরবাড়ি কাফরুল-ইবরাহীমপুর, মাদরাসা সাত মসজিদ-মোহাম্মদপুর, হেফাজতে ইসলামের সকল গণ্ডগোল হলো মতিঝিল-কমলাপুর, আর আমার নামে মামলা দেয় সব দারুস সালাম-মিরপুর!!! রহস্যটা কী?

আমাদের গাবতলী পয়েন্টে অবরোধ কর্মসূচি পালনের জন্য হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্র ও ঢাকা মহানগরের পক্ষ থেকে সমন্বয় কমিটি করে দেয়া হয়েছিলো। বৃহত্তর মিরপুর, বৃহত্তর মোহাম্মদপুর, মানিকগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই এই অঞ্চলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়েই ছিলো সেই কমিটি। সেখানে প্রত্যেক জোন থেকে নায়েবে আমীর ছিলেন আর আমীর-সদস্য সচিব ছিলেন মিরপুর জোনের দায়িত্বশীলগণ। আমি ছিলাম মোহাম্মদপুর জোনের পক্ষ থেকে নায়েবে আমীর।

কর্মসূচির দুই দিন আগ থেকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলা হচ্ছিলো অবরোধ শেষে আমাদেরকে ঢাকার দিকে মার্চ করতে হবে। অবরোধের আগের দিনই সমাবেশের অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু সরকার অনুমতি দিতে টালবাহানা করতে থাকে। এই অবস্থায় ৪ মে ঢাকার সকল অবরোধ পয়েন্টের আমীর-নায়েবে আমীরদেরকে ডেকে কেন্দ্রীয়ভাবে জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা আসলে সকল পয়েন্ট থেকে ঢাকা পল্টনের দিকে অগ্রসর হতে হবে– সেইভাবেই যেনো অবরোধ পয়েন্টগুলোতে অবস্থান নেয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে ব্রিজের অপর পাড়ে আটকে রাখার চেষ্টা করা হতে পারে।

কিন্তু আমাদেরকে ব্রিজের ওপার-এপার মিলিয়েই শুরু থেকে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। ওদিকে সরকারীভাবে সকল পয়েন্টেই ব্রিজের অপর পাড়ে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। এই অবস্থায় আমাদের মিরপুর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ সরকারের অনুমতির সীমানায় থেকেই অবরোধ কর্মসূচি পালন করার কৌশল গ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা আমাদের কেন্দ্রের নির্দেশনার আলোকে ব্রিজের এপাড়ে অবস্থানের উপর অটল থাকি। সেই হিসাবে ফজরের নামাযের সাথে সাথে আমরা মোহাম্মদপুরের লোকজন গাবতলী ব্রিজের এপাড়ে অবস্থান গ্রহণ করি। আমাদেরকে ব্রিজের অপর পাড়ে যেতে বলা হলে আমি অসম্মতি জানাই এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে দেই। আমাদেরকে সরকারী অনুমোদনের কথা বলা হলেও আমি তা আমলে নেইনি। উপরন্তু আস্তে আস্তে মানুষ বাড়তে থাকলে আমি আমাদের লোকজনকে নিয়ে মাজার রোডের মুখে সমাবেশ শুরু করি। মাইক লাগানো ট্রাক প্রস্তুত ছিলো। দুটি ট্রাক মুখোমুখি রেখে এভাবে সমাবেশ চলে এবং এক পর্যায়ে মাজার রোড দিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশের পথও বন্ধ হয়ে যায়।

মাজার রোড কেন্দ্রিক আমার তৎপরতা তখনই পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে। মিরপুর জোনের ডিসি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে পুলিশের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমিও যে বার বার পুলিশের সাথে কথা বলেছি সেটা এই ডিসির সাথেই বলেছি। যদিও তখন আমি তার পরিচয় জানতে পারিনি। উপরন্তু মাজার রোডের এই সমাবেশ ও জন সমাগমের কথা শুনে এলাকার এমপি জনাব আসলামুল হক সাহেব ছুটে আসেন। আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মীও সেখানে জড়ো হয়। হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে যোগদানকারী কারও কারও সাথে সেখানে এমপি সাহেবের কিছুটা তপ্ত বাক্য বিনিময়ও নাকি হয়েছে।

যাবতীয় এই সকল কিছুর জন্য মিরপুর অঞ্চলের সরকারী দল ও প্রশাসনের কালো তালিকায় পড়ে যাই আমি। ছবিসহ আমার নাম মিরপুর থানায় সংরক্ষিত হয়। আমি যখন খুলনা থেকে গ্রেফতার হই সংবাদ পেয়েই এক ডজন মামলা আমাকে উপহার দেয়া হয়। এগারোটা মামলার রিমান্ড আবেদন নাকচ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৩ নম্বর মামলার চার্জশিটে নাম অন্তর্ভুক্ত করে অতিরিক্ত উপহার দেয়।

জানিনা জামাত-শিবির ও আঠারো দলের হরতাল মামলায় শাইখুল হাদীসের সন্তানকে জড়িয়ে ও হয়রানী করে স্থানীয় সরকার দল ও প্রশাসন আওয়ামী লীগের কতোটা উপকার করলো।

এগারোটা মামলায় রিমান্ড না পেয়ে ১২ নম্বর মামলায়– যেটা একটা হত্যা মামলা, তাতে জোরালো চেষ্টা করে রিমান্ড মঞ্জুর করায়। আর সেই রিমান্ডেই আমি এখন মিরপুর জোনের ডিসির সম্মুখে দণ্ডায়মান। ডিসি আমাকে বললেন, ওনাদের সাথে কথা হলো, ব্রিজের ঐ পাড়ে তারা থাকবে, তুই এই পাড়ে আসলি কেন? আমি বললাম, আমরা এসেছি মোহাম্মদপুর থেকে আমরা তো জানি না কি কথা হয়েছে। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি হিসাবে আমরা ঢাকার প্রবেশ পথগুলোকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বন্ধ করার অংশ হিসেবেই করেছি।

এরপর ডিসি সাহেব ভিন্ন প্রসঙ্গ আনলেন। আমি হেফাজতে ইসলামের কোন দায়িত্বে আছি? আমি বললাম, কোন দায়িত্বে নেই। শুধু অবরোধ পয়েন্টের নায়েবে আমীর ছিলাম। বিশ্বাস করতে চাইলো না। বললো, তাহলে তুই শাপলা চত্বরের স্টেজে বক্তব্য দিলি কিভাবে? আমি বললাম, একজন উল্লেখযোগ্য আলেম ও মাদরাসার প্রতিনিধি ও পিতার পরিচয়ের সূত্রে। এরপর শুরু করলো আরেক প্রসঙ্গ– আঠারো দলীয় জোটের সাথে কে কে লিয়াজো করেছে। কত টাকা এনেছে– সেগুলো বল, এই প্রসঙ্গ শুরু করে ডিসি সাহেব আরো কঠোর হওয়ার চেষ্টা করলেন। একজনকে নির্দেশ দিলেন, লাঠি আনতে। মোটা টর্চার লাঠি এনে ডিসির টেবিলের উপর রাখা হলো। মনে মনে কিছুটা ভয় পেলেও আমি স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে থাকলাম। রাজনৈতিকভাবে আমাদের বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের কার্যক্রম, হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পরিচয়, খেলাফত মজলিসের ভাঙ্গন ও দুই গ্রুপের কথা ও আঠারো দলীয় জোট কেন্দ্রিক আমাদের নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা সবিস্তারে বললাম। ডিসি সাহেব এ পর্যায়ে কিছু তথ্য নোট করলেন। এরপর মন্তব্য করলেন, এখন তো খুব ভদ্রভাবে কথা বলছো কিন্তু স্টেজে তো খুব গরম গরম কথা বলেছো! তুই বলিসনি যে, 'পুলিশের বন্দুকে কত গুলি আছে চালাও'। এই কথা বলে কম্পিউটার ওপেন করলেন। আর বলতে লাগলেন তোর সকল বক্তব্য রেকর্ড করা আছে। আমি তো আশঙ্কা করছিলাম, আমার সব বক্তব্য চালু করলে তো এদের ক্ষোভ আমার প্রতি আরো বাড়বে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম, কোন বক্তব্যটা চালু হয় সেটা দেখার জন্য। আর মনে মনে বিপদ মুক্তির দরূদ শরীফ পড়ছিলাম। আল্লাহর কী খাছ রহমত! অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন কিন্তু আমার ফাইলটা ওপেন করলেই ঝির ঝির সাউন্ড আর স্ক্রিনে কাপাকাপি শুরু হয়, কোন চিত্র আসে না। শেষ পর্যন্ত ঐ সময় আর চালু হলো না। আরো কিছু কথাবার্তা ডিসি ও অন্যরা বলাবলি করলেন। ডিসি সাহেব

ওসিকে বলে দিলেন, 'থানায় নিয়া অরে ডলা দেও আর কথা বাইর কর'। ডিবি পুলিশকেও জানানোর কথা বললেন।

এভাবে আনুমানিক বিশ-পঁচিশ মিনিট ডিসির রিমান্ড হলো। মামলা হলো আমার মাওলানা সাঈদী সাহেবের মৃত্যু দণ্ডাদেশের পর গন্ডগোলে মিরপুরের কোথায় যেন ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে আর সেই বিস্ফোরনের শব্দেই নাকি এক বৃদ্ধ হার্ট এ্যাটাক করে মারা গেছেন।

> *সেই মৃত্যু ঘটনায় দায়ের কৃত মামলায় আমাকে গ্রেফতার দেখানো হলো, রিমান্ডে আনা হলো– সেই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কিন্তু ডিসি সাহেব আমাকে কী জিজ্ঞাসা করলেন। এর সাথে মামলার কী সম্পর্ক? এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ আর কথোপকথনের পর রিমান্ডের কী রিপোর্ট দেয়া হয়েছে আমি দেখিনি। হয়তো লিখে দিয়েছে– 'আসামীর কাছ থেকে মামলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে'। কী ব্যাখ্যা এ সকল মিথ্যাচারের? কী প্রয়োজন এ সকল মেকি আইনী প্রক্রিয়ার? এমন বানোয়াট, মিথ্যা, জালিয়াতি আর অন্যায়ের কাঠামোর উপরই দাড়িয়ে আছে আমাদের এই সমাজ। কিন্তু কে ভাঙ্গবে এই জাহেলী সমাজের কুহেলিকা? কে আনবে সত্য-সুন্দর সোনালী সমাজের রাঙ্গা প্রভাত?*

ডিসি অফিস থেকে আমরা আবার সেই সাদা পোশাকের পুলিশগুলোসহ ঐ মাইক্রোটাতে এসে উঠলাম। ডিসির কথাবার্তার পর এদের আচরণেও পরিবর্তন চলে এসেছে। কেমন তীর্যক তীর্যক মন্তব্য করতে লাগলো। আর সেই 'পুলিশের বন্দুকে কত গুলি আছে' মন্তব্য নিয়ে উপহাসও করতে লাগলো। আমি তো বন্দী! বলার তো আমার কিছু নেই। তাদের মধ্যেই একজন বুঝতে পারলো– বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তখন সে বললো, আমরা পুলিশ। আমাদের কোন অসুবিধা নাই। এখন আওয়ামী লীগের কথায় আপনাদেরকে ধরে আনি আবার ক'দিন পর যখন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন তখন আওয়ামী লীগের লোকজন 'বাইন্ধা আনমু'! আমাকে আবার থানার সেই রাত-দিন সমান গারদে এনে ঢুকিয়ে দিলো। গারদের সবাই অপেক্ষায় ছিলেন আমার। কী অবস্থায় আমি ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর শরীফ এসে খাবার দিয়ে গেলো। যিমামের আম্মু বাবার বাড়িতেই

ছিলো। আজিমপুর রওয়ানা দিয়েও আমার মিরপুরে আসার সংবাদ শুনে আর যায়নি। আমার শ্বশুরবাড়ি মিরপুর– ১৪ এর পেছনে ইবরাহীম পুর, রিমান্ডে থাকার এই সময়টাতে তিন বেলায়ই যিমামের আম্মু শরীফকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছে। খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণ পাঠাতো। কয়েকজনকে সাথে নিয়ে খেতে পারতাম। খাবার তো এলো ভালোই। কিন্তু কখন আবার ডাক পড়ে সেটা নিয়ে একটা চিন্তা কাজ করছিলো। মিরপুর থানার ওসি সালাহুদ্দীন আওয়ামী আমলের অন্যতম সেরা পারফর্মার। তার নির্যাতনের কাহিনী পত্র-পত্রিকাসহ বিরোধী মতের সকলেরই জানা। ঢাকা শহরের যেই থানাগুলো গণ গ্রেফতার ও পুনঃ পুনঃ গ্রেফতার করে তার মধ্যে ওসি সালাহুদ্দীনের এই মিরপুর অন্যতম। যে সকল থানায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদের উপর রিমান্ড নির্যাতন বেশি চলে মিরপুর তার শীর্ষে। এই সংবাদগুলো আমার জানা ছিলো। তবে বিভিন্ন চ্যানেলে, বিভিন্ন উপায়ে ওসিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা চলছে। টর্চার যেন না হয় সেজন্য সব রকম তদবীর হচ্ছে এটাও জানা ছিলো। তার সাথে আমাদের আত্মীয়তার একটা সূত্র ছিল সেটাও কাজে লাগানো হল। এভাবেই আশা ও শঙ্কার মধ্য দিয়ে সময় কাটতে লাগলো। ওসি সাহেব যেই সময়টায় থানা থেকে চলে যান– রাত দশটা এগারটা বাজার পর ওই দিনের মতো একটু স্বস্তি পেলাম।

রাতটা কাটলো এভাবেই। ভোর বেলা তো দেখি নাশতা নিয়ে গিন্নি সাহেবা স্বয়ং উপস্থিত। সকাল সকাল থানায় অফিসাররা থাকে না। থানাটা একটু ঠাণ্ডা থাকে এই সুযোগে শরীফ সেন্ট্রিকে ম্যানেজ করে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আমার শ্বশুর যে দিন প্রথম ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এখনো আমার মনে আছে– বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মায়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, দুনিয়ার কোন কিছুই ওদের দেখা হয়নি। শোনা হয়নি। সেই হিসাবে ওর হাত নেই পা নেই চোখ নেই মুখ নেই। তুমি ওকে যেভাবে শেখাবে ও শিখে নিবে। আর্মি অফিসারের মেয়ে হলেও ঐ পরিবেশের কারো সাথে ওরা মিশেনি। অফিসার হিসাবে প্রাপ্ত কোয়ার্টারের চার দেয়ালের মধ্যেই থেকেছে। ঢাকায় তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় কোথাও তেমন যাওয়া হয়নি। তাছাড়া বদদ্বীনী পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য আর্মিদের পরিবেশ ও অনুষ্ঠানাদি এবং পারিবারিকভাবে যাতায়াত পরিহার করে চলেছেন সারা জীবন। তাই আমি দেখেছি, আমাদের পরিবারের মেয়েরা– পরিবার বড় ও আত্মীয়-স্বজন বেশি থাকায় মাশাআল্লাহ দুনিয়ার অনেক কিছুই বুঝে। কিন্তু আমার আর্মি অফিসার

কন্যা গিন্নি সাহেবা সেই তুলনায় অনেক বে-খবর। আমি কিছু কিছু বিষয় শেখানোর-বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমি জেলখানায় আসার পর এটা ছিলো তার জন্য নতুন এক পরিস্থিতি। এবার বেশ অনেক শিখেছে। চুন থেকে পান খসার আগেই বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রুতে সিক্ত হওয়া কন্যা এবার অনেক শক্ত-পোক্ত হয়েছে। কোর্টের গারদ থেকে জেলগেট। আবার থানার গারদেও এসে হাজির। তবে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমিও আসতে নিষেধ করে রেখেছিলাম। ও সেভাবেই এসেছে। রিমান্ডে থাকাকালীন থানার গারদে এই ভোরবেলার সময়টায় বেশ নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া গিয়েছিলো। তাই তিন দিনই সে এসে নাশতা দিয়ে গেছে ও খোঁজ-খবর নিয়েছে। দুপুরের দিকে আমাদের মোহাম্মদপুরের একান্ত আপনজন জনাব শফিকুল ইসলাম সেন্টু সাহেব আর বন্ধুবর মাওলানা জালালুদ্দীন এসে সাক্ষাত করলো। সেন্টু চাচা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আত্মীয়তার একটা সম্পর্ক আছে আমাদের মাঝে। আব্বাকে দাদা বলতেন। আমাদেরকে চাচা বলেন। আমি সাক্ষাতে চাচা বলি। আবার অনুপস্থিতিতে সেন্টু ভাই বলি। সেন্টু চাচা বললেন, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এরশাদ সবাই জেল খেটেছেন। রাজনীতি করেন আপনি। রাজনৈতিক সব বড় নেতাই জেল খাটে। এছাড়াও রিমান্ডের খোঁজ-খবর নিলেন এবং আশ্বস্ত করলেন ইনশাআল্লাহ কোন টর্চার হবে না। তার কথায় কিছুটা আস্থা পেলাম। ভয়টা চলে গেলো।

রাতের বেলা শ্বশুর বাড়ির খাবারের সাথে সাথে মাওলানা সাঈদ তার মসজিদ সংশ্লিষ্ট গসিপ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন ফ্রাই পাঠিয়েছে তিন দিনই। মোটামুটি অন্যান্য সমস্যা থাকলেও থানা গারদে খাওয়ার ব্যবস্থাটা ছিলো ভালো। মঙ্গলবার দিন সকালে যখন গারদ থেকে আসামীদেরকে নিতে এসেছে। আমিও প্রস্তুত হয়েছি যাওয়ার জন্য। আমি মনে করেছি আমার যেহেতু রিমান্ড দুই দিনের। দুই দিনতো হলোই। কিন্তু আশাহত হলাম। ইনচার্জ বললো আপনার রিমান্ড শেষ হয়নি। প্রচণ্ড শক খেলাম। বলে কি! আরো একদিন এই গারদে! ডান্ডাবেড়ি পরে এক কাপড়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এভাবে কয়দিন থাকা যায়। কিছুই করার নেই। আরো একদিন থাকতে হবে। পুরাতন সব আসামীরা চলে গেলো। থেকে গেলাম শুধু আমি একা। যথারীতি সন্ধ্যার পর আবার শুরু হবে নতুন আসামীর আগমন।

সন্ধ্যার পর থেকেই জমজমাট হতে থাকে থানা। নতুন নতুন আসামী ধরে আনা হয়। তাদের কাউকে টর্চার করা হয়। কারো সাথে দেন-দরবার চলতে

থাকে। মধ্য রাত অবধি চলে এ সকল কার্যক্রম। তিন দিনের থানার গারদ আমার সামনে থানা পুলিশ ও সমাজের অন্ধকার জগতের অনেক কিছুই উন্মোচন করে দিয়েছে। অনেক কিছুই দেখেছি। পুলিশের গ্রেফতার ও রিমান্ড বাণিজ্যও দেখেছি।

তিন দিনে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন নতুন আসামী ধরে আনতে দেখেছি। এদের শতকরা নব্বইজন মাদকের সাথে সম্পৃক্ত আর বাকীরা নারী নির্যাতন মামলার। অধিকাংশই মাদকসেবী, কেউ কেউ মাদক ব্যবসায়ী। আসামী ধরে এনেই পুলিশ বাসা-বাড়িতে খবর দিতে বলে। যদি মালদার অভিভাবকের সন্ধান পায় পুলিশ, তাহলে কোন কথা নেই। সাধারণ মামলায়ও পঞ্চাশ হাজার এক লাখ হাঁকিয়ে দিবে। আসামীদের সাথে পুলিশের দফারফা কয়েক ভাবে হয়। থানা থেকেই ছেড়ে দিবে। কোন মামলা দিবে না। আবার অনেককে মামলা দিবে তবে হালকা মামলা দিবে। এরজন্য পরিভাষা হলো ‘পাঁচ আনি মামলা’। অর্থাৎ তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিন জেলহাজত খাটতে হয় বা পাঁচ সাত শত টাকার জরিমানা হয়। আরেকটা বড় বাণিজ্য হলো রিমান্ড বাণিজ্য। অর্থাৎ রিমান্ডে নিয়ে আসামীর কাছ থেকে পরিবারের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করবে। এরপর মোবাইলে হুমকি দিবে। টাকা নিয়ে আসেন। নইলে আপনার লোককে মারাত্মক টর্চার করা হবে। এভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতায়। আমাদের হেফাজতের মামলায় ঘটনার দিন যাদেরকে আটক করেছিলো এদের অনেকের পরিবারের কাছ থেকেই এভাবে টাকা নিয়েছে। পুলিশ যদি টের পায় চাপ দিলেই টাকা বের হবে তাহলে চাপও বেশি দেয় টাকাও বেশি পায়। এইজন্য এদের উপর টর্চার বেশি হয়। হেফাজতের মামলার অনেক আসামীর অভিভাবক খবর পেয়ে থানায় গিয়েছে বা খবর দিয়ে থানায় নিয়েছে। তারপর টাকাও নিয়েছে কিন্তু কোন লাভই হয়নি। মামলা যেটা দেওয়ার সেটা ঠিকই দিয়ে দিয়েছে। জামাত-শিবিরের লোকজন এ ব্যাপারে দেখলাম বেশ এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তারা কোন মোবাইল নম্বরই দেয় না। বলে আমার বাড়িতে খবর নেওয়ার মতো কেউ নেই। কিংবা বলে আমরা গরীব মানুষ। তাদের সাথে থানায় দেখা করতেও কেউ আসে না।

পুলিশ মাদকসেবীদেরকে ধরে। কিন্তু মাদক ব্যবসায়ীদেরকে ধরে কম। অনেক মাদক ব্যবসায়ী পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ মাদক সেবীর গ্রেফতারের ঘটনা দেখলাম প্রায় একই রকম। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ফেনসিডিল, গাজা, হেরোইন বা ইয়াবা হাতে নেয়ার পর মুহূর্তেই পুলিশ এসে হাজির। স্বাভাবিক বিষয়। কার কাছে

মাদক দিচ্ছে সেটা ব্যবসায়ী নিজেই পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। এভাবেই পুলিশ জমজমাট ব্যবসা করছে। মাদক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিচ্ছে নিয়মিত মাশোহারা। এরপর তাদের সহায়তায় মাদকসেবীকে ধরে তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। মাদক আছে বলেই পুলিশের এত ব্যবসা। কাজেই পুলিশই চাই না মাদক নির্মূল হোক। আর পুলিশের এই ঘুষের ভাগ তো পৌঁছে যায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত।

থানার গারদে আসামী আটক করে রেখে তার অভিভাবকের সাথে দেন-দরবার চলতে থাকে। রাত বারোটা, একটা বা আরো বেশি তিনটা-চারটা পর্যন্ত বেজে যায় এ সকল দেন-দরবার সারতে সারতে। এভাবে সন্ধ্যা থেকে নয়টা-দশটা পর্যন্ত আসামীর আগমন চলে। এরপর রাত এগারোটা-বারোটা থেকে শুরু হয় খালাসী। যারা দেন-দরবারে পুলিশের চাহিদা পূরণ করতে না পারে অথবা যাদের কাছ থেকে রিমান্ডে এনে আরো মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার টার্গেট থাকে কিংবা মামলা বেশি জটিল হয় তাদেরকে সকালে কোর্টে চালান করে দেয়া হয়। যতটা সময় মাদকসেবীরা থানার গারদে থাকে, গারদে বসেই মাদক সেবনের সুযোগ পায়। পুলিশের মাধ্যমেই সব হয়।

থানা-পুলিশ আর অন্ধকার সমাজের এমন বাস্তব অভিজ্ঞতায় কাটলো আমার আটচল্লিশ ঘণ্টার রিমান্ডের প্রলম্বিত মেয়াদ অতিরিক্ত পনের ঘণ্টাসহ ৬৩ ঘণ্টা সময়। ২০ জুন বুধবার দিন সকাল নয়টার দিকে কোর্ট চালানের ডাক আসলো। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে আসলাম গারদ থেকে। প্রায় তিন দিন থাকলাম মিরপুর থানার গারদে। মিরপুর থানা এলাকায় সংঘটিত একটি হত্যা মামলার ব্যাপারে তদন্তের জন্যই পুলিশ কোর্ট থেকে রিমান্ড মঞ্জুর করিয়েছিলো। কিন্তু এই তিন দিনে ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাটা কে? তাকে চিনবার বা এক নজর দেখার সুযোগও হলো না। ওসি সাহেবের সাক্ষাত থেকেও আল্লাহ রক্ষা করলেন।

গারদ থেকে কোর্টে নেওয়ার জন্য মিরপুর থানার আমরা প্রায় বারো চৌদ্দজন আসামী ছিলাম। একমাত্র আমার পায়েই ডান্ডাবেড়ি। আসামীদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাড় করিয়ে কোমরে রশি বেধে গারদ থেকে থানার সামনে দাড়ানো প্রিজন ভ্যানে ওঠায়। পায়ে বেড়ি থাকায় আমি এই রশির বাধন থেকে বেঁচে গেলাম। বেঁচে গেলাম এই বেড়ির উসিলায় আরেকটা বড় বিপদ থেকেও।

প্রিজন ভ্যানে ওঠানোর সময় দুইজন দুইজন করে আসামীকে এক জোড়া হ্যান্ডকাপ দিয়ে বেধে দিলো। থানা থেকে কোর্টে যাওয়ার দীর্ঘ পথে প্রিজন ভ্যানের ভিতরে থাকা অবস্থায় কোন যুক্তিতে এই অপ্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো তার কোন জবাব পুলিশের এই মূর্খ স্কোয়াডের তো নেই-ই, প্রচলিত বিচার ও শাসন ব্যবস্থার কাছেও থাকার কথা নয়।

আদিম যুগের পুলিশি যান

মিরপুর থানা থেকে কোর্টে নেওয়ার জন্য যথারীতি থানার গেটে অপেক্ষমান ছিলো পুলিশের প্রিজন ভ্যান। ইতিপূর্বে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের আলোচনায় প্রিজন ভ্যান নামক প্রিজন ওভেনের কথা লিখেছিলাম। থানা থেকে আমাদেরকে বহন করার জন্য যে ভ্যানটা এসেছে, আগের ঐ প্রিজন ভ্যান যদি ফুটন্ত কড়াই হয়ে থাকে তাহলে আজকের এই ভ্যানটাকে বলতে হবে জ্বলন্ত আগুন। ঢাকার বিভিন্ন রোডে চলা যাত্রী পরিবহন লেগুনার আকারের ঐ প্রিজন ভ্যানটির সার্বিক চিত্র হলো এক কথায় বিভীষিকাময়। গাড়িটার মধ্যে কোন এক কালে সিট লাগানো ছিলো এবং ঐ সিটগুলোতে কোন এক যুগের মানুষও বসতো। প্রাচীন আমলের সেই গাড়ির সিটগুলো ভেঙ্গেচুরে এখন গাড়ির ভিতরেই ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়ে আছে। ভগ্নস্তুপের ভাঙ্গাড়ি লোহা-লক্কড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেললে আসামী নামক নিকৃষ্ট প্রাণীদের (?) যদি একটু সুবিধা হয়ে যায়, এই আশঙ্কা থেকেই বোধ হয় এগুলো এখান থেকে সরানো হয় না।

আমাদেরকে মিরপুর থানা থকে বহন করার আগেই এই ভ্যানটি আরো দুটি থানা থেকে আসামী বহন করে এনেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই ভ্যানটি তার আজকের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছে দারুস সালাম থানা থেকে। সেখানকার আসামী উঠিয়ে গিয়েছে শাহ্ আলী থানায়। শাহ আলী থানার আসামী নিয়ে এসেছে মিরপুর থানায়। এখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে গেলো পল্লবী থানায়। সেখান থেকে রূপনগর থানায়। সেখান থেকে কাফরুল থানায়। কাফরুল থানা থেকে ভাষানটেক থানায়। প্রতিটি থানায় গিয়ে দশ-পনের-বিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং সেখানকার আসামীদেরকে গাড়িতে তুলে নেয়। কোন থানায় তিন-চারজন আসামী। আবার কোন থানায় দশ-বারোজন আসামীও হয়।

শেষ পর্যন্ত এই সাতটি থানার আনুমানিক পঞ্চাশজন আসামীকে গাদাগাদি করে ভরা হয় প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম

যুগের এই পুলিশি যানবাহনটির মধ্যে। ছোট্ট আকারের একটি গাড়ি, বিশ জনের সঙ্কুলান হওয়ার জায়গায় পঞ্চাশজন ঢুকানো হয়। মাথার সাথেই লাগোয়া গাড়ির ছাদ। এর উপর ভাঙ্গাড়ি লোহা-লক্কড়ের ঝামেলা তো আছেই। এই অবস্থায় বেলা দশটা-এগারোটার প্রচণ্ড উত্তপ্ত রৌদ্রের সময় যদি প্রতিটি থানায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকে। ভিতরের যাত্রীদের অবস্থা তারা অনুভূতিহীন না হয়ে থাকলে কতটা দুঃসহ, অসহ্য ও মানবেতর সেটা শুধু অনুভব করা সম্ভব, ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই অসহ্য যন্ত্রণাকাতর অবস্থার উপর বাড়তি উপদ্রব হিসাবে আবদ্ধ এই গাড়ির ভিতরে একযোগে গাজা আর বিড়ি-সিগারেটের ধুমপান তো আছেই।

গাড়ির মধ্যে উঠেই আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম– প্রচণ্ড গরম লাগবে। তাই গায়ের পাঞ্জাবী-গেঞ্জি খুলে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বড়সড় গামছাটা ভিজিয়ে শরীরের উপর জড়িয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমি যতটুকু আগাম আঁচ করেছিলাম পরবর্তী পরিস্থিতি ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। আমাদের ভাগ্য কিছুটা ভালো ছিলো এক দিক থেকে– যে সাত থানার আসামীদের মধ্যে আমরা প্রথম দিকের হওয়ায় একটু সুবিধাজনক জায়গা দখল করতে পেরেছিলাম।

এভাবে একে একে সাত থানার আসামী নিয়ে প্রিজন ভ্যানটি ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে বিজয় সরণী-ফার্মগেট হয়ে পুরাতন ঢাকার কোর্ট-কাচারীর দিকে এগিয়ে চলে। ক্যান্টনমেন্টের পর থেকেই তো লাগা ছিলো ঢাকার বিখ্যাত জ্যাম। গাড়ির ভিতর আমরা ঘেমে নেয়ে একাকার। অনবরত ও প্রচুর পরিমাণে ঘাম ঝরেছেছ শরীর থেকে। আমার গায়ে জড়ানো যে গামছাটা ছিলো সেটা কিছুক্ষণ পর পর ঘামে ভিজে চুপ চুপ হয়ে যাচ্ছে। গামছাটা নিংড়ানোর সময় মনে হচ্ছিলো যেন ডুবন্ত পানি থেকে তুলেই নিংড়ানো হচ্ছে। ঘাম ঝরতে ঝরতে মনে হলো শরীরের সমস্ত পানিই মনে হয় বের হয়ে যাচ্ছে। পানির তৃষ্ণা তীব্র হতে লাগলো। দুই লিটারের এক বোতল পানি সাথে নিয়েছিলাম। আরো কেউ কেউ সাথে করে পানি এনেছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় চৈত্রের প্রচণ্ড খরায় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির মতো। এত তৃষ্ণার্থ মানুষের মাঝে এক বোতল পানি কি আর একা পান করা যায়। কারবালার মতো সঙ্কটময় অবস্থা।

দুর্বিষহ গরম, ঘাম ঝরে সৃষ্টি হওয়া পানিশূন্যতা, গাজা-বিড়ি আর ঘামের উৎকট দুর্গন্ধ সব মিলিয়ে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেউ কেউ আবার করতে

লাগলো বমি। উপর্যুক্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার উপসর্গগুলোর সাথে বমির এই বিব্রতকর নতুন উপসর্গ যুক্ত হওয়ার পর কী অবস্থা হলো সেটা অনুভব করার মতো বোধশক্তি আর অবশিষ্ট ছিলো না। এই দুর্বিষহ কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা যখন ঢাকার সিএমএম আদালতের গারদখানায় পৌছলাম তখন ঘড়ির কাটা দুপুর একটার ঘরে। অর্থাৎ দারুস সালাম টু সিএমএম কোর্টের এই গাড়িটি সকাল আটটার দিকে দারুস সালাম থানা থেকে যাত্রা শুরু করে ভায়া শাহ আলী থানা, মিরপুর থানা, পল্লবী থানা, রূপনগর থানা, কাফরুল থানা ও ভাষানটেক থানা হয়ে সিএমএম কোর্ট গন্তব্যে পৌছেছে পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে। ভাগ্যিস আমরা ধারাবাহিকতায় তৃতীয় নম্বর থানার হওয়ায় এক ঘণ্টা অর্থাৎ চার ঘণ্টার ব্যবধানে গন্তব্যে পৌছার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। প্রাণ আমার ও আমাদের সবার তখন ওষ্ঠাগত।

আমাদের গাড়ি কোর্ট গারদের গেইটে পৌছতেই দেখি সেখানে অপেক্ষমান আছে শরীফ। হাতে খাবারের প্যাকেট আর এই মুহূর্তে আমাদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু পানির বোতল। পুলিশের সহযোগিতায় সেগুলো আমার হাতে পৌছতেই আর দেরি সইলো না। হাটতে হাটতেই পানির বোতলের মুখ খুলে পানি পান করতে লাগলাম।

> *আমি পানি পান করছি আর প্রায় পঞ্চাশ জোড়া চোখ চাতকের ন্যায় তাকিয়ে আছে আমার পানির বোতলের দিকে। আমার পান শেষ হতেই অনেকগুলো হাত আমার দিকে এগিয়ে এলো। এখানে পানির বোতলের মালিকানার চেয়ে তৃষ্ণার্ত মানুষের হাহাকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। আমি বোতল ধরা হাতের বন্ধনকে শিথিল করে দিলাম। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কীভাবে তৃষ্ণার্ত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলো জীবনের অপর নাম এক বোতল পানি... ।*

আমার সংক্ষিপ্ত কিন্তু বহু রকম পরিস্থিতির শিকার হওয়া এই জেল জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সময় ও ঘটনার কথা জানতে চাইলে আমি নির্দ্বিধায় বলে দিবো ১৯ জুন বুধবার সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্তের চার ঘণ্টা সময়ই ছিলো সবচেয়ে কষ্টের। আর অমানবিক, বর্বর, প্রাগৈতিহাসিক, আদিম যুগের এই পুলিশি যানবাহনে ভ্রমণের ঘটনাই হলো সবচেয়ে অস্বস্তিকর ঘটনা... ।

জেলখানার নিয়ম-কানুন

জেলখানার প্রশাসনিক কাজ, বন্দীদের দেখ-ভাল ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তিন পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো আছে। অফিসিয়াল ও দাপ্তরিক কাজের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকে। এরা জেলখানার অফিসে কাজ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে জেলখানার ভিতরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত একটা বাহিনী। বাংলাদেশ জেলের সৈনিক এরা। দিন-রাত শিফটিং করে একজন সুবেদার পদবীর দায়িত্বশীল জেলখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক তদারকি করে। সুবেদারের নিচে হলো জমাদার। আর জমাদারের নিচে হলো সাধারণ কারারক্ষী। কারা রক্ষীদেরকে জেলখানার লোকেরা মিয়া সাহেব বলে। সুবেদার-জমাদার-কারারক্ষী এই তিন ধাপের জনবল নিয়েই জেলখানার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সুবেদারের উপরে বড় বড় জেলগুলোতে সার্জেন্ট থাকে।

সার্জেন্ট গেট পাহারায় থাকে। গেট দিয়ে কারাভ্যন্তরে কী ঢুকছে কী বের হচ্ছে এগুলো দেখাশুনা করে। কারাগারের ভিতরে জমাদারদের মধ্যে আবার বিভাগ বণ্টন থাকে। যেমন সিআইডি জমাদার। তল্লাশী করা, নজরদারী করা তার কাজ। দাঙ্গা বিভাগের দায়িত্ব থাকে শাস্তি দেওয়া, কোন আসামী কোন কাজে অফিসে বা সাক্ষাতে আসা-যাওয়ার সময় তার সাথে থাকা।

অফিস সহকারী আর কারারক্ষী বাহিনী উভয় বিভাগকে পরিচালনার জন্য অফিসারদের একটা প্যানেল আছে। অফিসারদের মধ্যে একটা জেলের প্রধান তত্ত্বাবধানকারী হলেন জেল সুপার। তারপর জেলার। প্রতিটি জেলখানায় একজন করে জেল সুপার থাকেন। বিভাগীয় ও বড় বড় জেলগুলোতে সিনিয়র জেল সুপার থাকেন। জেল সুপারের পরে থাকেন প্রতি জেলখানায় একজন জেলার। জেলারের পরে থাকেন তার সহকারী হিসাবে এক বা একাধিক ডেপুটি জেলার।

এছাড়া জেলখানার অভ্যন্তরে জেল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও বন্দীদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে কয়েদীদের একটি বিশাল টিম দায়িত্ব পালন করে। যে সকল কয়েদীরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাদের সেই শ্রম বণ্টিত হয়ে এখানে আরেকটি কাঠামো তৈরি হয়। এ সকল কয়েদীরা প্রশাসনের পক্ষ

থেকেই দায়িত্ব পালন করে। কয়েদীদের এই দায়িত্ব বণ্টনকে বলা হয় 'কামপাশ'। বলা হয়, অমুকের কামপাশ হলো বাগানচালি। অমুকের পত্রচালি। কয়েদীদের কর্মক্ষেত্রকে 'দফা' বা 'চালি' বলে। যেমন নরসুন্দর দফা, পত্র চালি।

আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা

জেলখানার অভ্যন্তরে সকল কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় কেইস টেবিল। এই কেইস টেবিলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত পুরা জেলখানার সব তৎপরতা। জেল সুপার ও জেলার প্রতিদিন একবার কেইস টেবিলে এসে কার্যক্রম তদারিক করেন। সুবেদার তো সারাদিনই আছেন। আর এই কেইস টেবিলের অফিসিয়াল সকল কাজ কয়েদীরা আঞ্জাম দেয়। কয়েদী দায়িত্বপ্রাপ্তরা জেলখানার অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এ সকল কাজ করে। কয়েদীদের মধ্যে এই কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য একজন থাকে তাকে বলা হয় চিফ রাইটার। এই চিফ রাইটারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব বণ্টিত আছে কয়েদীদের মধ্যে। অধিকাংশ বিভাগীয় দায়িত্বশীলকে রাইটার বলে।

জেলখানার যত রাইটার

চিফ রাইটার : চিফ রাইটারের কাজতো তদারকি করা আছেই। তাছাড়া বিশেষ কিছু কাজও তাকে করতে হয়। যেমন জেলখানায় নতুন যে সকল বন্দী আসে তাদের সকলের নাম-ঠিকানা মামলার কাস্টডিতে যেভাবে থাকে সেখান থেকে বন্দী রেজিষ্টারে তালিকাভুক্ত করতে হয়। এই কাজ প্রতিদিন ফজরের আগেই সারতে হয়। সাধারণত রাত আটটা নয়টা পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী আমদানী হয়। কোন কোন সময় গভীর রাতেও আসে। ভোর হওয়ার আগেই এদের সকলের তালিকা রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এজন্য অবশ্য একাধিক সহযোগী থাকে। সকল নবাগত বন্দীর তালিকা রেজিষ্টারভুক্ত করে ভোর পাঁচটায় তাদেরকে কেইস টেবিলে এসে বসাতে হয়। রেজিষ্টারে নামের তালিকার ধারাবাহিকতায় বন্দীদেরকে সিরিয়ালে বসায়। আর তাদের মামলার কাস্টডিও সেই সিরিয়ালে সাজায়। এভাবেই জেলার ফাইল তৈরি হয়। সকালে জেলার সাহেব এসে চেয়ারে বসলে রাইটার সাহেব বা তার সহযোগী একজন একজন করে সাজানো ধারাবাহিকতায় বন্দীদের নাম ডাকবে। বন্দী জেলারের সামনে গিয়ে দাড়াবে। জেলার বন্দীর নাম-ঠিকানা যাচাই বাছাই করবেন। এরপর হেলথপাশ হয়। অর্থাৎ বন্দীর উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করা হয়। দুই তিনটি

সনাক্তকরণ চিহ্ন লেখা হয়। এইসব সহ আরেকটি রেজিষ্টার তৈরি করা হয়। এছাড়াও কোন ওয়ার্ডে কতজন বন্দী আছে, কোন ওয়ার্ডে সিট খালি আছে এগুলোর তথ্যও চিফ রাইটার সংগ্রহ করবেন এবং জেলার সাহেব সেই আলোকে নতুন বন্দীদের সিট বণ্টন করে দিবেন।

কলিং রাইটার : বন্দীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যারা আসে তারা বন্দী সাক্ষাতের স্লিপে নাম, পিতার নাম ও অবস্থানের জায়গা চিহ্নিত করে দিলে কলিং রাইটাররা নির্দিষ্ট বন্দীকে ডেকে এনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। কলিং রাইটার অনেক থাকে। এদের মধ্যে একজন প্রধান থাকে।

কেইস রাইটার : যাদের নামে নতুন মামলা আসবে সেই মামলা কেইস স্লিপে তুলে দিবে এবং জেলারের সামনে তাকে উপস্থিত করবে।

কোর্ট রাইটার : যে সকল বন্দীদের কোর্ট হাজিরার তারিখ আছে তাদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক তাদেরকে যথাসময়ে সংবাদ দিয়ে যথাসময়ে জেলগেটে উপস্থিত করে দিতে হয়।

জামিন রাইটার : যাদের জামিন হয়, জামিনের কাগজ আসলে তাদেরকে সংবাদ দিতে হয়। আর কোন মামলা না থাকলে মুক্তির জন্য জেলগেটে নিয়ে যায়।

পি.সি রাইটার : বন্দীদের নামে যে টাকা জমা হয় প্রত্যেক বন্দীর ব্যক্তিগত ক্যাশরূপে সেই টাকার একটা স্লিপ তৈরি করে দেয়। এই স্লিপকে বলে পি. সি। এই পি.সিতে উল্লেখিত অঙ্কের টাকা বন্দী বিভিন্ন উপায়ে ভোগ করতে পারে। অবশিষ্ট থাকলে মুক্তির সময় তুলে নিয়ে যায়।

এছাড়াও কয়েদীদের আরো অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়। যেমন গুদামের দায়িত্বে থাকে গুদাম রাইটার। বন্দীদের চিঠি অফিসের মাধ্যমে আদান-প্রদানের কাজ হয় যে বিভাগে তাকে বলে পত্রচালি। বাগানের কাজ হয় যে বিভাগে তাকে বলে বাগানচালি। রান্নাবাড়ার কাজ করে তাদের কাজ থাকে চৌকায়। বাইরে থেকে পাঠানো বন্দীদের খাবার-দাবার ও আসবাবপত্র পৌছে দেয়ার দায়িত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব, সুইপারের কাজ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ওয়ার্ডে যারা পানি আনে তাদেরকে বলে 'জলপরি'। বন্দীদের নখ-চুল কাটার জন্য নাপিতের কাজ।

বন্দীদের মধ্যে যারা পত্রিকা রাখে তাদের কাছ থেকে প্রতিদিন পুরাতন পত্রিকা জমা নিয়ে নতুন পত্রিকা বিলি করার কাজ। অনেকের দায়িত্ব থাকে ক্যান্টিন পরিচালনা করা। এছাড়া ওয়ার্ডে একজন দায়িত্বশীল থাকে– তাকে বলে ম্যাট

পাহারা। সে পুরা ওয়ার্ডের দেখাশুনা করে। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা, সিট বণ্টন এবং যে কোন বিবাদ মীমাংসা করে। ম্যাটের বেশ পাওয়ার থাকে একটি ওয়ার্ডের সকল বন্দীদের উপর। এরপর থাকে সেবক। ওয়ার্ড ঝাড়ু দেয়া সহ টুকিটাকি ফুট-ফরমায়েশ খাটার কাজও করে সেবক।

এভাবে কারাগারের অভ্যন্তরে বিশাল কার্যক্রম পালিত হয় এই কয়েদীদের মাধ্যমে। কয়েদীরাও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজগুলো করে। কারণ এই দায়িত্ব পালনের সাথে জড়িত রয়েছে তার বড় রকম ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন। দায়িত্ব পালনের রিপোর্ট ভালো হলে মার্ক ভালো পাবে। অন্যথায় মার্ক কাটা যাবে।

উপরে আলোচিত কয়েদীদের কাজগুলো সব সাধারণ বিভাগের কাজ। এই বিভাগকে বলে জি. ডি তথা জেনারেল ডিপার্টমেন্ট। এই জি. ডি বা সাধারণ বিভাগে যারা ভালো মার্কা পাবে তাদেরকে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ২১ থেকে ২৩, ২৫, ২৭ দিন পর্যন্ত রেয়াত দেয়া হয়। অর্থাৎ তাদের নির্ধারিত সাজা থেকে এই পরিমাণ সময় বাদ যাবে।

কয়েদীদের কাজের আরেকটা বিভাগ আছে। এম ডি তথা ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট। কাপড় বুনা, মোড়া তৈরি করা, হস্ত ও কুটির শিল্প জাতীয় কাজ। এই বিভাগে যারা কাজ করে তারা সরকারী ছুটির দিনগুলোতে ছুটি ভোগ করে ও বিশ্রাম করে। এই ডিপার্টমেন্টে রেয়াতের পরিমাণও কম।

জেলখানার নানা রকম ফাইল ব্যবস্থা

সাধারণভাবে ফাইল বলতে আমরা অফিস ফাইল, কাগজের তৈরি, প্ল্যাষ্টিকের বা বোর্ডের ফাইল বুঝি। জেলখানায় হলো ভিন্ন রকম এক অর্থের ফাইল। জেলখানায় বন্দীদেরকে জড়ো করার বা সুশৃঙ্খল করার ব্যবস্থার নাম হলো 'ফাইল'। অনেক রকম ফাইল আছে এখানে।

জেলার ফাইল, সুপার ফাইল/সাহেব ফাইল, ডি. সি ফাইল, জজ ফাইল আর গুণতি ফাইল।

জেলার ফাইল : বন্দীরা জেলারের সামনে চারজন বা পাঁচজন করে বসে থাকবে। আর জেলার তাদের খোঁজ-খবর নিবেন। ধারাবাহিকভাবে একজন একজন করে জেলারের সামনে দাড়িয়ে নিজের তথ্য দিবে বা আরজি পেশ করবে-- এটাকেই বলে জেলার ফাইল।

প্রতিদিন সকালে জেলার ফাইল হয়। নতুন আমদানী বন্দীরা সকাল বেলা জেলারের অপেক্ষায় মাটিতে দুই পায়ের উপর ভর করে বাথরুমে বসার মতো

করে বসে থাকে। জেলার আসার পর প্রথমে সুবেদার সাহেব 'বন্দীগণ সাবধান!' বলবেন, সাথে সাথে সকলে এক সাথে দাড়িয়ে জেলারকে সালাম দিবে। সালাম দিয়ে আবার পূর্বের মতো বসে পড়বে। সুবেদার সাহেব বিভিন্ন পরিসংখ্যানের খাতা জেলারের সামনে তুলে ধরবেন, জেলার তাতে স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর একজন কয়েদী রাইটার বা অফিস সহকারী বন্দীদের নাম বলবে– পর্যায়ক্রমে বন্দীরা জেলারের সামনে দাড়িয়ে সালাম করবে আর জেলার সাহেব বন্দীর যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। এছাড়াও কারো যদি কোন অভিযোগ বা আরজি থাকে বা সমস্যা থাকে সেটাও বলবে।

জেলার ফাইলে নতুন বন্দীদের নাম রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়। এরপর নতুন বন্দীদের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করে দুই বা তিনটি সনাক্তকরণ চিহ্নসহ তা সংরক্ষণ করা হয় বন্দী রেজিষ্টারে এবং বন্দীর কেইস স্লিপে। এটাকে বলে হেলথপাশ। প্রত্যেক বন্দীর জন্য আলাদা বন্দী রেজিষ্ট্রি নম্বর বসানো হয়। এরপর সেই নম্বর একটি শ্লেটের মধ্যে লিখে নম্বরসহ বন্দীর ছবি তোলা হয়। সেই ছবি বন্দীর কেইস স্লিপে ও তার রেজিষ্টারে সংযুক্ত করা হয়। বন্দীর মুক্তির সময় এগুলো সব যাচাই করে তারপর মুক্তি দেয়া হয়। জেলার ফাইল বেশ দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও অনেকগুলো কাজের সমন্বিত একটি ফাইল। বন্দীর সিটও নির্ধারণ করা হয় এই ফাইলেই।

সুপার ফাইল/সাহেব ফাইল : জেলার ফাইল সম্পন্ন হলে বন্দীর ছাট-কাট ঠিক আছে কিনা তা পরখ করা হয় এবং নরসুন্দর কাজের জন্য নাপিতের কাছে নেয়া হয়। চুল-গোফ ও নখ ইত্যাদি কাটছাট করে কেতা দুরস্ত করা হয়। এরপর বন্দীদেরকে পূর্বের নিয়মে জেল সুপারের অপেক্ষায় কেইস টেবিলের সামনে বসানো হয়। সুপার সাহেব আসলে আবার জেলার ফাইলের মতো 'বন্দীগণ সাবধান!' বলা হবে। আবার এক সাথে সকলে দাড়িয়ে সালাম করবে। আবার পূর্বের নিয়মে তার সামনে দাড় করিয়ে আবার তার নাম-ঠিকানা যাচাই করা হয়। জেল সুপার বন্দীদের সুবিধা- অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ ও আবেদন-আরজির কথাও শোনেন।

ডিসি ও জজ ফাইল : মাঝে মাঝে ডিসি সাহেব এবং জেলা দায়রা জজ সাহেব জেলখানার বন্দীদের খোঁজ-খবর জানতে আসেন। বন্দীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, রুমে রুমে যান। ডিসি বা জজ ফাইল হলে রুমের সকল কাপড়-চোপড় নামিয়ে সবকিছু গোছগাছ করে রাখতে হয়। বন্দীরা রুমে থাকে। সারিবদ্ধভাবে খালি মাটির উপর বসতে হয়। পাছার নিচে যেন কোন কাপড় বা অন্য কিছু বিছানো না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়।

ডিসি বা জজ সাহেব বন্দীদের খোঁজ-খবর নিতে আসবেন, তাদের কাছে কোন অভিযোগের কথা বলতে হলে আগে জেল কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে মর্মে জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়। ডিসি আর জজ সাহেবগণ বন্দীদেরকে দেখে যান কুশল বিনিময়ও করেন কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান খুব কমই হয়।

এই ফাইলগুলো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন মানুষের জন্যই বড় বিব্রতকর। দাস প্রথার যুগের মতো দাস-দাসীদের ন্যায় বন্দীদের সাথে মালিকানাধীন পণ্যের মতো আচরণ করা হয়। সমাজের এ চিত্রগুলো দেখলে বিবেক আহত হয়। আর মনে প্রশ্ন জাগে– আসলেই কি আমরা ব্রিটিশ গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছি? না স্বাধীনতার নামে প্রবঞ্চিত হয়েছি?

গুণতি ফাইল : বন্দীদের গণনা মিল হওয়া জেলখানার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। গুণতি না মেলা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের স্বস্তি নেই। যতবার কারা রক্ষীদের শিফট পরিবর্তন হয় ততবার নতুন শিফটের দায়িত্বশীলদেরকে গুণতি মিলিয়ে নিতে হয়।

প্রতিদিন তিনবার গুণতি ফাইল হয়। সকালে ভোর পাঁচটার পর পর লক-আপ খোলার আগে একবার গণনা করা হয়। সন্ধ্যা ছয়টায় লক-আপ করার পরও গণনা করা হয়। আর মধ্যখানে বারোটার সময় আরেকবার বারো গুণতি হয়। প্রতিটি গণনার সময় সকল ওয়ার্ডের বন্দীদেরকে চার বা পাঁচজন করে লাইনে বসতে হয়। একজন জমাদার এসে গণনা করবে এবং নোট খাতায় সংখ্যা লিখে নিবে। যতক্ষণ পুরা জেলের গণনা না মিলবে ততক্ষণ বসে থাকতে হবে। গণনা মিললে একটা ঘণ্টি দেয়া হবে। গণনা না মিললে আবার গণনা হবে। বার বার এভাবে দীর্ঘ সময় ফাইল দিয়ে বসা একদিকে যেমন অস্বস্তিকর অপর দিকে অমর্যাদাকরও মনে হয়। অনেক সময় ওয়ার্ডের ম্যাট বেশ আগেই ফাইল সাজিয়ে বসিয়ে রাখে কিন্তু জমাদারের আসার কোন খবর থাকে না। তখন আরো বেশি অস্বস্তি লাগে।

বিচার বৈঠক

বন্দীদের মধ্যে পরস্পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, গণ্ডগোল বা মারামারি হলে কিংবা এক বন্দীর বিরুদ্ধে অপরের কোন অভিযোগ থাকলে বিষয়গুলো কেইস টেবিলে উত্থাপিত হয়। কোন বন্দীর বিরুদ্ধে কোন অন্যায় বা অবৈধ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকেও কেইস টেবিলে আনা হয়। ছোটখাটো ও সাধারণ

বিষয়গুলোর বিচার-মীমাংসা সুবেদার সাহেব করেন। প্রয়োজনে বিচার করেন। পানিশমেন্টের উপযুক্ত মনে হলে শাস্তি দেন। বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়ার প্রচলন আছে। প্রচণ্ড লাঠিপেটা, মৃদু লাঠিপেটা বা দু' হাত উঁচু করে দেয়ালের সাথে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে দেয়া হয়। অপরাধের ধরণ অনুযায়ী আধা ঘণ্টা, এক ঘণ্টা বা আরও বেশি সময় এভাবে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে দাড় করিয়ে রাখা হয়। আবার অনেককে দীর্ঘ সময়ের জন্য দু' পায়ে বেড়ি লাগিয়ে রাখা হয়।

জেলখানার মধ্যে সাধারণত কোন বন্দীকে স্বাভাবিক অবস্থায় বেড়ি লাগানো হয় না। বেড়ি লাগানো হয় জেলখানার বাইরে নেয়ার সময়। কিন্তু এই পানিশমেন্ট বেড়ি জেলখানার মধ্যেই লাগিয়ে রাখা হয়। পানিশমেন্টের জন্য দুই ধরনের বেড়ি আছে। একটা তো সাধারণ ডান্ডাবেড়ি। আরেকটা বেড়ি আছে সেটাকে 'আওড়া বেড়ি' বা 'আড়াবেড়ি' বলে। অর্থাৎ দু পায়ে বেড়ি (লোহার গোলাকার রিং) পরিয়ে দশ ইঞ্চি বা এক ফুট পরিমাপের একটা লোহার ডান্ডা আড়াআড়িভাবে দুই পায়ের বেড়ির সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। আড়াবেড়ি পরে হাটতে খুব সমস্যা হয়। একটু একটু করে পা সামনে বাড়িয়ে হাটতে হয়। এছাড়াও আছে 'দোস্ত বেড়ি'। দোস্ত বেড়ি অর্থ হলো একজোড়া ডান্ডা বেড়ি দু'জনকে পরানো হবে। অনেকটা এক পায়জামা দুজনকে পরানোর মতো। পায়জামার এক পা একজনের ডান পায়ে আর আরেক পা অপরজনের বাম পায়ে ঢুকিয়ে দিলে যেমন হবে, তেমনি একজনের ডান পায়ে আর অপরজনের বাম পায়ে একজোড়া ডান্ডাবেড়ি লাগানোর নাম হলো 'দোস্ত বেড়ি'। দু'জন মিলে কোন অপরাধ করলে সাধারণত এই দোস্ত বেড়ি লাগায়।

এভাবে দু চার দিনের জন্য বা এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ বা আরো বেশি সময়ের জন্য এই বেড়ির শাস্তি দেয়া হয়। অনেক সময় শাস্তি স্বরূপ একাকী ফাঁসির কনডেম সেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়। অনেক সময় হাত মুড়িয়ে পিঠের পিছনে বেধে বা দু হাত দু পায়ের নিচে নিয়ে মাঝখানে লাঠি দিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রৌদ্রের মধ্যে দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা হয়।

জেলখানায় সাধারণত যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো মাদক সেবন ও মাদক সংরক্ষণ। এছাড়াও রয়েছে চুরি, মারামারি এবং সমকামিতার মতো চরিত্রহীন কাজ। এ সকল অপরাধে কেইস টেবিলে বিচার হয়। আবার মালপানি ঢালতে পারলে ম্যানেজও করা যায়।

অন্য কোন বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে এটাকে বলা হয় বাদী হওয়া। যে কেউ কেইস টেবিলে গিয়ে বাদী হতে পারে। বাদী হলে বাদী ও অভিযুক্ত উভয়কে কেইস টেবিলের বিচার বৈঠকে তলব করা হয় এবং উভয়ের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়

বড় ধরনের কোন ব্যাপার হলে জেলার বা জেল সুপার পর্যন্ত লেগে যায় সমাধান করতে। খুলনার জেলখানায় মাওলানা গোলাম কিবরিয়া সাহেব যেই ওয়ার্ডে ছিলেন রূপসা– ৩। সেই ওয়ার্ডে নামাযী মানুষের বড় একটা সংখ্যা ছিলো। ওদিকে ওয়ার্ডে ভিসিআর চালানো হয়। কিছু দুষ্টু মানুষ ভিসিআর চালানোতে সীমালঙ্ঘন করতে লাগলে গোলাম কিবরিয়া সাহেবসহ বেশ কয়েকজন কেইস টেবিলে অভিযোগ করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি মীমাংসা করতে জেল সুপারকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিলো।

জেল ব্যবস্থায় সংস্কার

জেলখানায় বহু বর্বর ও অমানবিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এগুলো চলছে ঔপনিবেশিক আমল থেকে। এগুলো আছে তাই চলছে। প্রচলিত এই রীতি-নীতি ও ব্যবস্থার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা আছে কিনা সেটা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় খুব কম। মানবিক ও ইসলামী শরীয়ার বিবেচনায় যদি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হতো, তাহলে আসলেই জেল জীবন মানুষকে আলোর পথই দেখাতো।

তবে খুশির কথা হলো, দশ পনের বছর আগের তুলনায় আজকের জেল ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার এসেছে– অনেক উন্নতি হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ যারা জেলখানায় আছেন বা দশ-পনের বছর আগে জেলখানায় ছিলেন, এখন আবার এসেছেন, এই জাতীয় লোকের দৃষ্টিতে পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এক সময় জেলখানায় বন্দীদের জন্য পিয়াজ-মরিচ সংরক্ষণ করাও মহা অপরাধ ছিলো। এক বন্দী তার নিজের দেখা ঘটনা শুনালো, দুটি কাঁচা মরিচ রাখার অপরাধে একজন বন্দীর পিঠে সজোরে চার-পাঁচটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিলো। প্রতিটি আঘাত পিঠে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো। কিন্তু আজকের জেলে এগুলো সবই বৈধ।

বছরের পর বছর বিচারে বা বিনা বিচারে বন্দীরা কারারুদ্ধ থাকে। বিবাহিত নারী বা পুরুষ সকলের জন্যই এটা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ ও মানবিক বিচারে অন্যায়। বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষদের জন্যও এটা সমস্যা। কিন্তু এ সকল সমস্যার কোন সমাধান নেই।

পুরাতন বন্দীদের মতে জেলখানার সাবেক আইজি জাকির হোসাইন সাহেব ও ডিআইজি শামছুল হায়দার চৌধুরী সাহেব জেল ব্যবস্থায় প্রচলিত অন্যায় ও অমানবিক ব্যবস্থাগুলোতে অনেক সংস্কার করে গেছেন। আরো আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জেলখানায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সাথে 'ভিতর সাক্ষাত' নামে কিছু সময় কাটানো ও এক সাথে খাবার-দাবার খাওয়ার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও মামলার আইনী কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজনে সীমিতভাবে বন্দীদের জন্য মোবাইল ফোনে কথা

বলার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিলো। পরিবার নিয়ে রাত্রি যাপনের মতো ব্যবস্থা করারও পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এছাড়াও তারা সরাসরি সরেজমিনে গিয়ে বন্দীদের খোঁজ-খবর নিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতেন। তাদের এ সকল মহৎ উদ্যোগের কারণে আজও বন্দীদের মুখে মুখে তাদের নাম উচ্চারিত হয়।

বন্দীদেরকে পরিবার থেকে এভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ কারণে সমকামিতা ও মাদকাক্রান্ত হওয়ার মতো জটিল অপরাধ ও সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।

রুদ্ধশ্বাস ও নাটকীয় মুক্তি

সকল মামলায় জামিন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল জামিনের কাগজ জেলগেটে পৌঁছার অপেক্ষার পালা। বিশেষভাবে হাইকোর্ট থেকে জামিন হওয়া খুলনার দুটি মামলার জামিন নামা জেলগেটে পৌছতে সবচেয়ে বেশি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত হাইকোর্ট থেকে দূরবর্তী জেলাগুলোতে জামিন নামা পৌঁছতে দুই সপ্তাহ বা তারচেয়েও বেশি সময় লাগে। আর আমার তো অবস্থান কাশিমপুরে। তাই জামিন নামা খুলনা হয়ে আবার কাশিমপুর আসা লাগবে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তো বেশ ধীরগতির। তবে পয়সা খরচ করে তদবীর করতে পারলে স্বল্প সময়েও কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। আমার জন্য সেভাবে তদবীর করা হল। হাইকোর্ট থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জামিন নামা পৌঁছল। সেখান থেকে ফ্রেশবেল স্বাক্ষর হয়ে খুলনা জেলেও পৌছে গেল দ্রুতগতিতে। খুলনা জেলের মুক্তিশাখায় কর্মরত আবদুল্লাহ ভাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রসেসিং করে চব্বিশ ঘণ্টার ডাকে কাশিমপুর পাঠিয়ে দিলেন। নামে চব্বিশ ঘণ্টার হলেও সরকারী ডাক বিভাগে ঢাকার জিপিও থেকে গাজীপুর জেলা পোস্ট অফিস হয়ে কাশিমপুর পৌঁছতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ৩০ জুলাই অপরাহ্নে খুলনা থেকে ডাকে পাঠানো কাগজ দুই দিনের মাথায় কাশিমপুর পৌঁছা একটু জটিলই। ১ আগস্ট আবার বৃহস্পতিবার। এ দিন না পৌছলে শুক্র-শনি দুই দিনের সরকারী ছুটির ফাঁদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এদিকে শুক্রবার দিন রমযানের জুমাতুল বিদা। আশা ছিল মসজিদে জুমা পড়াবো। তাই বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই দৌড়-ঝাঁপ শুরু করল শরীফ। কাশিমপুরের পোষ্ট মাস্টারকে আগের দিন বিকালেই ম্যানেজ করে রেখেছে। পর দিন ভোরে তাকে নিয়ে কোনাবাড়ি যাবে, প্রয়োজনে কোনাবাড়ির মাষ্টারকে নিয়ে গাজীপুরে যাবে। এভাবে অসামান্য তৎপরতার মাধ্যমে ১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার মধ্যেই পোস্ট মাষ্টারসহ আমার জামিন নামা কাশিমপুর জেলগেটে পৌঁছে দিল শরীফ।

১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার পূর্বেই খুলনার উভয় মামলার জামিন নামা জেলগেটে পৌঁছার পর থেকেই শুরু হল নাটকীয়তা। আমার নামে দায়েরকৃত ১৮ টি মামলারই জামিন নামা জেল কর্তৃপক্ষের হাতে। আইনত এখন

তাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাকে যত দ্রুত সম্ভব মুক্ত করে দেয়া। সে রকম প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল। আমাকে রিসিভ করার জন্য পরিবার, সংগঠন ও প্রিয়জনদের অনেকেই জেলগেটে এসে হাজির হল। কারা কর্তৃপক্ষও মুক্তির সম্ভাবনার কথা ইতিবাচক বলেই ধারণা দিচ্ছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে তাদের ভোল পাল্টে গেল। নানা রকম অজুহাত দেখাতে লাগল। শেষে মিথ্যা এক অজুহাত দেখিয়ে ঐ দিনের মত মুক্তি নাকচ করে দিল। তারা বলল, হাইকোর্টের জামিন নামা যাঁচাই করার জন্য হাইকোর্টে লোক মারফত পাঠানো হয়েছে। তাদের ফিরতে সময় লাগবে। আজকে আর সম্ভব নয়। অথচ হাইকোর্টের জামিন নামা যাচাই করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্ট লোক পাঠায়- এটা অনেকটা বাঙ্গালীকে হাইকোর্ট দেখানোর মতই একটা ব্যাপার ছিল। জামিন নামা হাইকোর্ট থেকে খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে গেছে। সেই কোর্টই যাচাই-বাছাই করে তারপর ফ্রেশবেল ইস্যু করেছে। এরপর সেটা খুলনা জেলখানায় পাঠিয়েছে। বন্দী কাশিমপুর আছে বিধায় খুলনা জেল কাশিমপুর পাঠিয়ে দিয়েছে। হাইকোর্টের সাথে যোগাযোগ ও যাচাই-বাছাই করা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের দায়িত্ব। এই সকল স্তর অতিক্রম করেই তো জামিন নামা কাশিমপুর জেলে পৌছেছে।

যাই হোক বৃহস্পতিবার মুক্তি পাওয়া যাবে না জেনে সবাই ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেল।

আসল ব্যাপার ছিল ভিন্ন। সরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও মহল থেকে ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তি দিবে না। বৃহস্পতিবার ক্লিয়ারেন্স পায়নি তাই এত গড়িমসি। সব কারাগারই বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার পূর্বে থানা ও পুলিশকে বন্দী মুক্তির ব্যাপারে অবহিত করে এবং তাদের অনাপত্তি গ্রহণ করে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কাশিমপুরে ব্যাপারটি নিয়ে সরকারের বাড়াবাড়ি মাত্রাতিরিক্ত। কাশিমপুরে এমনিতেই রাজনৈতিক বন্দী বেশি, তাই এখানে জেলগেটে পুনঃ গ্রেফতারসহ বন্দী মুক্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি অনেক বেশি। তন্মধ্যে হাই সিকিউরিটির পরিস্থিতি সবচেয়ে কঠিন। আর তাই নেতৃবৃন্দের অনেকেই জামিন নেয়ার পর হাইকোর্ট থেকে আবেদন করে নো-এ্যারেস্ট-নো হ্যারাজ মর্মে আদেশ আনিয়ে নেয়। বৃহস্পতিবার মুক্তি না হওয়ায় দুশ্চিন্তাটা

বেড়ে গেল। সরকারের উদ্দেশ্য নিয়েও সংশয় দেখা দিল। আমাদের লোকজন প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে পরিস্কার কোন জবাব পাচ্ছিল না। এই অবস্থায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটতে লাগল সময়। এহেন দূরভিসন্ধিমূলক আচরণের কারণে আমার মধ্যে একটা ক্ষোভও কাজ করছিল। সেই সাথে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও শঙ্কিত হচ্ছিলাম। রাতটা এভাবেই অস্থিরতার মধ্যে কাটতে লাগল। বাসার লোকজনের কাছে আমিই শান্তনার সংবাদ পাঠালাম। আর হিম্মতের সাথে ও নীতি-আদর্শের প্রশ্নে অটল থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলার পরামর্শ দিলাম। সরকারের উচ্চ মহল থেকেও আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সম্পর্কন্নোয়নের প্রচেষ্টার সংবাদ আসছিল।

পর দিন ২ আগস্ট শুক্রবার দিন ভোর ৬টার দিকেই জামিনে মুক্তির জন্য আমার ডাক পড়ল। ব্যাগপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল হুসাইন। তাড়াতাড়ি গোসল করে রেডি হয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। প্রায় দুই মাস সময় একত্রে থেকে একটি মমতার বন্ধন তৈরি হয়ে গিয়েছে সকলের সাথে। মুক্তির সম্ভাবনার অপরিসীম আনন্দের মধ্যেও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ এই প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ যাতনা হৃদয়ে একটা দাগ ঠিকই কাটছে। চন্দ্রা ৫ম ও ৪র্থ তলার সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকাল ৭টার মধ্যেই কেইস টেবিলে উপস্থিত হয়ে গেলাম। এখানকার আনুষ্ঠানিকতা সারতে বেশ সময় লাগে। ইতিমধ্যে নামাযের নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে দুই দুই চার রাকাত সালাতুদ্দোহা আদায় করে নিলাম। সকাল ৯ টা নাগাদ জেল গেইটের অফিস কক্ষে আসলাম। অফিসে কর্মরত ডেপুটি জেলারসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের সাথে ইতিমধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা এ দিন জামিন প্রাপ্ত ১৩ জন ছিলাম। এর মধ্যে শিবিরের ৭ জন ছেলে, যাদের নামে ৭/৮টি করে মামলা ছিল। তাদেরকে পুনঃ গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তেজগাঁও থানা থেকে পুলিশের পিকআপ ভ্যান এসে অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটি তারা জানে। কিন্তু কোন টেনশন তাদের মধ্যে কাজ করছে না। কারণ যাত্রাবাড়ী কিংবা মিরপুর থানা ছাড়া অন্য থানা রি-এ্যারেস্ট করলে ভালো। কারণ অন্যান্য থানাকে ম্যানেজ করা সহজ। পুনঃ গ্রেফতার করে হালকা মামলা দিলে দুই একদিনের মধ্যেই আবার জামিন লাভ হয়ে যায়।

আমার জামিন হয়েছে বিষয়টি জেলগেট থেকে ডিবি, র‍্যাব, সিআইডি ও এসবি সহ সব সংস্থাকে জানানো হয়েছে। একে একে প্রতিটি সংস্থা থেকে লোক এসে আমার তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক ক্লিয়ারেন্স দিয়ে গেল যে, আমার ব্যাপারে তাদের কোন আপত্তি নেই। র‍্যাব থেকে যিনি এসেছিলেন তিনি একজন দ্বীনদার

মানুষ। তার কাছে জানতে চাইলাম শুধু আমার সংবাদ নিতেই এসেছেন কিনা? বললেন, কাশিমপুর– ২ কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন শামীম সাঈদী, তার ব্যাপারেও ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে। পরে শামীম ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি, তিনি হাইকোর্ট থেকে নো-এ্যারেস্ট, নো হ্যারাজ আদেশ নিয়ে বের হয়েছেন।

গাজীপুর এসবির এক ভদ্রলোক আসলেন। তার কথায় সরকারের এ সকল বাড়াবাড়ির প্রতি স্পষ্ট বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল। সবারই এক কথা। ভাই! আমরা চাকরি করি। আমাদের হাত-পা বাধা। সরকার যা বলে আমাদেরকে তাই মানতে হয়।

মামলা বেশি হওয়ায় প্রতিটি পদে পদে আমাকে অতিরিক্ত হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। মুক্তির সময় কারা কর্তৃপক্ষ সবগুলো থানায় যোগাযোগ করে ক্লিয়ারেন্স নিল। খুলনার থানাগুলোতেও ফোন করে খবর নিল। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটল। জুমার দিন জুমার নামায তো দূরের কথা জোহরের নামাযও জামাতের সাথে আদায় করতে পারলাম না। জেলার সাহেবের নাম দিদারুল ইসলাম। একজন একজন করে বন্দীর চুলচেরা তথ্য যাচাই করে দেখলেন। জুমার নামাযও পড়তে গেলেন না। সাধারণত কোন শুক্রবার দিনই তিনি জুমায় যান না। নিজে নামায না পড়লেও ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাপারে বন্দীদেরকে নসীহত ও মনগড়া উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেন না।

বিকাল ৩টা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের আচরণে মনে হচ্ছিল জেলগেটে কোন সমস্যা হবে না। ৩টার পরই তাদের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারলাম মিরপুর থানা থেকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ আসছে। ইতিমধ্যে জামিনপ্রাপ্ত সকল বন্দীগণ বের হয়ে গেছে। শিবিরের সাতজনকে তেজগাঁও থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। বাকি পাঁচজন মুক্ত হয়ে আপনজনদের সাথে চলে গেছে। কিন্তু আমাকে ছাড়ছে না। ডেপুটি জেলারকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে হয়ত সময় ফুরিয়ে গেছে অথবা ব্যাপারটি তার আয়ত্বের বাইরে। জেলগেটকে আগেই ম্যানেজ করে রাখতে হয়। আমার জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর পরই আইনজীবি বলেছিল, জেলগেটকে ম্যানেজ করতে চাইলে তার সোর্স আছে। সেই সোর্স ধরে ম্যানেজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল আমার আইনজীবি। কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তা লাগবে না। শাফিউর রহমান ফারাবীর কাছ থেকেও পরে শুনেছি, আগে থেকেই জেল গেটে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গেট ম্যানেজ করে সে মুক্তি পেয়েছে। যাই হোক

চূড়ান্ত মুহূর্তে আর কিছু করার ছিল না। পুনঃ গ্রেফতার হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। জেলগেটে ভিড় করা আমাদের লোকজনকে জেলখানার কারারক্ষীরা জেলগেট থেকে কৌশলে সরিয়ে দিল এই কথা বলে যে, আপনারা দূরে সরে যান এক্ষুণি আপনাদের লোক বের হবে।

ইতিমধ্যে একটি সাদা মাইক্রো এসে থামল জেলগেটে। মাইক্রো থেকে বেরিয়ে আসল একজন পুলিশের দারোগা। আমার পরিচিত চেহারা। মিরপুর থানায় রিমান্ডে থাকাবস্থায় তাকে দেখেছি। আমাকে ডিসির অফিসে নিয়ে গিয়েছিল যেই টিম, সে ছিল তার প্রধান। রফিক তার নাম। ভিতরে ঢুকে ডেপুটি জেলারের টেবিলের সামনে বসল। আমিও সেখানেই বসা ছিলাম। খলনায়কের মত মুখে বক্র হাসি। আমাকে ইঙ্গিত করে বলল, হেফাজতের প্রধান বক্তা সে। সেই কথারও পুনরাবৃত্তি করল, 'তোমাদের কাছে কত বুলেট আছে'। এদের আসার অপেক্ষাতেই এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বসিয়ে রেখেছে কারা কর্তৃপক্ষ। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে গেট খুলে আমাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হল। আমি বের হয়ে আসলাম। সাথে মিরপুর থানার তিন-চারজন পুলিশও একই গেট দিয়ে বের হল এবং আমাকে আবার গ্রেফতার করে মাইক্রোতে তুলে নিল। আমাকে নিতে আসা আমার আপনজনদেরকে আমার কাছেও ভিড়তে দিল না। মাহবুব ভাই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চতুর্দিকে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে দিলেন। পুলিশ আমাকে তুলে নিয়ে কাশিমপুর- ১ কারাগারে গেল। সেখান থেকে আরেকজনকে পুনঃ গ্রেফতার করল। এরপর গেল কারাগার- ২-এ। ইতিমধ্যে আমাকে বরণ করতে আসা মানুষজন জড়ো হতে লাগল। পুলিশের গাড়িতে হামলা হয় কিনা সেই ভয়ে পুলিশ লাইফ জ্যাকেট পরে হাতে অস্ত্র তুলে নিল। গাড়িতে একজন উপজাতীয় পুলিশ ছিল, তার আচরণ যথেষ্ট ভালো ছিল। আরেকজন পুলিশ বলল, রমযান মাস তো! নইলে ওনাকে নিতে লক্ষ মানুষ এখানে চলে আসত। এমনি কথাবার্তা চলছিল। আমরা তখন কাশিমপুর- ২ কারাগারের গেটে অপেক্ষমান আরেকজন মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীকে পুনঃ গ্রেফতার করার জন্য। হঠাৎ সেই দারোগা রফিক পেছন থেকে এসে আমার দিকে মোবাইল এগিয়ে দিয়ে বলল, ওসি সাহেব কথা বলবেন। আমি ফোন ধরলাম। অপর প্রান্ত থেকে মিরপুর থানার ওসি সালাহুদ্দীন সাহেব নিজের পরিচয় দিয়ে আমাকে বললেন, উপর থেকে আপনার মুক্তির ব্যাপারে ফোন এসেছে। ওসির সাথে আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে, সেটার কথাও স্মরণ করলেন এবং আমাকে থানায় যাওয়ার দাওয়াত জানালেন। আমি মুক্তির কথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। এভাবে গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নেয়ার পর মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে অনেকটা বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসার মতই অনুভূত হল।

বৃহস্পতি ও শুক্র ১ ও ২ আগস্ট পূর্ণ দুই দিনের শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয়তার পর লাভ করলাম কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ। শারীরিক কোন কষ্ট না থাকলেও বন্দীত্বের জীবন তো পরাধীনতার জীবন। পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে মুক্ত জীবনের পাণে ছুটে চলার সময়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশের মত নয়। সর্বপ্রথম মাহবুব ভাইয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। প্রায় সকলের চোখেই তখন অশ্রু। এ অশ্রু আনন্দের। আশরাফুজ্জামান সাহেব পরে বলেছেন, আনন্দের কান্নায় যে কী সুখানুভূতি সেদিন সেটা উপলব্ধি করেছি। খেলাফত মজলিসের মহাসচিব হুমায়ুন কবির ভাই, মাওলানা জালালুদ্দীন, মাওলানা আতাউল্লাহ সহ খেলাফত ও যুব মজলিস নেতৃবৃন্দ আমাকে স্বাগত জানাল। মাওলানা সাঈদ, শরীফ সহ ছাত্ররা তো ছিলই। কারো হাতে ফুলের তোড়া, কারো হাতে ফুলের মালা। সবাইকে নিয়ে প্রথমেই গেলাম পার্শ্ববর্তী মসজিদে। সিজদায়ে শোকর আদায় করলাম। সাথীরাও সালাতুশ শোকর আদায় করল।

মুক্তি পেয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সকলকে সহ রওয়ানা করলাম মাকবারায়ে আযীয-এর উদ্দেশ্যে। রমযানের দিন। পথেই ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ায় জামিয়া রাহমানিয়ায় ইফতারের আয়োজন করা হল। এখানকার সংক্ষিপ্ত মিলন মেলায় মাহমুদ ভাই, মাহফুজ ভাইসহ অন্যদের সাথে সাক্ষাত হল। আমার উস্তাদগণের মধ্যে মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব হুযুর ইতিকাফে ছিলেন সাত মসজিদে। মসজিদে গিয়ে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করলাম। এরপর সবাই সহ গেলাম মাকবারায়ে আযীযের দিকে। এলাকাবাসী অনেকেই আমার মুক্তি ও আগমনের সংবাদ শুনে অপেক্ষমান ছিলেন। সবাইকে নিয়ে আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর কবর যিয়ারত করলাম। পাশের মসজিদে ইশার নামায আদায় করে বাসার পথে চললাম। বাসায় ঢুকতেই মুহতারামা আম্মাজানকে সামনে পেলাম। সবার আগে আম্মাজানের কপালে চুমু খেলাম। পরম মমতা ভরে তিনি আমার মাথায় স্নেহ-মমতার হাত বুলিয়ে দিলেন। বোনদের সাথে সাক্ষাত হলো। মিদাদ-ইমাদ-যিমাম-রুসাইফা, যুহাইফা, আহমদ, জুনাইনা ও রাফিদ সহ বাচ্চাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমিনাকে দেখলাম না। সে আমার জন্য ঘরেই অপেক্ষমান ছিল... ।

দুঃখের মাঝেও সুখের পাওয়া

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا

তোমরা শত্রুর মুখে পড়ার আকাঙ্ক্ষা করো না কিন্তু মুখে পড়ে গেলে অটল থেকো। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং সকলকে হেফাজত করেন। কারাগারে আসা একটি বিপদই তো ছিলো। পদে পদে বিপদ। সমস্যা। মানসিক যন্ত্রণা। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ যাতনা। কিন্তু আল্লাহ চাইলে তো আগুনের কুণ্ডকেও ফুলের বাগানে পরিণত করেন। কারা জীবন থেকেই মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন করেন। গোবর থেকে পদ্মফুল ফোটানো তো সেই মালিকেরই কাজ। তাই আমিও আমার কারা জীবনের বিপদ ও কষ্টের ভেতর থেকে আমার পাওয়াগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করি।

সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ অনুযায়ী– বিপদের দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়া। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

ما من مسلم يصاب بمصية حتى الشوكة يشاكها الا حت الله بها سيئته ورفع بها درجته.

যে কোন মুসলিম কোন বিপদগ্রস্ত হয় এমনকি তার পায়ে যে কাঁটাটি বিদ্ধ হয় আল্লাহ তা দ্বারাও তার পাপ মোচন করেন ও মর্তবা বুলন্দ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসসহ কুরআন ও হাদীসের আরও অসংখ্য ভাষ্যের ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি আমার এই কারাভোগের বিনিময়ে দয়াময় আল্লাহ আমার বহু গুনাহ মাফ করে দিবেন। তাছাড়া আমি অনেক বড় পাপী তাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু শত্রুরা যে অপরাধে আমাকে আটক করেছে, কষ্ট দিয়েছে তাহলো আল্লাহর দ্বীন ও নবীর শান-মর্যাদার পক্ষে গড়ে ওঠা আন্দোলনে ভূমিকা পালন করা। তাই আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমিও ঐ সকল পুণ্যবানদের কাতারে সর্বশেষ হলেও যুক্ত হতে পারবো, যারা যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীনের জন্য জুলুমের শিকার হয়েছেন।

আরেকটি পাওয়া হলো– দুআ। আল্লাহর খাছ বহু বান্দা-বন্দী, অনেক আলেম-ওলামা, তালিবুল ইলম, নিষ্পাপ মাছুম শিশুরা আমার জন্য দুআ করেছে। চোখের পানি দিয়ে আমার কল্যাণ ও মুক্তি চেয়েছে। আল্লাহর বান্দা-বন্দীদের এই দুআ ও অশ্রু শুধু ইহকালেই নয় আমি পরকালেও এর সুফল ও বিনিময় প্রত্যাশা করি।

আরেকটি পাওয়া হলো– কিছু নেক আমল করার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ। কারাগারের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত জীবনের তুলনায় মালিককে বেশি ডাকার সুযোগ আসে। পাপ ও গুনাহ করার ক্ষেত্রও সীমিত থাকে।

একটি পাওয়া হলো– একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু অভিজ্ঞতা। আমাদের সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারাজগত। এখানকার হালচিত্র, এখানকার মানুষের হাল-অবস্থা জানা গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিজ্ঞতা। ইসলামী আন্দোলনের পদে পদে জেল-জুলুম হলো অনিবার্য সঙ্গী। আমি মুক্ত থাকতে দ্বীনী আন্দোলনের কোন ভাইয়ের উপর যদি এই পরীক্ষা আসে তাহলে আমি মনে করি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে জেলখানা থেকে কোর্ট-কাচারী পর্যন্ত সহযোগিতা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশিষ্ট

কারাগার থেকে আব্বাজান হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)কে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি

মামুন

১০. ০৬. ১৩

কাশিমপুর, গাজীপুর

আব্বা!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন আজ ৩০৬ দিন অতিবাহিত হতে চলেছে। আমাদের তেরটি ভাই-বোনকে এক সুতোয় বেঁধে রেখে গেছেন। আমাদের কাছে রেখে গেছেন দুটি আমানত। যার প্রথমটি হল আপনার অর্ধাঙ্গিনী, আপনার জীবন যুদ্ধের আমরণ সঙ্গিনী আমাদের মুহতারামা আম্মা। আমরা যখন একে একে কর্মস্থলে পদার্পণ করতে লাগলাম, তখন থেকেই আপনি নিবিড় পরিচর্যায় আমাদের মধ্যে মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

জীবন চলার সব শিক্ষাইতো আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন। শিক্ষাদানে আপনার কৌশল ছিল বরাবরই অত্যন্ত কার্যকর, কিন্তু জবরদস্তিমূলক নয়। স্বতস্ফূর্তভাবেই যেন আমরা শিখে নেই সেটাই ছিল আপনার শিক্ষাদানের অন্যতম সৌন্দর্য। আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আপনার মত পিতার ঔরস্য লাভ। পরিবার গঠনে আপনার তুলনা আপনিই। শিক্ষা-সাহিত্য, অর্থনীতি-বাণিজ্য, সমাজ-রাজনীতি, দাওয়াত-কূটনীতি সকল ময়দানেই ছিল আপনার সরব পদচারণা। প্রত্যুষ থেকে গভীর রজনী দূরন্ত ছুটে চলা এক মর্দে মুজাহিদের অনুপম দৃষ্টান্ত আপনি। এমন কর্মমুখর পথচলার ক্লান্তি কখনও অবসাদগ্রস্থ করতে পারেনি আপনাকে। পারেনি আমাদের প্রতি আপনার অভিভাবকত্বের সদা জাগ্রত দৃষ্টিকে নিবৃত্ত কিংবা আচ্ছন্ন করতে। আমরা কতটুকু শিখলাম বা আপনার শিক্ষা কতটুকু ধরে রাখতে

পারলাম সেটা একটা সময় সাপেক্ষ প্রশ্ন। কিন্তু আপনার সাফল্য তো প্রশ্নাতীত!

আর সবকিছুর সাথে মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের শিক্ষাটাও আপনি দিয়েছেন যথাসময়েই। আহ! আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপনের কী ভাষা হতে পারে?

প্রতিটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় নির্বাচন ছিল আপনার শিক্ষাদান কৌশলের আরেকটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। দ্বীনের শিক্ষাদান শুরু করেছেন সেই ছোট্টকাল থেকেই। প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন যথাসময়ে। ছেলেদেরকে মসজিদে গিয়ে আর মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে আউয়াল ওয়াক্তে নামাযের জন্য নির্ধারিত কাপড় পরিধান করে নামায আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু কি শিক্ষাই? নিবিড় পর্যবেক্ষণটাও কি বাদ পড়েছে আপনার দৃষ্টি থেকে? ভাই-বোন এক সাথে মিলেমিশে থাকার তরবিয়াতটাও তো আপনার কাছ থেকেই পাওয়া। ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যে আদর্শ দ্বীনী পরিবেশের দরকার, তার ব্যবস্থা যথাসময়েই আপনি করেছেন কি অপূর্ব দক্ষতা ও নিপুণ পরিকল্পনার সাথে। মেয়েদেরকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর আগেই স্বামীর মর্যাদা ও অধিকার এবং শশুর-শ্বাশুড়ির সাথে সদাচরণের তালীম দিয়েছেন। ঘরে বউ আসার আগেই ছেলেদেরকে তাদের অধিকার, তাদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দেয়ার তাকিদ করেছেন। শুধু কি তাকিদ করেই ক্ষ্যান্ত হয়েছেন? ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন।

আমার বৈবাহিক জীবনের শুরুর দিনগুলোর কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কীভাবে স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাত করতে হবে। দুই রাকাত নামায তাকে নিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। কোন কেরাত পড়তে হবে তাও বলে দিলেন– সূরা বাকারার ১২৭ নং আয়াত থেকে শুরু করে। বিয়ের আগ মুহূর্তে যে বাবা তার সন্তানকে আলেম ও মুহাদ্দিস বানিয়ে দেওয়ার পরও এই ছোট্ট ছোট্ট বিষয়গুলোর শিক্ষা দিতে ভুলে যান না সেই বাবার শিক্ষাদান ও তরবিয়তের সর্বব্যাপিতা (جامعيت) বিষয়ে আর কী বলার থাকতে পারে?

১৯৯৯ সালে আমি বিয়ে করি। তখনো আমি সিরাজগঞ্জের বেতুয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত। নববধু আমার আমিনা আমাদের বাসায় একা থাকে। আমি সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর পর বাসায় আসতাম। আমাদের বাসায় তখন স্থান সংকুলানের সংকীর্ণতা ছিল। আপনি তখন মহা ব্যস্ত একজন মানুষ। দেশ-জাতি ও মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়েই আপনার রাত-দিনের মগ্নতা। এর ভিতর দিয়েও আপনি বাসায় এসে নিয়মিত আপনার পুত্রবধূর সংবাদ

নিতেন। বলতেন, মামুন নেই তাই বউয়ের খবর নেয়ার দায়িত্ব আমার। যেন তার কোন অসুবিধা না হয়।

আমাদের বড় ভাবী আমাদের বাসায় এসেছেন আশির দশকের গোড়ার দিকে। এরপর একে একে আপনার আরো চার ছেলের বধু এলো। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশি এই সময়ে কোন দিন আপনি আপনার কোন পুত্রবধূকে ধমকের সুরে কথা বলেছেন এমন নজির নেই। বকুনি দিতে হলে আম্মাকে দিয়েছেন বা আপনার নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়েছেন। এ ছিল আপনার শরাফত ও ভদ্রতার ছোট্ট একটি দিক।

যখন দাওরা ফারেগ হয়ে কর্মজীবনে পদার্পণের সময় ঘনিয়ে এলো। রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফে বসিয়ে দিলেন। যে দিন প্রথম বেতুয়া মাদরাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা হলো আপনার সাথে, কেমন পোশাক পরতে হবে বলে দিলেন। যেতে যেতে পথে পথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আরেক দীর্ঘ ইতিহাস। কীভাবে সবক পড়াব, কীভাবে হাদীস পড়াব সবই তো হাতে-কলমে শিখিয়ে দিলেন। শিক্ষকতা ও কর্মজীবনে আত্মার উন্নতির জন্য আমল ও অযিফার দীক্ষাটাও দিয়ে দিলেন। রাজপথে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে ভূমিকা পালনের প্রেরণা আর তার পদ্ধতি, সেটাও শেখালেন। এমন বাবা যে তার সন্তানদেরকে এমন পরিপূর্ণ তরবিয়ত করেন– সন্ধান করলে আপনার উপমা পাওয়া সম্ভব কিনা জানি না তবে বিরল তো অবশ্যই।

আব্বা!

বলছিলাম আপনার যথাসময়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের কথা। এভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তরবিয়ত করেছেন। কর্মজীবনে পদার্পণের পর নিজ নিজ উপার্জনের কিছু পয়সা যখন আমাদের হাতে আসতে লাগল, আপনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিলেন 'তোদের উপার্জন থেকে একটা অংশ প্রতি মাসে তোদের মায়ের হাতে দিবি এতে তোদের জীবনে বরকত হবে।' কী মমতা ভরা নির্দেশনা! হুকুম নয় জবরদস্তি কানুন নয়। কিন্তু দায়িত্ববোধ জাগরণের এক অপূর্ব কৌশল! আপনার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ছিল আমরা কি তা পরিপূর্ণ পালন করেছি বা করতে পেরেছি? কোন দিনই নয়। কিন্তু কখনো কোন পরিসরে এ সংক্রান্ত কোন ক্ষোভ কোন অভিযোগ কিংবা কোন অনুযোগ পর্যন্ত করতে দেখিনি বা শুনিনি। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও আমরা আপনার হৃদয়ে দেখেছি আকাশের মতো উদারতা। আমরা সামান্য করলেই আপনি সেটাকে আপনার হৃদয়ের

বিশালতার অনুপাতে বরণ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে আম্মার আরাম-আয়েশ সুযোগ-সুবিধার প্রতি আমাদের মনোযোগের ত্রুটি দেখলে সে বিষয়ে আপনি অভিমান করেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরো বেশি লক্ষ্য রাখার জন্য সতর্ক করেছেন। আপনি আজ চলে গেছেন না ফেরার দেশে। আম্মার মাঝেই আমরা আপনার অশরীরি উপস্থিতি অনুভব করার চেষ্টা করি। আমরা যেমন আপনার জন্য জান্নাতের উচ্চ মাকাম কামনা করি তেমনি আমাদের প্রতি আপনার রূহানী তাওয়াজ্জুহও কামনা করি, যেন আমরা আপনার আমানত আমাদের আম্মার প্রশান্তি মুহতারামা আম্মাজানের সর্বাত্মক খেদমত করতে পারি। তার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। আমীন।

আব্বা!

আপনি আমাদের কাছে দ্বিতীয় যে আমানতটি রেখে গেছেন সেটি হলো, কর্ম জীবনের অনুপম আদর্শ। আপনি যাপন করে গেছে সুবিস্তৃত পরিসরের এক কর্মবহুল জীবন। তবে আপনার গোটা জীবন ও এর কর্ম পরিধি উৎসর্গিত ছিল আল্লাহর তরে, আল্লাহর দ্বীনের বহুমুখী খেদমতের তরে।

> *মৌলিকভাবে আপনি দ্বীনের চারটি ক্ষেত্রের খেদমতে নিজেকে ব্যপ্ত রেখেছেন। ১. দ্বীনের তালীম তথা শিক্ষকতা, ২. তাসনীফ তথা লেখালেখি, ৩. দাওয়াত তথা ওয়াজ-নসীহত, ৪. সিয়াসাত ও জিহাদ তথা আন্দোলন ও সংগ্রাম।*

উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার অবদান অসামান্য। সমকালীন ইতিহাসে নজিরবিহীন আপনার খেদমত। তালীমের ক্ষেত্রে আপনার সময়ে আপনার সমকক্ষতা পাওয়া কঠিন। আপনার দরসে বুখারীতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা হাদীস অধ্যাপনায় আপনার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী। তালীমের মত তাসনীফের ময়দানেও আপনার অবদান যুগান্তকারী। পবিত্র বুখারী শরীফের প্রথম বাংলা ভাষ্যকার আপনার চিরায়ত গৌরবজনক উপাধি। আপনার কৃত বাংলা বুখারী, হাদীসের ছয় কিতাব এবং বাংলা মছনবী শরীফ বাংলা ভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বোদ্ধা পাঠক মহলে আপনার এ সকল অমর রচনাবলীর পাঠকপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। বাংলা ও উর্দূ ভাষায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা ও বুখারী শরীফের উপর আপনার অসাধারণ অধ্যাপনার সুবাদেই আপনার গুরুজনরা আপনাকে শাইখুল হাদীস উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ ভূষণে আপনি এতটাই মানিয়ে গেছেন যে, আল্লামা আজিজুল হক ও শাইখুল হাদীস বাংলায় সমার্থক শব্দে পরিণত। রাব্বে কারীমের দরবারে মকবুলিয়াতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এটি।

আপনার ওয়াজ- নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াত ও ইরশাদের ময়দানেও সূচিত হয়েছে এক অনবদ্য ইতিহাস। আপনার বয়ানের যাদুময়তায় তন্ময় হয়ে থাকত হাজারো শ্রোতা। পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকার পথ ছেড়ে আলোর পথের পথিক হয়েছে আপনার বয়ান শুনে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আলেম-ওলামা ও ছাত্র- তালাবাগণ আপনার বয়ান থেকেও ইলমের পিপাসা নিবারণের সুযোগ পেতেন। সাধারণ শিক্ষিত মহল ও সুধী সমাজ আপনার বয়ান থেকে লাভ করতেন ইসলামী সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক জটিল জিজ্ঞাসার অনুপম জবাব। এভাবেই কয়েক যুগ অবধি আপনি বাংলাদেশের ইসলামী আকাশে দেদীপ্যমান এক তারকার মত পথহারা উম্মতের পথনির্দেশের সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

আব্বা!

তালীম, তাসনীফ ও দাওয়াতের সাথে সাথে সিয়াসাত তথা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানেও আপনি রেখে গেছেন কালজয়ী অবদান। আপনার সিয়াসাত তথা রাজনীতি ও আপনার আন্দোলন আদৌ ক্ষমতা কেন্দ্রিক ছিল না। আপনার রাজনীতি আর আন্দোলন ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদী চেতনায় উদ্দীপিত।

اينقص الدين وانا حى

তথা আমি বেঁচে থাকতে ইসলামের উপর আঘাত আসবে?

এই মর্মবাণীর সিদ্দীকী জযবায় অনুপ্রাণিত হয়েই আপনি এই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহর রাহে শাহাদাতের তামান্নাই ছিলো আপনার সাহসী সংগ্রামী ভূমিকার নিগূঢ় রহস্য। আপনি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বলেই বাতিলের সাথে আপোষ কিংবা মাথা নোয়ানোর মত অন্ধকার পথে আপনাকে হাটতে হয়নি। বীরের মত শির উঁচিয়ে জালিমের জিন্দানখানায় বন্দী হয়েছেন বার বার। আবার উন্নত শিরেই আমামা বেঁধে 'আল্লাহু আকবার', 'দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ' এর মুষ্ঠিবদ্ধ শ্লোগান তুলে জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন প্রতিবার। জালিমের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করেননি আপনি কোন দিন। আর তাই খোদাদ্রোহী শক্তিই পরোয়া করে চলেছে আপনার।

ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দুই যুগ অবধি জাতিকে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল অন্যায়-জুলুম ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে

সোচ্চার থেকেছেন, প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

পর্দার অন্তরালের রাজনীতি আপনি করেননি। রাজনীতির বহুল প্রচলিত আলো-আঁধারির খেল আপনি খেলেননি। আপনি যা বুঝেছেন তাই বলেছেন, আর যা বলেছেন তাই করেছেন। আপনার এই নিষ্কলুষ আপোষহীনতার কারণেই আপনার রাজনৈতিক নেতৃত্বের আমলে প্রতিটি সরকার আপনার প্রতি রুষ্ঠ হয়েছে। আপনাকে ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে প্রতিবার আপনি কারাবরণ করেছেন। ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনার ত্যাগ-কুরবানী ও জেল-জুলুম সহ্য করার ইতিহাস আজ আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ ও অনন্য পাথেয় হয়ে আছে।

আব্বা!

আল্লাহর দ্বীনের বহুমুখী এমন অনন্য খেদমত আপনার দ্বারা আঞ্জাম পেয়েছে। আল্লাহ তাআলাই নিয়েছেন আপনার দ্বারা এ সকল খেদমত। তবে এ সকল খেদমতের জন্য আল্লাহ তাআলা আপনার মাঝে সমাহার ঘটিয়েছিলেন অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্যাবলীর যা আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু নিতান্তই জন্মগত আর কিছু সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত। আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো–

১. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত।

২. ইশকে রাসূল তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসাধারণ প্রেম ও ভালবাসা।

৩. আমিত্ব-অহংকার মুক্ত অসাধারণ বিনয় ও হুব্বে জাহ তথা পদ ও সম্মানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ ও নির্লোভ চরিত্র। এক কথায় অতি উচ্চ পর্যায়ের আত্মিক পরিশুদ্ধি।

৪. ইলমী যওক এবং কুরআন-হাদীসের উপর অসাধারণ ও গভীর ইলম।

৫. অসাধারণ বাগ্মিতা।

৬. আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অসামান্য দরদ।

৭. বুক ভরা হিম্মত, দৃঢ়চেতা জেহাদী মনোভাব, জযবা ও শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

১. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত : আপনার কার্যক্রমে স্বার্থপরতা, জাগতিক অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিল ও ধান্ধাবাজীর কোন লেশ পাওয়া যায়নি কখনো। অনেক বড় বড় স্বার্থের সুযোগকে আপনি দু' পায়ে দলেছেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন সফলতা লাভই ছিল আপনার সকল কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য।

২. ইশকে রাসূল : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপনার ভালবাসা ও প্রেম ছিলো ইশকের পর্যায়ে। নিঃসন্দেহে আপনি ছিলেন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশেকে নবী।

৩. নিরহঙ্কার ও নির্লোভ চরিত্র আপনার মধ্যে আমিত্ব-অহঙ্কারমুক্ত অসাধারণ বিনয় এবং পদ ও সম্মানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ ও নির্লোভ মহৎ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। মান-মর্যাদা ও গৌরবের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হওয়ার পরও আপনি বরাবর থেকেছেন নিরহঙ্কার ও বিনয়ী। সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও আপনার মাঝে আনন্দ বা উল্লাসের ছিটেফোটা লক্ষ্য করা যায়নি। আবার কোন পদ ছুটে যাওয়া বা পদচ্যুতির সামান্য হতাশাও কোনদিন আপনাকে গ্রাস করতে দেখা যায়নি। দুনিয়াবী সম্মান ও পদবী থাকা না থাকা আপনার নিকট সমান বলেই অভিহিত ছিল। আর তাই পদবীর আগমনে আপনি যেমন আনন্দে উল্লসিত হননি, পদবীর প্রস্থানেও ক্ষোভে কাতর হননি। আত্মিক পরিশুদ্ধি তথা ইসলাহে নফসের অতি উচ্চ মর্যাদায় আপনার অবস্থান ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

৪. দ্বীনী ইলমের অনুরাগ ও পারদর্শিতা : কুরআন-হাদীসের ইলমের প্রতি আপনার ছিল অসামান্য ভালোবাসা ও অনুরাগ। সেই অনুপাতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুও আপনাকে দান করেছিলেন ইলমে দ্বীনের উপর গভীর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা। আপনার সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কুরআন-সুন্নাহর সঠিক আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ও ইলমের স্পষ্ট প্রভাব প্রতীয়মান ছিল। আপনার রাজনীতি চর্চায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

৫. অসাধারণ উপস্থাপনা : কি লেখায়, কি বক্তব্যে, কি ক্লাসে সর্বক্ষেত্রে সবার বোধগম্য উপস্থাপনা ছিল আপনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। আপনার সকল কর্ম ময়দানের সাফল্যের ক্ষেত্রে এটিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

৬. দ্বীনের দরদ : আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আপনার ছিল বুকভরা দরদ। দ্বীনের কোন ক্ষতি বা দ্বীনের উপর আঘাত দেখলে আপনি অস্থির হয়ে যেতেন। মনে

হত দ্বীনের উপর আঘাতের ফলে আপনিই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ আপনার ঘুমকে হারাম করে দিত। বাবরী মসজিদের উপর উগ্র হিন্দুদের প্রতিটি আক্রমণ যেন আপনার উপর আঘাত হেনেছিল। শিখা চিরন্তনের শিরকী আগুন যেন আপনার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। আর তাই দেখা যেতো বুক ভরা দরদ নিয়ে আপনি ইসলামের হেফাজতে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন।

৭. হিম্মত ও দৃঢ়চেতা মনোভাব : আপনার বুকে ছিল প্রচণ্ড হিম্মত, মনে ছিল পাহাড়ের মত অটল ও দৃঢ়চেতা মনোভাব। জিহাদের জযবায় উদ্বেলিত ছিল আপনার হৃদয়। সর্বোপরি শাহাদতের তামান্না নিয়ে আপনি অবতীর্ণ ছিলেন সংগ্রামের উত্তাল ময়দানে।

আব্বা!

আমি আপনার ঔরসজাত তেরটি সন্তানের একজন। আপনার হাজারো ছাত্রের ভিড়ে নগণ্য এক ছাত্র। আপনার নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী লক্ষ্য কর্মীর মধ্যে সাধারণ এক কর্মী। আপনার রচনাবলীর কোটি পাঠকের মধ্যে একজন পাঠক। আপনার বয়ানের অগণিত শ্রোতার কাতারে একজন শ্রোতা। আর সর্বোপরি একটি উল্লেখযোগ্য সময় অত্যন্ত কাছ থেকে আপনাকে পর্যবেক্ষণকারী আপনার গুণমুগ্ধ একজন ভক্ত। আপনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১. শিক্ষকতা, ২. লেখালেখি, ৩. বয়ান-বক্তৃতা, ৪. ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং ৫. ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন যাপনকারী আপনার একজন শিষ্য। এ সকল সুবাদে আপনাকে উপলব্ধি করার এমন অনেক সুযোগ আমার জীবনে এসেছে যা হয়ত অনেকের বা কোন কোন ক্ষেত্রে কারো জীবনেই আসেনি। নিজের অযোগ্যতার কারণে নিঃসন্দেহে আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এরপরও যতটুকু পেরেছি সেই আলোকেই আপনার জীবন ও অবদান সম্পর্কে মৌলিক কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আপনার বৈশিষ্ট্যাবলী, গুণাবলী আর আপনার কর্ম ও অবদান বিষয়ক আলোচনা সে তো এক বিশাল পরিসরের বিষয়।

আমি আজ জালিমের বন্দীখানায় বসে আত্মার সান্ত্বনা আর বুকে হিম্মত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার পুণ্যময় জীবনের কিছু স্মৃতিকথা আপনার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করছি। জেল জীবনের দুঃসহ অবসর সময়ে আপনাকে নিবেদন করা আপনার এই স্মৃতিগুলো আমার ভগ্ন হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার করছে। হতাশা

ও মনোকষ্টের দুঃস্বপ্নময় এই সময়গুলোতেও দ্বীন কায়েম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে দ্বিধাহীন অভিযাত্রার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আপনিই তো আমার জীবনের আইডল। আপনিই আমার জীবনের সান্ত্বনা। আমার জীবনের প্রেরণা।

আব্বা!

আমি আজ কারাবন্দী। এমন এক সময় আমি কারাবন্দী যখন আমি আমার শক্তি ও সামর্থ্যের উত্থানের সময় অতিক্রম করছি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত নাকি মানুষের উত্থান পর্ব। শারীরিক, মানসিক সব দিক দিয়ে উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে এই বয়স পর্যন্ত। এরপর পর্যায়ক্রমে শুরু হয় অবনতির ধারা। সেই হিসাবে আমি এখন উন্নতি ও উত্থানের চূড়ান্ত শিখরে। শারীরিক-মানসিক কোন অসুস্থতা ও দুর্বলতাও এই মুহূর্তে আমার নেই। আলহামদুলিল্লাহ! শক্তি-সামর্থ্যের চূড়ান্ত উন্নতির এই পর্বে ৩৫ দিনের কারাবাসে আজ আমি অনুভব করার চেষ্টা করছি, আপনি আপনার পড়ন্ত বয়সে পর পর তিনবার কারাভোগ করেছেন। আপনার উপর দিয়ে কী ঝড় তখন বয়ে গেছে। কিন্তু কোনদিন কোন হা-হুতাশ বা দুর্বলতা-ভীরুতার প্রকাশ আপনার দ্বারা ঘটেছে এমন নজির নেই। যা আমাদের মত টগবগে তরুণদের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। আপনার সর্বশেষ কারাভোগের সময় আজ থেকে বারো বছর আগের। অশীতিপর বয়োবৃদ্ধ জাতীয় নেতা বিশ্ববিখ্যাত একজন হাদীস বিশারদ শাইখুল হাদীসকে পুলিশ কন্সটেবল বাদশাহ মিয়া হত্যার অপরাধসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে আটক করে দীর্ঘ চার মাস কারাগারে বন্দী করে রাখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। অবশেষে তাদের ক্ষমতার শেষ প্রান্তে হাইকোর্ট জামিন দেয়ায় আপনি মুক্তি লাভ করেন। আটক করার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আপনার সাথে কী অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তা কোন দিন আপনার মুখে শুনিনি। নীরবে সয়ে যাওয়া অব্যক্ত বেদনাগুলো আপনি আপনার বুকেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি যেদিন খুলনায় ষোল দিন আর ঢাকায় চারদিন জেল খেটে কাশিমপুর– ৪ হাই সিকিউরিটি কারাগারে আসলাম। সেটা ৩১ মে ১৩ শুক্রবার দিবাগত রাতের কথা। পরদিন শনিবার সকালে জেলার ফাইল হয়ে নরসুন্দর ঘর 'দর্পণ'-এ আসলাম, সেখানে একজন কয়েদী তোজাম্মেল যার নাম। টাঙ্গাইল জেলার সেই তোজাম্মেল-এর সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম হচ্ছে নরসুন্দর (নাপিত)-এর কাজ করা। এক কথায় দুই কথায় তার সাথে পরিচয় ও আপনার সাথে আমার সম্পর্কের বিষয়ে কথা হলে সে বারো বছর আগের দুঃসহ এক স্মৃতির কথা আমাকে শোনালো।

যে দিন প্রথম আপনাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো, সে দিন এই তোজাম্মেল সেখানে ছিল এবং আপনাকে যেই ওয়ার্ডে দেয়া হয়েছিল সে সেখানেই আপনার সাথে ছিল। সে আমার পরিচয় পেয়ে দুঃখ করে বলল– 'বুড়ো মানুষটাকে একটা কম্বল দিয়ে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল। লোকটা হাটতে চলতে পারে না। এমন বুড়ো একজন মানুষ জেলখানার ১টি কম্বল আর জেলের অরুচিকর খাবার খেয়েই তাকে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল।' তার সামাজিক মর্যাদা, তার ধর্মীয় গুরুত্ব, তার বয়োবৃদ্ধতা কোন কিছুই আওয়ামী পাষাণদের হৃদয়ে রেখাপাত করতে পারেনি।

তোজাম্মেল বলল, তখন আমি ও অন্য সাথীরা হুযুরকে একটু সহযোগিতা করলাম। তোজাম্মেল আরো জানালো, হুযুর আমাকে বেশ আদর করতেন। আমি সেখানে হুযুরের চুল কেটে দিয়েছিলাম। পরে অবশ্য আদালত হুযুরকে ডিভিশন দেয়ার নির্দেশ দিলে হুযুর এরশাদ সেলে (যেখানে এক সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব ছিলেন। তাই ওই সেলের নাম হয়ে গিয়েছে এরশাদ সেল) চলে গেলেন। তোজাম্মেলের এই ধরনের সামান্য কিছু বিবরণ থেকে আমার অনুমান করতে সমস্যা হয়নি যে, কতটা কষ্ট তখন আপনাকে দেয়া হয়েছে। এখানেই আওয়ামী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যার উপর আওয়ামীলীগ ক্ষীপ্ত হয় তাকে সম্ভাব্য সব রকম কষ্ট দিতে সাধারণত তারা কোন ত্রুটি করে না।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি আওয়ামী লীগ–বিএনপি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কথার যথার্থতা থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই এই দুই দলের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।

আব্বা আপনি বিএনপির আমলেও জেল খেটেছেন, আওয়ামী লীগের আমলেও জেল খেটেছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিতব্য সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আসতে দিবেন না বলে আপনি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার আগমনের দিনে বিমানবন্দর ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছিলেন। বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের ঘোষণা ছাড়া বাংলাদেশের মাটিতে নরসিমা রাওকে পা রাখতে দেয়া হবে না– এই ছিল আপনার দৃঢ় প্রত্যয়। নতজানু বিএনপি সরকার আপনাকে গ্রেফতার করে সাক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান করার সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে আলেম- ওলামাদের প্রতি তাদের তেমন হিংস্রতা চোখে পড়েনি।

কিন্তু আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিচ সর্বস্তরের মানসিকতাটাই অনেকটা এমন যে, হুযুররা আবার এত কথা বলে কেন? এরা অনেক বেড়ে গেছে, এদেরকে শায়েস্তা করতে হবে!

২০০১ সালে মোহাম্মদপুর মোহাম্মদী হাউজিংয়ের নুর মসজিদ থেকে আপনাকে যখন স্থানীয় কিছু ইসলামপ্রিয় মানুষের সহযোগিতায় রিক্সাযোগে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল সেই সময়ের স্মৃতি মনে পড়লে আজো শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। গা শিউরে ওঠে সেই হিংস্রতার কথা মনে পড়লে। পুলিশ আপনাকে চিনতে না পেরে নিরাপদে চলে যেতে একটি রিক্সায় তুলে দেয়। স্থানীয় আওয়ামী গুণ্ডারা আপনাকে চিনতে পেরে হায়েনার মতো আপনার উপর হামলে পড়ে। আপনার মতো নূরানী চেহারার অশীতিপর বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীনের মুখের উপর চড়-কিল-ঘুষি মেরেছিল স্থানীয় আওয়ামী গুণ্ডারা। আপনাকে তাদের এই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় শোয়েব চৌধুরী নামক এক নিরপেক্ষ ভদ্রলোক। শুধু এই অপরাধে ঐ বেচারাকে মারাত্মকভাবে যখম করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ফলে দীর্ঘ দিন তাকে জেল খাটতে হয়।

বিএনপির মধ্যে সুবিধাবাদী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। তারা ইসলামপন্থীদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় শুধু নিজেদের রাজনীতির সুবিধার্থে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রে ও রাজনীতিতে ইসলামের ন্যুনতম সম্পর্ক, আলেম-ওলামাদের তাতে অংশগ্রহণ ভালো চোখে দেখে না। এইজন্য ইসলামপন্থীদের সাথে তাদের আগাগোড়াই বিরোধ। বিএনপি আর আওয়ামী লীগের মধ্যে আমাদের অবস্থান থেকে ব্যবধান বুঝতে চাইলে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, বিএনপি নিজেদের সুবিধা আদায়ে আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায় আর আওয়ামী লীগ নিজেদের রাজনীতির সুবিধার্থে আমাদের শক্তিকে, আমাদের মাথা উচু করে বেঁচে থাকাকে দমন করতে চায়। ব্যবহার করা আর দমন করা উভয়টিই নিন্দনীয় তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু উভয়টিকে এক সমান পরিমাপ করার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে বিএনপি'র কিছু মানুষের চেয়ে আওয়ামী লীগের কিছু মানুষ ভালোও হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় বিএনপি ও

আওয়ামী মানসিকতা ও চরিত্রের বিচার করতে গেলে আওয়ামী লীগকে বহুগুণ বেশি ভয়ঙ্কর পাওয়া যাবে।

আব্বা!

আপনিও বিষয়টিকে এভাবেই বিবেচনা করতেন। আমি নিজেই তার সাক্ষী। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর জোটের একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে একটি প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে– হুযুর! ক্ষমতায় গিয়ে আপনারা কী পেলেন? আমি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই, আমরা চারদলের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করি না। আমরা যা পেয়েছি তাহলো নিরাপদ পরিবেশ। আওয়ামী লীগ সরকার যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তারা যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারত তাহলে আমাদের আলেম-ওলামাদেরকে সমাজে চলাফেরাও করতে দিত না, আমাকে তো তারা হত্যা মামলার আসামী করেছিল।'

এমনই ছিল আপনার অনুভূতি। আপনি নিজে আওয়ামী জিঘাংসার শিকার হয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এমন চিন্তায় উপনীত ছিলেন। আমি আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, বিএনপি স্বার্থ হাসিল করতে চায় আমাদের ব্যবহার করে আর আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে চায় আমাদেরকে নির্মূল করে।

আওয়ামী চিন্তার লোকেরা আমাদের এই কথার প্রতিউত্তরে বলে থাকে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে নাকি ইসলাম থাকবে না, কোথায়? সবই তো ঠিক আছে। মসজিদ আছে, মাদরাসা আছে, তাবলীগ জামাত আছে, খানকা আছে, পীর-মুরিদী আছে, ইসলাম তো আছেই। হুযুররা অযথাই আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে। যারা একথা বলেন তাদের বুঝে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার কুফুরী মতবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ইয়াতীমখানা, মসজিদ, মিলাদ মাহফিল, দোয়া মাহফিল, খানকা, ইজতিমা এই সকল ইসলামকে বাধা দেয় না কিন্তু ইসলামের সামান্যতম গৌরব, ইসলামী রাজনীতির উত্থান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বরদাশত করতে পারে না।

আওয়ামী লীগ তার এই চরিত্রে কতটা ভয়ঙ্কর সাম্প্রতিক হেফাজতে ইসলামের সাথে কৃত আওয়ামী আচরণের মাধ্যমে সেটা আরেকবার অতি উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আব্বা!

আমি হেফাজতে ইসলামের তৎপরতার সাথে বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে ছিলাম। আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য শাহবাগী নাস্তিক-মুরতাদদেরকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রটেকশন দিয়ে একটি আন্দোলন দাড় করালো। বারডেম ও পিজি হাসপাতালে যাতায়াতের পথে নজিরবিহীন বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে ব্লগারচক্রকে বসিয়ে অবস্থান কর্মসূচি চালালো। কুখ্যাত ব্লগার মুরতাদ রাজিব ওরফে থাবা বাবা নিহত হওয়ার পর শেখ হাসিনা পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগাররা তার জানাযার নামে ইসলামের সাথে নজিরবিহীন তামাশা করল। প্রধানমন্ত্রী নিজে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রথম শহীদ বলে আখ্যায়িত করলেন। এরপরই কোন কোন জাতীয় প্রচার মাধ্যমে রাজিবসহ শাহবাগী আরো কিছু ব্লগারের আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বহু বক্তব্য প্রকাশ হয়। যুবক-যুবতীদের অবাধে রাত-দিন আলো-আধারে এক সাথে অবস্থান এবং সেই অবস্থানের কর্মসূচি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ও চিহ্নিত মিডিয়ার তা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে ব্লগার চক্রের এই সকল কুরুচিপূর্ণ ইসলাম বিরোধী বক্তব্যগুলো প্রচার পাওয়ার পর। বিশেষ করে জনাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে তাদের ব্লগে পোষ্ট করা কথাগুলো ঈমানদার নবীর উম্মতদের হৃদয়ে ক্ষোভ ও যন্ত্রণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রজ্বলিত সে আগুনে ফুঁসতে থাকে বাংলাদেশ। ১৭ ফেব্রুয়ারি '১৩ দৈনিক ইনকিলাবে ও পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ব্লগে লেখা কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যগুলো ব্যাপকভাবে জনসম্মুখে প্রকাশ হলে ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয় বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারী জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে দেশব্যাপী বিক্ষোভ। ওই সময়ে বাংলাদেশের তাওহীদী জনতা একজন শাইখুল হাদীস বা একজন মুফতী আমিনীর শূন্যতা অনুভব করতে থাকে তীব্রভাবে।

একদিকে রাত-দিন মঞ্চে, মঞ্চের নিচে, পার্কে অশ্লীল যুবক-যুবতীদের গণজাগরণ মঞ্চে চলতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবির নামে আবহমান কাল থেকে চলে আসা সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতা ভূলুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র।

সেই সাথে চলতে থাকে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের সুদূরপ্রসারী পায়তারা আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল তথা গোটা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য কটুক্তির সয়লাব।

এহেন পরিস্থিতিতে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন এবং ঐক্যবদ্ধ কোন প্লাটফর্মে এক সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায় নিয়ে মতবিনিময় করতে থাকেন। অবশেষে নানা জল্পনা-কল্পনার পর বর্তমান বাংলাদেশের ইসলামী মহলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাটহাজারীর হযরত মুহতামিম আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে 'হেফাজতে ইসলাম' এর ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ঈমানী এ জাগরণকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিগত চার দশকের সবচেয়ে স্বতস্ফূর্ত ও বৃহৎ জাগরণ বলা যায়। নাস্তিক-মুরতাদ চক্র মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, নারী-পুরুষের প্রশ্নবিদ্ধ অশ্লীল সহ-অবস্থানের কর্মসূচি ও সর্বশেষ ইসলামের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কটুক্তির মাধ্যমে অপবিত্রতার যে গ্লানিতে বাংলাদেশকে কলুষিত করে দিয়েছিল হেফাজতে ইসলামের জাগরণ, উত্থান ও জনস্রোত বাংলার মাটিকে সেই অপবিত্র গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে। মার্চ ও এপ্রিল জুড়ে বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে তাওহীদী জনতার মহা উত্থান ঘটে। চলতে থাকে অবিস্মরণীয় গণজাগরণ। ৬ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের লংমার্চ ও লংমার্চ পরবর্তী শাপলা চত্বরের মহা সমাবেশে ছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ জনসমাগম। সেই ধারাবাহিকতায় ৫ মে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতেও বাধভাঙ্গা মানুষের জোয়ার নামে ঢাকার প্রবেশ পথগুলোতে। এরপর অবরোধ কর্মসূচি শেষ করে দুপুর নাগাদ যখন মতিঝিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে অবরোধকারী ঈমানদার হেফাজত কর্মীরা, তখন তো মনে হয়েছিল যেন ছয় দিক থেকে জনতার মহাপ্লাবন ধেয়ে আসছে শাপলা চত্বরের মোহনার পাণে। বুকে ঈমানের তেজ, মুখে কালিমার রব, হাতে কালিমা খচিত ও লাল সবুজের জাতীয় পতাকা। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত শুভ্র-সফেদ টুপি পরিহিত মানুষের অনিঃশেষ মিছিল। শান্ত নদীর মতো বয়ে চলছিল জনতার এই স্রোত। সেই শান্ত মানুষগুলোর উপর পুলিশের ছত্রছায়ায় সরকার দলীয় ক্যাডার বাহিনী সশস্ত্র হামলা চালালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত বয়ে চলা টলটলে স্বচ্ছ পানির নদীতে হঠাৎ পানি ঘোলা করার মতো করেই তারা ঘোলা করল পানি। আর তারপর ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করল অশুভ রাজনীতির ঝানু খেলোয়াড় দল। পূর্ব পরিকল্পনার আলোকেই শুরু হলো যুদ্ধ। নিরস্ত্র মানুষের সাথে সশস্ত্র মানুষের যুদ্ধ। শত প্রাণ কেড়ে নিয়ে সশস্ত্র দল হটিয়ে দিল রাতের ভুতুড়ে

অন্ধকারে আশ্রয় নেয়া অবস্থায় ঈমানদার মানুষগুলোকে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্বরতম হামলা চালিয়ে সর্বাধিক নরহত্যার নারকীয় ঘটনা জন্ম দিল আওয়ামী লীগ।

৫ মে দিবাগত রাতের অন্ধকারে চালানো গণহত্যা ও বর্বরতার কী জবাব ইতিহাসের কাছে দেবে আওয়ামী লীগ? রাসূল প্রেমিকদের শাহাদাতের পবিত্র খুনে রঞ্জিত হলো যে খুনীর হাত সেই খুনী কীভাবে মুক্তি পাবে এই অভিশাপের জিঞ্জির থেকে? হায় আওয়ামী লীগ! নিজের গলায় নিজেই ঝুলিয়ে নিলে পাষণ্ডতার অভিশপ্ত কালো পৈতা!!

> *শাপলা চত্বরের মর্মান্তিক ট্রাজেডি বিষয়ে আরো অনেক বিশ্লেষণ থাকতে পারে। থাকতে পারে অনেক প্রশ্ন। সে প্রশ্ন হতে পারে বিএনপি বা জামাত- শিবিরসহ বিরোধী জোটের উপর। এমনকি প্রশ্ন উঠতে পারে খোদ হেফাজত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা নিয়ে। অবস্থান কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিয়েও উত্থাপিত হতে পারে কোন প্রশ্ন। সবগুলো প্রশ্ন যদি বিনা বাক্যে মেনেও নেয়া হয় তবুও এ প্রশ্নগুলোর পিঠে আরো কিছু প্রশ্ন থেকে যাবে যেগুলোর সদুত্তর এমন কোন সাচ্চা আওয়ামীলীগারও দিতে পাবে না বিবেক নামক বস্তুটির সামান্য উপস্থিতিও যার মধ্যে আছে। চূড়ান্তভাবে অন্ধ ও বিবেকহীন হলে সেটা ভিন্ন কথা।*

প্রশ্নগুলো হলো–

এক. হেফাজত সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছে, বিএনপি'র ইন্ধনে হেফাজত অবস্থানে বসেছে। সকাল পর্যন্ত বা পর দিন পর্যন্ত হেফাজতকে থাকতে দিলে আঠারো দল আর হেফাজত মিলে সরকারের পতন ঘটিয়ে ছাড়ত ইত্যাদি শঙ্কা বা সম্ভাবনাগুলোকে মেনে নিয়েও যদি প্রশ্ন করা হয়, তাই বলে কি এভাবে নির্বিচারে পাখির মত গুলি করে এত মানুষ হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে?

দুই. এমন একটি ক্র্যাকডাউন তথা গণহত্যা চালানোর আগে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? হেফাজতের শীর্ষনেতা আল্লামা আহমদ শফী তো লালবাগেই ছিলেন। তিনিসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণ আলোচনা করা, অনুরোধ করা বা ন্যুনতম কিছু দাবি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে আল্লামা আহমদ শফীকে দিয়েই অবস্থান প্রত্যাহারের ঘোষণা আদায় করতে পারতেন। তেমন কোন যৌক্তিক উদ্যোগ কি নেয়া হয়েছিল?

তিন. **লাখো মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপর রাতের গভীরে এমন বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানোর কোন নজির সমকালীন ইতিহাসে দেখানো যাবে?**

হত্যাযজ্ঞের বৈধতা প্রমাণের জন্য দিনব্যাপী গুলিস্তান, পল্টন, বিজয়নগর ও দৈনিক বাংলায় পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিষয় ও পবিত্র কুরআনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে নজিরবিহীন ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সম্পূর্ণ দায়ভার সরকারীভাবে হেফাজতে ইসলামের উপর চাপানো হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের উপরই যদি সকল দায় চাপবে তাহলে সকল জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত লীগ ক্যাডারদের অস্ত্র উচিয়ে এ্যাকশনে যাওয়ার ব্যাখ্যা কী? পবিত্র কুরআনে যদি হেফাজত কর্মীরাই আগুন দিবে তাহলে তার সচিত্র কোন প্রমাণ নেই কেন? আর কিছুক্ষণের জন্য যদি তর্কের খাতিরে হেফাজতের দায়ভার মেনেও নেই তাহলে প্রশ্ন হলো এর চেয়েও বহুগুণ বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর নজির আওয়ামী লীগ-বিএনপির ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

হেফাজতের কর্মসূচিকে পুঁজি করে শিবির একটা মহা পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিল মর্মে প্রচারণা আছে। জামাত-শিবিরের এই ধরনের তৎপরতা আপন জায়গায় নিন্দনীয় ও সমালোচিত হলেও শাপলা চত্বরে সরকারের পরিচালিত বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞের বৈধতার জন্য তা ন্যূনতম যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। আসলে ব্যাপার হলো, আলেম-ওলামা ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো একটি চিহ্নিত ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর চোখের শূল। তাদের কাছে এরা একেবারেই সহ্য হয় না। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই চিহ্নিত গোষ্ঠীটি বরাবরই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রক।

এই সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে একটা চিত্র সামনে আনাই উদ্দেশ্য, আর সেটা হলো ইসলামী জাগরণ, ইসলামী আন্দোলন, রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ইসলামের সংশ্লিষ্টতা আওয়ামী লীগের গাত্রদাহের কারণ। সেই সাথে এটাও দেখানো উদ্দেশ্য যে, আওয়ামী লীগ আলেম-ওলামাদেরকে কতটা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। এই আলোচনা শুধু আওয়ামী লীগের সমালোচনার জন্যই নয় বরং তাদের অনুশোচনা ও সংশোধনের জন্য নিবেদিত।

আব্বা!

আওয়ামী দুঃশাসনের জিন্দানখানায় বন্দী অবস্থায় আমার মনের অনুভূতিগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য আপনাকে সম্বোধন করে তা বলছি। আপনার শেষ জীবনে আপনার নেতৃত্বাধীন দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাথে এই আওয়ামী লীগেরই একটি নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছিল যেটা পাঁচ দফা

আদর্শিক চুক্তির ভিত্তিতে হয়েছিল। এই চুক্তির সময় আপনি বাংলাদেশের ধর্মীয় ও রাজনীতির ময়দানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি ছিলেন। আওয়ামী লীগ যদিও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাথে চুক্তি করেছিল কিন্তু খেলাফত মজলিস ছিল একটি ব্যানার আর মূল আকর্ষণ ও ফ্যাক্টর ছিল 'শাইখুল হাদীস'। আওয়ামীলীগ ২০০১-এর জাতীয় নির্বাচনে চরম ভরাডুবির কারণ হিসেবে ইসলামী ভোট তাদের বিপক্ষে যাওয়াকে চিহ্নিত করেছিল। আর এর অন্যতম কারণ হিসেবে আপনার উপর তাদের জুলুম-নির্যাতনকে তারা নির্ধারণ করতে পেরেছিল। সেই সূত্র থেকেই তারা ২০০৬-এ এসে তাদের জন্মের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আলেম-ওলামা ও ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে আপোষ করার মতো নমনীয় মানসিকতায় উপনীত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের সাথে খেলাফত মজলিসের এই চুক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটাই একমাত্র এমন ঘটনা যার বিরোধিতায় সকল ইসলামবিদ্বেষী বামপন্থী ও সিংহভাগ আলেমসমাজ একমত হয়ে গেছে। স্বাভাবিক হিসাব তো হলো ইসলামবিদ্বেষী বামপন্থী গোষ্ঠী তখনই ক্ষুব্ধ হয় যখন ইসলামের পক্ষে কোন কাজ হয় আর আলেমসমাজ তখনই ক্ষুব্ধ হন যখন ইসলামের স্বার্থবিরোধী কোন কিছু ঘটে। আমাদের জাতীয় রাজনীতির প্রয়াত কোন এক মুসলিম নেতা বলেছিলেন, "যখন দেখবা আমার কোন কাজে বিজাতীরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে তখন বুঝবা আমার দ্বারা মুসলমানদের পক্ষে ভালো কোন কাজ হয়েছে। আর যখন দেখবা বিজাতিরা আমার কাজের প্রশংসা করছে তখন বুঝবা আমার দ্বারা ইসলামের কোন ক্ষতি সাধন হয়েছে।" এই হিসাবে পাঁচ দফা আদর্শিক চুক্তি যদি ইসলামের স্বার্থের হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম বিদ্বেষীদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা স্বাভাবিক কারণেই। আলেম সমাজের নয়। আর যদি ইসলামের স্বার্থ বিরোধী হয় তাহলে আলেম সমাজের ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা আর ইসলাম বিদ্বেষীদের খুশি হওয়ার কথা। উভয় পক্ষের একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ হওয়া বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!

আব্বা!

এটা অবশ্যই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাঁচ দফা চুক্তির সময় আপনি বার্ধক্যের এমন অবস্থায় উপনীত ছিলেন যখন স্বেচ্ছায় নিজস্ব সিদ্ধান্তে সব কিছু নির্ধারণ করার সক্ষমতা আপনার ছিল না। নিকটজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপরই আপনাকে অনেকটা নির্ভর করতে হতো। সেই হিসাবে আওয়ামীলীগের

সাথে পাঁচ দফা আদর্শিক চুক্তির ভালো-মন্দের দায়ভার মূলত আপনার উপর বর্তায় না। বরং এটা বর্তায় খেলাফত মজলিসের তৎকালীন নীতি নির্ধারকদের উপর। ব্যক্তি শাইখুল হাদীসকে ভালোবাসেন কিন্তু তার রাজনৈতিক সংগঠনে কখনো সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না এই জাতীয় অনেকের ক্ষোভের আরেকটা কারণ এটাও যে, শাইখুল হাদীসের নাম ব্যবহার করে মজলিস নেতৃবৃন্দ আওয়ামীলীগের সাথে চুক্তি করেছে। এটা শাইখুল হাদীসের সিদ্ধান্ত নয়। অনেকে আবার এই একই কারণে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মুফতী শহিদুল ইসলাম সাহেবের উপর। কারণ আওয়ামী লীগের সাথে খেলাফত মজলিসের সেই চুক্তি সম্পাদনসহ সার্বিক লিঁয়াজো করার ক্ষেত্রে মুফতী শহিদ সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গোটা ব্যাপারটাই ইসলামী রাজনীতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সম্পর্কিত ইতিহাসের স্পর্শকাতর একটি অধ্যায়।

ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে আমার একটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আমি ঐ সময়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকার সুবাদে পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং থাকতে হয়েছিল। আমার অভিমত হচ্ছে, পাঁচ দফা আদর্শিক চুক্তির সময় যেহেতু আব্বাজান হযরত শাইখূল হাদীসস (রহ.) সম্পূর্ণ নিজস্ব এখতিয়ারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ছিলেন না, তাই মন্দের কোন দায়ভার তার উপর বর্তাবে না। ভালো কৃতিত্ব? সেটা তিনি এতটুকু পাবেন যে, মূলত তার ইমেজ ও ব্যক্তিত্বই ছিল আওয়ামী লীগের কাছে মূল আকর্ষণ। বাকী এমন একটি চুক্তি সম্পাদন, সেটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মজলিস নেতৃবৃন্দ বিশেষত মুফতী শহিদুল ইসলামের ভূমিকা এক্ষেত্রে পর্যালোচনা হতে হবে। সেই সময়ে চুক্তির ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে মজলিস নেতৃবৃন্দের মধ্যে কিছুটা ভিন্নমত থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগের সাথে পাঁচ দফা আদর্শিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সুতরাং পাঁচ দফা চুক্তি মন্দ হয়ে থাকলে দায়ভার এককভাবে মুফতী শহিদুল ইসলামের নয়, ভালো হয়ে থাকলেও কৃতিত্ব এককভাবে তার নয়, বরং গোটা সংগঠনের। তবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় দায় ও কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য অংশ মুফতী শহিদুল ইসলাম সাহেবের। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আওয়ামী লীগের সাথে পাঁচ দফা চুক্তির ভালো-মন্দ বিচার করে এর পক্ষ-বিপক্ষ যে কোন মতামত গ্রহণ করার স্বাধীনতা সচেতন প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

তবে আমার মত হলো, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যেই গুরুত্ব ও অবস্থান নিয়ে এবং যেই পাঁচটি দফাকে ভিত্তি করে আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ একটি সেক্যুলার রাজনৈতিক সংগঠনকে চুক্তিতে এনেছে তাতে মন্দের কিছু নেই বরং এটাকে এক ঐতিহাসিক অর্জন বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সুচিন্তিত ও সচেতনভাবেই আমি পাঁচ দফা চুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি।

প্রশ্ন হতে পারে, সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমিই প্রমাণ করেছি যে, আওয়ামী লীগ কতটা ইসলাম বিদ্বেষী ও আলেম-ওলামাদের প্রতি কতটা মারমুখী। এত কিছুর পরও কেন আমি সেই আওয়ামী লীগের সাথে চুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব রাখি?

আওয়ামী চরিত্র ও তাদের অব্যাহত ইসলাম বিরোধী অবস্থানের পরও যেই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সাথে খেলাফত মজলিসের পাঁচ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে ইতিবাচক মনোভাব রাখার যুক্তিগুলো নিম্নরূপ–

এক. বাংলাদেশের রাজনীতি বড় দুটি দল দুই শিবিরে বিভক্ত। পালাক্রমে তারা ক্ষমতায় যায়। ইসলামপন্থীরা নিজেদের মধ্যকার নানা দুর্বলতার কারণে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে তারা সব সময় রাজনীতিতে একটি ফ্যাক্টর হয়ে থাকে। আওয়ামী লীগ যখন নিজেই (ক্ষণিকের জন্য হলেও) ইসলামের স্বপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ দফা মানতে সম্মত হয়েছে এটা আওয়ামী লীগের নিজস্ব ইসলাম বিদ্বেষী অবস্থানটা দুর্বল হওয়ার স্পষ্ট আলামত। কাজেই তারা যদি আলেম-ওলামাদের দেয়া শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি করতে সম্মত হয় তাহলে এটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী শক্তি ও আলেম সমাজের শক্তিই বৃদ্ধির কারণ।

দুই. কারো সাথে সম্পর্ক রাখা হয় কখনো তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায়। আবার দুর্ধর্ষ ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির মানুষের সাথেও সম্পর্ক রাখা হয় কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় নয় বরং তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তালীফুল কুলুব' করতেন বিভিন্ন দুষ্ট ও সন্ত্রাসী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাথে। তাদেরকে সম্পদ দিতেন তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য। এই সূত্রে আওয়ামী লীগ যেহেতু আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতায় আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কিছুটা সহনীয় অবস্থানের স্বার্থে এমন চুক্তির বড় ভূমিকা থাকাটা স্বাভাবিক।

তিন. ইসলামপন্থীরা পক্ষে থাকলে সুফল লাভ হয় আর বিপক্ষে থাকলে ক্ষতি হয় বড় দুটি পক্ষের নিকটই এমন মেসেজ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই হিসাবেও এই চুক্তির যথার্থতা ছিল। তখনই বড় পক্ষগুলো ইসলামপন্থীদেরকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হবে। এভাবেই ইসলামের পক্ষে থাকার শর্তে সমর্থন দিয়ে ও ইসলামের বিপক্ষে গেলে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের শক্তির প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

চার. বড় দুটি পক্ষের একটি পক্ষ বিএনপির ধারণা ও আচরণ এমন যে, ইসলামপন্থীদের তো আশ্রয়ের আর কোন স্থান নেই। তাই তাদেরকে মূল্যায়ন করারও দরকার নেই। বিএনপির এই মনোভাবেরও পরিবর্তন দরকার।

উল্লেখিত যৌক্তিক কারণসহ আরো কিছু কারণে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে পাঁচ দফা আদর্শিক চুক্তিকে আমরা শুধু যৌক্তিক নয় বরং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী রাজনীতির একটি বিজয় হিসেবে অনুভব করি।

আব্বা!

আপনার হাত ধরেই ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আমার আগমন। আপনার সিকি শতাব্দীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগও আমার হয়েছে। সেই সুবাদে আজ আপনার তিরোধানের প্রায় বছর খানেক পর আমি কারাবন্দী অবস্থায় আপনার রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোকপাত করছি। আমি জানি আপনার জীবনের এ বিষয়গুলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হয়ে থাকবে। আপনার সন্তান হিসাবে, ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে ও ইতিহাসের একজন নির্মোহ বিশ্লেষক হিসাবে আমার অভিমত ও মূল্যায়নও ইতিহাসের পর্যালোচনায় আসতে পারে। এইজন্য পাঁচ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যাবহিত পরেই এ সংক্রান্ত একটি বিশ্লেষণ আমি করেছিলাম। সেই বিশ্লেষণ ও আজকের বিশ্লেষণ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। কারণ সেই বিশ্লেষণের সময় আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের চুক্তি বহাল ছিল এবং লিয়াজো অবশিষ্ট ছিল আর এখন বিশ্লেষণ করছি এমন এক সময় যখন আওয়ামী লীগের সাথে আমার বিরোধের সম্পর্ক, আওয়ামী লীগ পাঁচ দফা চুক্তিকে এক তরফাভাবে বাতিল করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমি নিজে যখন আওয়ামী লীগের জুলুমের শিকার হয়ে কারাভোগ করছি।

উপরোক্ত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের আচরণ কী হওয়া উচিত বা আওয়ামী লীগের

ব্যাপারে আমাদের মনোভাব কী? সে ব্যাপারেও কিছু বক্তব্য আসা দরকার। আমি আমার ব্যক্তিগত অনুভব থেকে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করছি।

> *স্বাভাবিকভাবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন একটি শক্তি যাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল ও আছে। ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় আসবে এমনটিই স্বাভাবিক। রাজনীতির পরস্পর বিরোধী পক্ষগুলো রাজনীতির স্বার্থে বিরোধে জড়ায় আবার তলে তলে নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্কও রাখে। তাই দেশের বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কোনটির সাথেই আমাদের ইসলামপন্থী আলেম- ওলামাদের চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত বিরোধ রাখা বিপদজনক। তাই রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করাকে আমি মোটেও দোষের কিছু মনে করি না।*

বরং আমি মনে করি দুটি কারণে এর প্রয়োজনও রয়েছে।

প্রথম কারণ হলো, আওয়ামী লীগের মধ্যেও একটি মহল যেমন চরম ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলামপন্থীদের প্রতি চূড়ান্ত বিরাগভাজন নাস্তিক-কমিউনিস্ট-বামপন্থী গোষ্ঠী আছে তেমনি ইসলামপন্থী ও আলেম-ওলামাদের প্রতি তুলনামূলক নমনীয় একটি গোষ্ঠীও আছে। ক্ষমতা ও প্রভাবের পালাবদলে একেক সময় একেক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের মতো বিশাল একটি শক্তিকে যতটুকু সম্ভব ইসলামপন্থীদের প্রতি নমনীয় রাখার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ আছে। তাই আওয়ামী লীগের মধ্যকার তুলনামূলক নমনীয় গোষ্ঠীর সহায়তায় আওয়ামী লীগকে নমনীয় রাখার চেষ্ট করা দরকার।

দ্বিতীয় কারণ হলো আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হয় তখন তাদের কাছ থেকে ইসলামের পক্ষের কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে যতটা সম্ভব বিরত রাখার চেষ্টাও করা দরকার।

> *উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের লক্ষ্যে সহীহ নিয়তে যদি কেউ বা কোন পক্ষ আওয়ামী লীগের সাথে লিয়াজো রাখে আমি সেটাকে সাধুবাদ জানাই। তবে মনে রাখতে হবে, এটি সমঝোতা বা লিয়াজোর ব্যাপার– দালালী নয়। কিছু মানুষ আছে যারা রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক শক্তিধরদের সাথে সম্পর্ক*

> *রাখে নিজেদের ধান্ধাবাজীর জন্য। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। এটা কোন সময় সুফল বয়ে আনে না। ইসলামের স্বার্থে পরামর্শমূলক, সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে যে কোন পক্ষের সাথেই সমঝোতা হলে সেটা ভালো উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। আর দালালী ও ধান্ধাবাজী কোন সময়ই এবং কোন পক্ষেরটাই কল্যাণকর নয়। একটা হলো ক্ষমতাসীনদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলামের স্বার্থ রক্ষা করা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নেয়া, তাদের কাছ থেকে নিজেদের দাবি-দাওয়াগুলো আদায় করা। আরেকটা হলো ক্ষমতাসীনদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করা। তাদের স্বার্থে ইসলামের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া। দ্বিতীয় পথটিই হলো দালালীর পথ।*

এটা অবশ্য লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, প্রচলিত রাজনীতিবিদদের সাথে সমঝোতা ও লিয়াজো করে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানোটা সহজ ব্যাপার নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্টো তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতেই দেখা যায়।

> *এই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে দুটি জিনিসের খুব প্রয়োজন হয়। একটি হলো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা আর দ্বিতীয়টি হলো ইখলাস ও তাকওয়া। ইখলাস ও তাকওয়া না থাকলে ধান্ধাবাজী ও দালালী হয় আর প্রজ্ঞা না থাকলে ব্যবহৃত হতে হয়। আল্লাহ যদি রক্ষা করেন, সেটা ভিন্ন কথা।*

হেফাজতে ইসলামের নামে জেগে ওঠা নবীপ্রেমিক ঈমানদারদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালালো আওয়ামী লীগ সরকার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এই ঘটনায় ব্যাপক নিন্দার ঝড় উঠলে আওয়ামী লীগ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নানা বিভ্রান্তি ও মিথ্যার আশ্রয় নিলো। কোন কোন আলেম ও ইসলামপন্থী নেতা আওয়ামী লীগের সাফাই গেয়ে বক্তব্য দিলেন যে, আমাদের জানা মতে বেশি নিহত হয় নাই। আমাদের বৃহত্তর এলাকায় মাত্র দুইজন নিহত হয়েছে। এই ধরনের বক্তব্য প্রদান মূলত স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষমতাসীনদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত আলোচনায় ইসলাম বিদ্বেষী দল ও গোষ্ঠীর সাথেও বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে সমঝোতা বা চুক্তি করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা

হয়েছে। এভাবে বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগের সাথেও ইসলামপন্থীদের সমঝোতা হতে পারে। কখনো সমঝোতা করে তাদেরকে নিজেদের অবস্থানের ব্যাপারে জানান দিতে হবে। আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

বিগত ৫ই মে যে হত্যাযজ্ঞ আওয়ামী লীগ চালিয়েছে, তাতে এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আলেম সমাজের আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মাঠে নামা উচিত। কারণ একে তো এতো শহীদের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত হলো সেই অপবিত্র হাতের সাথে হাত মেলালে শহীদদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে এতো কঠোর অবস্থান, নবীপ্রেমিক জনতাকে এভাবে গণহত্যা চালানোর পরও মুসলমানরা যদি তাদের দিকে ঘৃণার থুথু নিক্ষেপ না করে তাহলে এদেশে ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠীর স্পর্ধা বেড়ে যাবে। ৫ই মের শাপলা চত্বর ট্রাজেডির খলনায়ক আওয়ামী লীগকে চূড়ান্তভাবে উপেক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম এ মাটিতে এখনো এতটা হেলা খেলার বিষয়ে পরিণত হয় নাই। ২০০১ এর ফতোয়া বিরোধী রায় ও শাইখুল হাদীসের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন সহ আলেম-ওলামাদের উপর খড়্গ চালানোর দায়ে জনগণ যেভাবে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই ধাক্কায় আওয়ামী লীগ ২০০৬-এ পাঁচ দফা চুক্তি করেছিল। এবার ২০১৩ তে শাপলা চত্বরে যে ট্রাজেডির জন্ম তারা দিল, নবী প্রেমিকদের রক্ত নিয়ে যে হোলি তারা খেলল তার উচিত শিক্ষা যদি দেয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে আরো চিন্তা-ভাবনা করবে।

আব্বা!

আপনার আত্মা শান্তি পাবে এ কথা জেনে যে, বাংলাদেশের মানুষ সেই শিক্ষা আওয়ামী লীগকে দিতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক চারটি বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদেশে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে, নবী প্রেমিকদেরকে খুন করে মানুষের মনে স্থান পাওয়া যাবে না তা যেন হাড়ে হাড়ে টের পায় আওয়ামী লীগ, ইসলামপ্রিয় মানুষ সেই অপেক্ষাতেই আছে।

আর তাই, আমার অভিমত হলো, যদিও আমি আওয়ামী লীগের মতো সেক্যুলার দলের সাথেও ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী রাজনীতি ও আলেম সমাজের স্বার্থ রক্ষা

করে প্রয়োজনে জোট করা, সমঝোতা করা বা চুক্তি করার সর্বোতভাবে পক্ষপাতি। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের হাত থেকে শাপলা চত্বরের সকল শহীদদের রক্তের চিহ্ন শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এবং আওয়ামী লীগের বোধোদয় না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করতে হবে। একযোগে তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামতে হবে।

আব্বা!

আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই পত্রে আমি মূলত আপনার রেখে যাওয়া আমানতগুলোকে স্মরণ করতে চেয়েছি। উদ্দেশ্য হলো আমার কারাজীবনের কষ্টের দিনগুলোতে আপনাকে বেশি বেশি অনুভব করা। কারণ আপনার অনুভবই হৃদয়ে সাহস যোগায়। হতাশার মাঝে আশার প্রদীপ জ্বালে। আপনি আমাদের চোখের সামনে কুরআন-সুন্নাহর বাস্তব উপমা। নবী আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আকাবিরীন ও আসলাফের উত্তম নমুনা। আজ আমি আরো তীব্রভাবে অনুভব করছি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার মাঝে আমাদের জন্য প্রেরণা রয়েছে। কারা জীবনের দুঃসহ কষ্টের দিনগুলোতে আপনার স্মৃতিচারণ প্রেরণাদায়ক হয়ে উঠল। প্রসঙ্গক্রমে আরো কিছু বিষয়ও আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। জানি আমার এ নিবেদন বাহ্যিকভাবে আপনার কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে না কিন্তু আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব। তাছাড়া এমন একদিন তো আসবেই যেদিন আমাদের পিতা-পুত্রের সব দূরত্ব ঘুঁচে যাবে। আমরা পরস্পর মিলিত হব। সেই দিন যেন আপনার আদর্শের সন্তান হিসাবে আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। আপনার আমানতের যথাযথ হেফাজত করে যেতে পারি এমন রূহানী তাওয়াজ্জুহ আপনার কাছ থেকে যেন পাই। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই প্রার্থনা। সরকারের দায়েরকৃত দুই ডজন মামলার বোঝা মাথায় নিয়ে আমি কারাগারে বন্দি। জানিনা কবে আমার এই বন্দিদশা কাটবে। এই বন্দী জীবনেও আল্লাহর ফায়সালার উপর আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহই তো আমাদের জীবনের মালিক। তারই জন্য উৎসর্গিত আমার জীবন, আমার যৌবন, আমার সম্পদ, আমার সন্তান, আমার সবকিছু।

হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার পরীক্ষা আসান করে দাও। দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান রক্ষার আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদদেরকে শাহাদাতের উচ্চ

মর্যাদা দান কর। তাদের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দাও। সন্তানহারা মা-বাবাকে সান্ত্বনার ব্যবস্থা মাওলা তুমি নিজেই কর। পিতৃহারা ইয়াতীম সন্তানদের দায়িত্ব আল্লাহ তুমি নিজে গ্রহণ কর।

এই আন্দোলনে জালিমের বুলেটের আঘাতে জীবনের তরে হাত, পা, চোখ বা অন্য কোন অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণকারী ভাইদের কুরবানী কবুল কর। তাদেরকে সবর করার তাওফীক দাও। আহতদেরকে দ্রুত সুস্থতা দান কর। জালিমের জিন্দানখানায় বন্দী সকল নবী প্রেমিকদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। বিপদগ্রস্তদের পাশে যারা দাড়িয়েছেন, তাদেরকেও উত্তম বিনিময় দান কর। আমাদের সকলের মনে জিহাদের প্রেরণা ও শাহাদাতের তামান্না দান কর। আমার আব্বাজানকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসীব কর। আম্মাজানকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান কর। আব্বাজানের রূহানী ফয়েয ও আম্মাজানের চোখের পানির বদৌলতে মাওলা তুমি আমাকে তোমার দ্বীনের সৈনিক হিসাবে কবুল কর। আমার বন্দীত্বে যারা কষ্ট পেয়েছেন, দুআ করেছেন ও করছেন, সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাদের প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান কর। আমীন।

মামুন
রুম নং ৪
চন্দ্রা, ৫ম তলা
হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার
কাশিমপুর, গাজীপুর
রাত ৮.৩০ মি.
২৭. ০৬. ১৩

ছাত্র মজলিসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দায়িত্বশীল ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি

দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইয়েরা!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

জালিমের জিন্দানখানায় বন্দী অবস্থায়ও মনে বড় আনন্দের উদ্রেক হয় যখন জানতে পারি যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় কাফেলা তার অভিষ্ট লক্ষ্যেপাণে এগিয়ে চলছে। আমাদের সংগঠনের ভাইয়েরা দ্বীন কায়েমের যোগ্য কর্মী হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মনে বড় আশা ছিল তোমাদের রমযান পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোতে শরীক থাকব। কিন্তু ঘটে তো সেটাই যেটা কুদরতের ফায়সালা থাকে এবং হয়তো এর মধ্যেই নিহিত আছে অধিকতর কল্যাণ।

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

'আর এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ কর অথচ সেটাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।'

প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা!

জালিমের কারাগারের লৌহ-প্রাচীর হয়তো আমার দেহকে তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, কিন্তু আমার হৃদয় আমার মন তোমাদের সাথেই আছে। অপারগতার কারণে আমি তোমাদের কর্মসূচিতে অংশ নিতে না পারলেও দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা যে, বন্দী থেকেও তোমাদের সাথে শরীক থাকার বিনিময় পাব। যেমনটি পেয়েছিলেন প্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ঐ সকল সাহাবীগণ যারা তাবুক জিহাদে অংশ নিতে পারেননি অপারগতার কারণে। কিন্তু আল্লাহর নবী ঘোষণা করলেন এরা মদীনাতে আটকে থাকলেও তাবুক যুদ্ধের সফরে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সাথেই গণ্য হবে।

প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা!

আমাদের দেশে ইসলামী জাগরণের যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল তা আমাদেরকে এই যমীনে খোদার দ্বীন কায়েমের সম্ভাবনাকে আরো জোরালো করে দেখিয়ে দিলো। কাজেই আমাদের কাজের সম্ভাবনা যেমন বাড়লো, আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেলো বহুগুণ। তাছাড়া দ্বীনের গৌরব রক্ষার জন্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান রক্ষার ঈমানী আন্দোলনে যেভাবে আমাদের ভাইয়েরা রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির মাটিকে সিক্ত করল, শত শহীদের রক্তভেজা এই মাটিতে সেই নবীর দ্বীনকে বিজয়ী করতে না পারলে এ রক্তের ঋণ শোধ হবে না।

শহিদী শপথে উদ্দিপীত ভাইয়েরা!

৫ মের নতুন বালাকোট রক্তভেজা শাপলা চত্বর থেকে আমরা যারা জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরেছি আমাদেরকে আমাদের শহীদ ভাইদের কথা স্মরণ রাখতে হবে। যেই অপরাধে শহীদ ভাইদের বুকগুলোকে ঝাঝরা করল জালিমের বুলেট, মনে রাখতে হবে সেই অপরাধে কিন্তু আমরাও অপরাধী। সুতরাং মনে করতে হবে বস্তুত সেই শহীদদের সাথে সাথে আমাদেরও ইহকালীন চাওয়া-পাওয়ার কবর রচনা হয়ে গেছে রক্তে রাঙ্গা শাপলা চত্বরে। এখন আমাদের বেঁচে থাকা কেবল শহীদদের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পন্ন করার জন্য। শহীদের রক্তে ভেজা আল্লাহর এই যমীনে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রিয়তম নবীর আদর্শ কায়েমের জন্য। ব্যক্তিগত জীবনের সাময়িক চাওয়া-পাওয়া ও ভবিষ্যত জীবনে সুনাম-সুখ্যাতির ক্যারিয়ার গঠন করার আত্মপ্রবঞ্চনামূলক ধোঁকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে। নিজের জীবনকে শহিদী জীবন মনে করতে পারলে দুনিয়ার চাকচিক্যময় রঙিন ফানুসকে শয়তানের ভেলকীবাজীর চেয়ে বেশি কিছু মনে হবে না। আল্লাহর দ্বীন আর পরকালের শান্তিকেই মনে হবে জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতা।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার!

আমরা আমাদেরকে প্রস্তুত করব সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে। জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, চরিত্রে-আচরণে, যুদ্ধে-শান্তিতে, ধৈর্য্যে-ক্ষীপ্রতায়, বুদ্ধিতে- কৌশলে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। কেননা আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা

ইসলামের সৈনিক। আমরা শিখব। কুরআন-হাদীস শিখব। ইসলামী জ্ঞানের শাখায় শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করব। আবার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সকল শাখায় আমরা বিচরণ করব। আমরা আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বস্তরে বিচরণ করব। আর এ সবই করব এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। দুনিয়ার অর্থ ও সুখ্যাতির জন্য নয় বরং দ্বীনের খেদমতের জন্য।

বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং আধুনিক প্রযুক্তির উপর আমাদের আয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নয়, শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দ্বীনের বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য। শত্রুদের রণকৌশল সম্পর্কে অবগতি না থাকলে যুদ্ধে বিজয় লাভ কঠিন। এক কথায় আমরা সব জানব, সব শিখব তবে তা হবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার আলোকে–

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।"

এভাবেই নিজেদের জীবনকে খোদার রাহে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আমরা একটি সংগ্রামী, সংযমী, জ্ঞানী-গুণী, উৎকৃষ্ট কাফেলা গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা!

তোমরা তোমাদের জীবনের স্বর্ণ সময় যৌবনের উত্তাল দিনগুলো অতিক্রম করছ। তোমাদের এই মূল্যবান সময়গুলোকে আরো বেশি মহিমান্বিত করতে সংগঠনের রয়েছে মহা পরিকল্পনা। 'এহসার' তথা সংগঠনের জন্য, সংগঠনের নির্দেশনায় চূড়ান্তভাবে আত্মনিবেদনই হল সেই মহা পরিকল্পনার অংশ।

আমরা বরাবরই বলছি, আমাদের সংগঠনের পরিচয় হল ব্যাপকতর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু ক্যাম্পাস ভিত্তিক নয়; "যেখানেই শিক্ষার্থী সেখানেই প্রতিষ্ঠান" এই মূলনীতি হল আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৌশল। সুতরাং এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্তির অর্থ শুধু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নয় বরং এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্তির অর্থ হচ্ছে ইসলামী সমাজব্যবস্থার একজন যোগ্য কর্মী হিসাবে নিজেকে গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

কাজেই আমাদের কোন কোন পূর্বপুরুষ, বিশেষত হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ছাত্রকালে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে যে অনুৎসাহিত করেছেন আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সাথে তার কোন বিরোধ নেই। বরং আধুনিক যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল অতি বৃহৎ পরিসরের উন্নত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস।

প্রিয় সহযাত্রী বন্ধুগণ!

যে সকল মৌলিক শিক্ষা ও দর্শনকে সামনে রেখে আমাদের এই কাফেলাকে এগিয়ে নিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, সংগঠনের ব্যানার, সংগঠনের নাম ও সংগঠনের নেতৃত্বের প্রচারের চেয়ে সংগঠনের চিন্তা ও বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচার করতে হবে। মনে রাখতে হবে দ্বীনের বিজয়ের জন্য জন্ম নিয়েছে এই সংগঠন। সংগঠন নয়, দ্বীনের বিজয়ই আমাদের উদ্দেশ্য। সংগঠন হলো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম।

আমাদের কর্মপন্থা হলো দ্বীন বিজয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধতা তৈরি করা। আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মত দলবদ্ধতা আমরা তৈরি করব। এখানে সতর্ক থাকতে হবে, সংগঠনের প্রতি ভালোবাসা, আবেগ থাকতেই হবে কিন্তু তা যেন عصبيت বা দলবাজীতে পরিণত না হয়। আমরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য দলবদ্ধ হব দলাদলি করব না। আর তাই আমাদের কর্মপন্থা, আমাদের কর্মকৌশল হবে সম্মিলিত কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রচারণার সারিতে থাকব না থাকব পেছনের ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে। এ উদ্দেশ্য সাধন মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে বাস্তবায়ন করা বড়ই কঠিন। তাই সংগঠনের সূচনাকাল থেকেই সকল জনশক্তির অন্তরে এই চেতনা বদ্ধমূল করতে হবে যে, আমরা নামের প্রচারের চেয়ে আদর্শের প্রচারকে, ব্যানার প্রতিষ্ঠার চেয়ে চেতনার প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিব। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন সকল জনশক্তি সংগঠনের চিন্তা ও চেতনাকে যথাযথভাবে উপলবিদ্ধ করতে সক্ষম হবে। সংগঠনের শিক্ষা, সংগঠনের চিন্তা, সংগঠনের বক্তব্যকে আত্মস্থ না করে শুধু সংগঠনের কর্মী বা দায়িত্বশীলের পরিচয় ধারণ করলে নিজের সাথে ও সংগঠনের সাথে প্রতারণাই করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রাণপ্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

আমরা যে পথে নেমেছি এ পথ কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ বা ফুল বিছানো পথ নয়, কাঁটা ছড়ানো বন্ধুর ও রক্তস্নাত পিচ্ছিল পথ। আর এ কথাতো আল্লাহর

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা যে, ফুল বিছানো পথে নয়, কণ্টকাকীর্ণ পথের শেষ প্রান্তেই হলো খোদার জান্নাত। আমরা দ্বীন বিজয়ের পথে চলতে গিয়ে শত্রুর প্রতিকূলতা কামনা করি না তবে সে আশঙ্কাও বিস্মৃত হই না। নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا.

"তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করো না, কিন্তু যদি হয়ে যাও তবে দৃঢ়পদ থেক।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস আমাদেরকে দুটি শিক্ষা দেয়।

এক. ইসলামী আন্দোলনে হঠকারিতার সুযোগ নেই।

দুই. ইসলামী আন্দোলনে ভীরুতা, আপোষকামিতা ও পশ্চাদপদতারও কোন স্থান নেই। হঠকারিতা ও ভীরুতা এই দুই প্রান্তিক মানসিকতা পরিহার পূর্বক বাস্তবমুখী দৃঢ়চেতা মনোভাবই ইসলামী আন্দোলন ও দ্বীন বিজয়ের সংগ্রামের সঠিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি। সমকালীন সময়ে আমরা আমাদের মহান রাহবার হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর সংগ্রামী জীবনে যার বাস্তব দৃষ্টান্ত অবলোকন করেছি।

দূরন্ত যৌবনের প্রাণবন্ত সাথীগণ!

আমরা গায়ে পড়ে গণ্ডগোলে জড়াবো না। আমরা অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করব না। আমরা ইতিবাচক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের আহ্বান মানুষের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করব। তবে কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাসের স্পষ্ট বার্তা হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী শয়তানী অপশক্তি কখনোই আমাদেরকে সরলভাবে সামনে এগুতে দিবে না। বাধা দিবে। শুধু তাই নয়, সত্যপন্থীদেরকে তারা নির্মূল করার সম্ভাব্য সকল শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করবে। ফলে হয়তো আমরা যারা আল্লাহর রাহের রাহাগীর তাদের জীবনে নেমে আসবে জুলুম-নির্যাতন, হামলা-মামলা, জেল-হুলিয়াসহ সব রকম বাধা। এমনকি জীবনের তরে পঙ্গুত্ব কিংবা জীবন কুরবান করে শাহাদাত বরণ করার প্রেক্ষাপট তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে সেই সকল পরিস্থিতির অপর প্রান্তেই বিজয়ের হাতছানী। পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ১০৮, ১০৯ ও ১১০ নং আয়াতে এমনই পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ - حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

"হে নবী! আপনি বলুন, এটাই আমার পথ– আমি আর আমার অনুসারীগণ আমরা বুঝে-শুনেই আল্লাহর পথে আহ্বান করি। আর আল্লাহ মহা পবিত্র ও আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আর আপনার পূর্বে জনপদের অধিবাসীদের মধ্য থেকে মহা মানবদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের নিকট আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করতাম। এরা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দেখে না কেন? তবে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন ছিল। আর পরকালই তো বেশি উত্তম মুত্তাকীদের জন্য। তোমরা কি বোঝ না? (এভাবেই আল্লাহর পথের আহ্বানকারী নবীগণ আর তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে লড়াই চলেছে অব্যাহতভাবে) এমনকি (পরিস্থিতির ভয়াবহতায়) নবীগণের মধ্যেও চূড়ান্ত অস্থিরতা এসেছে। তারা আশঙ্কায় পড়ে গেছেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ার, এমনই (চূড়ান্ত বিপদের সময়) তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে। ফলে যাদেরকে ইচ্ছা আমি মুক্তি দিয়েছি, আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার আযাব প্রত্যাহার হয় না। (সূরা ইউসুফ আয়াত ১০৮, ১০৯, ১১০)

আমরা কোনভাবেই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কামনা বা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতায় যে কোন কঠিন পরিস্থিতি আসুক তার মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্যে দৃঢ়পদ ও অটল থাকার ব্যাপারে মানসিকতা তৈরি করতে ও প্রস্তুত থাকতেও যেন ত্রুটি না হয়। আল্লাহর কাছে চাইব আফিয়াত সেই সাথে পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকবে। এতে বিপদের সময় ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্য ধরা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আমার ক্ষুদ্র জেল জীবনের অভিজ্ঞতায় এটাই দেখলাম, যারা মানসিকভাবে কঠিন পরিস্থিতির জন্য কোন রকম প্রস্তুত ছিলেন না তারা সামান্যতেই হতাশ হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের মানসিক প্রস্তুতি ছিল তারা মাশাআল্লাহ হিম্মতের সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছেন।

প্রিয় দ্বীনী ভাই সকল!

আল্লাহর বান্দাদের উপর দুনিয়াতে কঠিন পরিস্থিতি আসে দুই কারণে।

এক. কোন পাপ বা অপরাধ হওয়ায় গোনাহমাফির জন্য।

দুই. পরীক্ষা বা এবতেলার জন্য।

কারণ দুটির মধ্য থেকে যেটাই হোক মুমিনের কাজ হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফায়সালার উপর রাজি থাকা। নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিপদে যারা আল্লাহর ফায়সালার উপরে রাজি থাকে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যারা বিপদে পড়ে আল্লাহর ফায়সালার উপর অসন্তুষ্ট হয় তাঁদের জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, দ্বীন বিজয়ের পথে বিপদ আপদের জন্য নিজেদের মানসিকতা তৈরি রাখা। এতে আল্লাহর রহমতে বিপদ অনেকটা আসান হয়ে যায়।

আল্লাহর পথের মুজাহিদ ভাইগণ!

আজ আমাদের সামগ্রিক একটি অধঃপতন ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটা হলো শাহাদাতের তামান্না আমাদের দিল থেকে দূর হয়ে গেছে। অথচ শাহাদাতের তামান্না ছাড়া ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। শাহাদাতের তামান্না না থাকলে বড় বড় কিছু দুর্বলতা দেখা দেয়। যেমন–

এক. ভীরুতা ও কাপুরুষতা।

দুই. দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়াদার মানুষে পরিণত হয়।

তিন. আন্দোলন-সংগ্রামের সময়ে পিছুটান দেয়। ফলে অনেক অর্জন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তাই শাহাদাতের তামান্না দিলে রাখতে হবে। সেজন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করতে হবে।

প্রাণপ্রিয় কাফেলার সহযাত্রী বন্ধুগণ!

দ্বীন বিজয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উত্তম সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাহলো–

এক. নিজেদের কাজকর্ম, আমল-আখলাক, আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগঠনের অভ্যন্তরে কঠোর মান অনুশীলনের চর্চা করতে হবে। আমাদের পূর্বসূরী আকাবির-আসলাফের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে তাদের যথার্থ উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে একটি আদর্শ কাফেলা হিসেবে নিজেদেরকে গঠন করতে হবে।

> *নিজেদের মধ্যে চারিত্রিক, আমলী, আদর্শিক, দৃষ্টিভঙ্গিগত, চিন্তা-চেতনা তথা এক কথায় সীরাত-সুরত হতে হবে অতি উচ্চমানের। এক্ষেত্রে আকাবিরীনে দেওবন্দ-এর পদাঙ্ক অনুসরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে আকাবিরীনে দেওবন্দ ইলম, আমল, ত্যাগ ও মুজাহাদা এবং সহীহ ফিকির ও রাহনুমায়ীর ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা এ যুগের সর্বোত্তম নমুনা।*

তাই আদর্শিক ও চেতনাগত দিক থেকে আমাদের সংগঠনকে এই ফিকিরের বলিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে। বিশেষ করে আকাবিরদের মধ্য থেকে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর সাংগঠনিক আফকার, সেই সাথে আলী মিয়া নদভী (রহ.)-এর সুবিশাল ও বিস্তৃত ময়দানের কর্মপরিকল্পনা এবং হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর হিম্মত ও জযবার সমন্বয় করতে পারলে আমাদের এ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

সেই সাথে ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদের ময়দান এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আরো যে সকল কীর্তিমান পুরুষ যুগে যুগে অবদান রেখেছেন তাদের জীবন চরিতকে উত্তম পাথেয় হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। সারকথা হলো, সংগঠন গড়ে তোলা, জনশক্তির মানোন্নয়ন ও তরবিয়ত এবং সাংগঠনিক পরিবেশের ক্ষেত্রে ইসলামের আযীমত তথা সতর্কতামূলক কঠোর পন্থাকে অনুসরণ করতে হবে। কোন প্রকার বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। এভাবে একটি নুরানী কাফেলা গঠনে নিরলস সাধনা চালাতে হবে।

দুই. ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হতে হবে। আর এজন্য বৃহত্তর ঐক্য প্রয়াসে ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে। উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী সকল পথ ও মতের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনে আমাদের

সংগঠনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু ঈমান-কুফুরের প্রশ্নে অটল থেকে অবশিষ্ট সকল বিষয়ে উদারতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে বৃহত্তর ঐক্যের জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

উপরোক্ত দুটি বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে লালিত হতে হবে। অন্যথায় সরল-সহজ পথ থেকে বিচ্যুতির সমূহ আশঙ্কা দেখা দিবে। এক দিকে নিজেদের মধ্যকার নীতি ও পলিসি হবে কঠোর ও কট্টর। অপর দিকে অন্যদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আচরণের ক্ষেত্রে নীতি ও পলিসি হবে নমনীয় ও উদার।

> *মনে রাখতে হবে নিজেদের ভিতরকার কট্টরপন্থা ও কঠোরতা অন্যদের উপর আরোপ করতে চাইলে* عصبيت *উগ্রতা ও অসিহষ্ণুতা জন্ম নিবে। আবার অন্যদের সাথে গৃহীত নমনীয়তা ও উদারতা নিজেদের মধ্যে প্রশ্রয় পেলে* تساهل وتهاون *বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দেখা দিবে।*

এভাবে সংগঠনের অভ্যন্তরে عزيمت আযীমতের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যদের সাথে رخصت রুখছতের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সংগঠনের অভ্যন্তরেও নিজের ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ে আযীমতের নীতি অবলম্বন করতে হবে সেই তুলনায় অন্যের ক্ষেত্রে এবং সাধরণ ক্ষেত্রে রুখছতের পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ সাথীগণ!

আমরা একটি মহৎ স্বপ্ন নিয়ে কিছু ভাই যাত্রা শুরু করেছিলাম এ পথে। একটি হতাশাজনক ও তমশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে একটু আশার আলো জ্বালবার প্রত্যয় নিয়ে ছিল আমাদের পথ চলার সূচনা। একটু একটু করে চলতে চলতে সময়ের হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য সময় আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। আর আমরা নিজেরা কিছু ভাই দূর সুড়ঙ্গ পথে একটু আলোর ঝলকানী দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের প্রত্যয় খুব দৃঢ়। আমাদের পদক্ষেপ বেশ জোরালো। আমাদের মনে আছে হিম্মত। বুকে আছে স্বপ্ন। আল্লাহর সাহায্য ও নুসরতের উপর আমাদের আছে অবিচল আস্থা। এই স্বপ্ন, হিম্মত আর তাওয়াক্কুলের সমন্বয়েই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা!

দূর থেকে তোমাদের কর্মসূচি, কর্মকাণ্ড ও কর্ম-তৎপরতায় অংশগ্রহণ আর তোমাদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কথাগুলো লিখলাম। তোমাদের ভাই ও তোমাদের দায়িত্বশীল হিসাবে আমার কারাভোগের যন্ত্রণা নিশ্চয় তোমাদের হৃদয়কেও ব্যথিত করেছে। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদেরকেও এই বিপদে সবর করার বিনিময় দান করেন। আমিও তোমাদের দুআ চাই। আল্লাহ যেন আমাকে আগত বিপদের উপর রাজী থাকার ও ধৈর্য ধরার তাওফীক দান করেন। আর আমাদের সকলের ক্ষুদ্র এই কষ্ট ও বিপদকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আরো বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হওয়ার উসিলা হিসাবে কবুল করেন। সকল ভাইকে সালাম জানিয়ে শেষ করলাম।

তোমাদের দ্বীনী ভাই
মুহাম্মাদ মামুনুল হক
রুম নং ৪
চন্দ্রা, ৫ম তলা
হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার
কাশিমপুর, গাজীপুর

সমাপ্ত
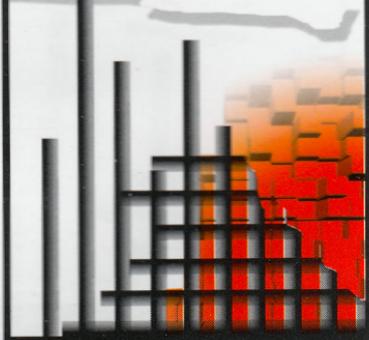
বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স

[মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.
লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]